হোমিও ওষুধের
শক্তি-মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের
রোগী বিবরণী সহ

ডাঃ পরেশচন্দ্র সরকার

গ্রন্থকার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও
আরোগ্যকলা, ঔষধ নির্বাচন বিদ্যা, হোমিওপ্যাথিক স্পোর্টস
মেডিসিন, Reperatory and Repertorization,
সম্পাদক, 'হ্যানিম্যান', 'সদৃশী' মাসিক পত্রিকা

মেডিকেল বইয়ের জন্য
ক্যালকাটা বুক স্টল
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্ট্রীট)
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
ডি. চক্রবর্ত্তী
ভদ্রকালী, হুগলী

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল - ২০০৩
পুনর্মুদ্রণ ২০০৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ ২০০৮

অক্ষর বিন্যাস :
রতন ভট্টাচার্য্য
নবাবগঞ্জ-ইছাপুর
দূরভাষ ২৫৯৩-২৩৮৬

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক-চিকিৎসকদের রোগীবিবরণী

মহাজনাঃ যেন গতাঃ সপন্থা। মহাপুরুষরা যে পথে গিয়েছেন সেই স্থল পথ। একথা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে আরও বেশী করে প্রযোজ্য। যিনি এ চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে একে এক পূর্ণাঙ্গ ত্রুটিবিহীন চিকিৎসা কলায় পরিণত করেছেন এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ যাঁরা এ পদ্ধতিকে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছেন রোগীচিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা এক অমূল্য দলিল। হ্যানিম্যান, কেন্ট, ক্লার্ক, ওয়েসেলকট, লিপি, ন্যাস, মার্গারেট টাইলার, জন উইয়ার, জে. এন. কাঞ্জিলাল, বিজয়কুমার বসু প্রমুখ শিক্ষক চিকিৎসকদের চিকিৎসিত কিছু রোগী বিবরণী চতুর্থ বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্থাপিত করেছি। এগুলো বারবার পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এগুলো হবে আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথে পাথেয়। আমরা এগিয়ে যাব পূর্ণতার দিকে, আদর্শ চিকিৎসক হওয়া লক্ষ্যে।

মুখবন্ধ

ডাঃ পরেশ চন্দ্র সরকারের লেখা 'হোমিও ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান' বইটি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। বইটি পড়ে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার তাগিদ অনুভব করি। তাই এই মুখবন্ধ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ আরোগ্যবিধানের নিমিত্ত উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সেই ওষুধটির উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় যথাযথ প্রয়োগ। কিন্তু হোমিওপ্যাথির এক্ষেত্রটিতে অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। হোমিওপ্যাথি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি বলে অনেক ক্ষেত্রে এই অস্পষ্টতা অনেক দ্বিধা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ফলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করতে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হয়।

ডাঃ সরকার অর্গানন অব মেডিসিন এবং ক্রনিক ডিজিসেস গ্রন্থে হ্যানিম্যানের নির্দেশাবলী এবং বিশ্বের হোমিওপ্যাথিক দিকপালগণের অভিমত সমূহকে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থান সুস্পষ্টভাবে এবং দ্বর্থ্যহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের তত্ত্বগত ওপ্রয়োগগতদিক নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক আলোচনা।

এ বিষয়ে হ্যানিম্যানসহ বিভিন্ন বিদগ্ধজনের চিকিৎসাজীবনের বিভিন্ন তথ্য এবং তাঁদের চিকিৎসিত কয়েকটি রোগীবিবরণী ডাঃ সরকার সংযোজন করেছেন। এতে বইটি বিষয়সম্ভারে এবং গুণমানে সমৃদ্ধ হয়েছে । বইটিকে এবিষয়ে একটিগবেষণাগ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বইটির ভাষাপ্রাঞ্জল, সাবলীল এবং মনোগ্রাহী। একটি কঠিন বিষয় রচনাশৈলীর গুণে কত চিত্তাকর্ষক হতে পারে এবইটি তারই এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বইটি নবীন চিকিৎসকদেরও তো বটেই অনেক প্রবীন চিকিৎসকদেরও যে বিশেষ উপকারে আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের স্বার্থে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পরিশেষে, হোমিওপ্যাথিক সমাজকে এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য ডাঃ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তারিখ-২৮শে জুন ২০০২

ডাঃ নিমাই চ্যাটার্জী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও
হাসপাতাল, কলকাতা

(ভূমিকা)

চিকিৎসকের প্রধান কাজ হলো রোগ আরোগ্য করা। এজন্য তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি ওষুধ নির্বাচন করতে হয় এবং সেই ওষুধটিকে এমন করে প্রয়োগ করতে হয় যাতে আরোগ্যকার্য দ্রুত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রকৃত পক্ষে ওষুধ নির্বাচন ও তার প্রয়োগকলা একই প্রক্রিয়ারই দুটি অংশ এবং পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কেবলমাত্র গভীর জ্ঞান, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কার্যক্রম এবং সত্যনিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ নির্বাচিত ওষুধটি কত শক্তি, কিরূপ মাত্রায় এবং কেমনভাবে প্রয়োগ করলে সর্বোত্তম ফল লাভ সম্ভব হবে তা নবীন চিকিৎসকদের তো বটেই অনেক প্রবীন চিকিৎসকদের নিকটও এক দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য কোন পথের সন্ধান এই নবীন চিকিৎসকগণ খুঁজে পাননা। এঁরা সর্বদাই একটা অনিশ্চয়তায় ভোগেন। এই অনিশ্চয়তার জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটে। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পদে পদে ভুল হয়। আর এ অবস্থা প্রায় সারাজীবন ধরেই চলে। ফলে সুচিকিৎসকে পরিণত হওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে হোমিওপ্যাথিতে শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটির মত এত অস্পষ্টতা বোধ হয় অন্য কোথাও নেই। বিদগ্ধজনের পরস্পর বিরোধী অভিমত বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কেউ উচ্চশক্তির পক্ষপাতী, কেউ নিম্নশক্তির, কেউ আবার মধ্যশক্তির নির্ঝঞ্ঝাট পথই শ্রেয় বলে মনে করেন। মাত্রার ক্ষেত্রটি আরও বিভ্রান্তিকর। ওষুধের কতটা পরিমাণে একমাত্রা এবং কতমাত্রা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা নিয়েও বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে। এমনকি অনেকে মাত্রার আলাদা কোন গুরুত্ব আছে বলেই মনে করেন না।

একেতো হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ নির্বাচন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, আর ওষুধ যদিও বা নির্বাচিত হয় তবে তার উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রা নিরূপিত হয়না এবং হলেও তা যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হয় না। ফলে আদর্শ আরোগ্য বিধান করা সম্ভব হয়না।

অথচ এরূপ হওয়া অভিপ্রেত নয়। হোমিওপ্যাথি এক আদর্শ চিকিৎসা বিজ্ঞান। কাজেই ওষুধনির্বাচন, নির্বাচিত ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ এবং তার

প্রয়োগ বিধি বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য, সহজবোধ্য ও সহজ অনুসরণযোগ্য হওয়া উচিত।

ওষুধ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আমি আমার 'ঔষধ নির্বাচন বিদ্যা' ও 'Repertory ও Repertorization' শীর্ষক পুস্তকে আলোচনা করেছি। বর্তমান পুস্তকের আলোচ্যবিষয় তারই পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ ওষুধের শক্তি, মাত্রা, ও প্রয়োগবিজ্ঞান। মূলতঃ শিক্ষার্থী ও তরুণ চিকিৎসকদের একটা পথনির্দেশনা দেওয়াই এই বইটির উদ্দেশ্য, যাতে তারা অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ভুলভাবে নিরূপণ করতে পারে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে যুক্তিবিচারের পথ ধরে সেই লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবে আস্থার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে এবং নিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে কালক্রমে দক্ষ চিকিৎসকে পরিণত হতে পারে।

বইটি রচনায় আমার স্ত্রী ডাঃ মীরা সরকার ও পুত্র ডাঃ পার্থসারথি সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় বইটির প্রকাশনা সম্ভব হলো।

মূল রচনা থেকে ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরীর শ্রমসাধ্য কাজটি আমার কন্যা শ্রীমতী মন্দিরা মিত্র এবং পুত্রবধূ শ্রীমতী পায়েল সরকার সম্পন্ন করে। ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতার ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ নিমাই চাটার্জী মহাশয় বইটি পড়ে এর একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাঁদের উদ্দেশ্যে এই বইটির রচনা তাঁরা যদি তাঁদের জীবনে চলার পথে কিছু পাথেয় পান তাহলেই এ প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আর. আর. প্লট নম্বর - ৫৩৮
কসবা - গোলপার্ক
কলকাতা - ৭০০১০৭
১৮ই জুন, ২০০২

পরেশচন্দ্র সরকার

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ
তত্ত্বগত বিভাগ

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রয়োগগত বিভাগ

তৃতীয় বিভাগ

রোগী বিবরণী বিভাগ

বিশ্ববরেণ্য হোমিও প্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের রোগী বিবরণী

পরিশিষ্ট

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক-চিকিৎসকদের রোগীবিবরণী *

হোমিওপ্যাথির মূলনীতির সঙ্গে শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সম্পর্ক

মূলনীতি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশকাল পাত্রভেদে এই নিয়মগুলোর পরিবর্তন হয়না। এই নীতিগুলো সরল কিন্তু এদের ব্যপকতা ও গভীরতা অসীম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো রুগ্ন মানুষ (The Sick)। এই রুগ্ন মানুষকে রোগমুক্ত করে সুস্থ করে তুলতে হবে। সকলনীতিগুলো এই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়। মূলনীতি হল সদৃশনীতি (Law of Similars)। এই নীতি অন্যান্য নীতিগুলোকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। ওষুধ নির্বাচনে, নির্বাচিত ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে এবং তার প্রয়োগশৈলীতে সদৃশনীতি হল একমাত্র পথ নির্দেশক নীতি।

সদৃশনীতি এবং শক্তি ও মাত্রা

সদৃশনীতি হলো ঃ Similia Similibus Curentur. Simplex Simile Minimum. সদৃশ ওষুধ সদৃশরোগকে আরোগ্য করে, যদি সেই সদৃশ ওষুধটি একক, অবিমিশ্র ও ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ওষুধটি রোগের সঙ্গে শুধু সাদৃশ্যযুক্ত হলেই হবে না ওষুধটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। একটি মানুষ, একটি রোগ। একটি রোগ, একটি ওষুধ। সদৃশ, সরল ওষুধ। এই সাদৃশ্য হল সার্বিক সাদৃশ্য। রোগের দু' একটা লক্ষণের সঙ্গে ওষুধের দু একটা লক্ষণের মিল নয়। রোগীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওষুধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য। অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তিত্বের (diseased personality)র সঙ্গে ওষুধ ব্যক্তিত্বের (drug personality-র) সাদৃশ্য। রোগশক্তির আক্রমণে রোগীর দেহ ও মনস্তরে যে সার্বিক বিচ্যুতি ঘটে ওষুধেরও ঠিক তদ্রূপ বিচ্যুতি ঘটাবার ক্ষমতা থাকতে

হবে। অন্যভাবে বলা যায় রোগশক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে ওষুধশক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতার মিল থাকতে হবে। এ মিল গুণগত ও পরিমাণগত (qualitative and quantitative)। আরোগ্যবিধানের জন্য তাই যেমন সদৃশ ওষুধ নির্বাচন করতে হয় তেমনি সেই ওষুধকে যথোচিতভাবে শক্তিকৃত অবস্থায় উপযুক্ত মাত্রায় যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হয়। তা নইলে সার্বিক সাদৃশ্য হয়না, সদৃশনীতির যথার্থ প্রয়োগ হয় না। আদর্শ আরোগ্য বিধানও হয়না। আংশিক সাদৃশ্য কোন সাদৃশ্যই নয়। এজন্য শক্তি ও মাত্রানীতিকে সামগ্রিকভাবে সদৃশনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করতে হবে। সাধারণতঃ ওষুধ নির্বাচনেই সদৃশনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত করা হয় না। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ এ-ই।

প্রাকৃতিক সদৃশনীতি

প্রাকৃতিক সদৃশনীতিই হলো আরোগ্যবিষয়ক সদৃশনীতি (Homoeopathic Law of Nature is homoeopathic Law of Cure). প্রকৃতি রাজ্যে অহরহ যে আরোগ্য সংগঠিত হচ্ছে তা সবই সদৃশনীতির প্রত্যক্ষফল। এই নীতিটি হলঃ জীবদেহে একটি প্রাকৃতিক রোগ আরেকটি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত রোগদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় যদি দ্বিতীয়টি (কৃত্রিম ব্যধিটি) ভিন্নতর উৎস থেকে সৃষ্ট হয় এবং শক্তিতে কিছুটা বলবত্তর হয়।[১]

অর্থাৎ মানুষের রোগ আরোগ্য করতে হলে চারটি প্রধান শর্তের পূরণ হওয়া আবশ্যক। এগুলো হলঃ-

১. রোগ আরোগ্য করতে হলে আরেকটি রোগের সংক্রমণ ঘটাতে হবে।

২. সেই রোগটি প্রাকৃতিক রোগের সদৃশ হতে হবে।

৩. সেটি ভিন্নতর উৎস থেকে উৎপাদিত হতে হবে।

৪. সেটি প্রাকৃতিক রোগ থেকে অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে।

---

১. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one, if the later (whilst differing in kind is very similar to the former in its manifestations. (Aphorism 26, Organon of Medicine, Samuel Hahneman.

হোমিওপ্যাথিতেই কেবল এশর্তের পূরণ সম্ভব

জীবনীশক্তি ও স্বাস্থ্য

আদর্শ আরোগ্য বিধানের এই আবশ্যিক শর্তগুলো কেবল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতিতেই পূরণ সম্ভব। কেননা হোমিওপ্যাথি ডাইনামিক তত্ত্বের (dynamic theory-র) উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাইনামিক (dynamic) কথাটি এসেছে গ্রীক্ শব্দ থেকে। Dynamis মানে জীবনীশক্তি বা জীবসত্তার শক্তি (Vital principle, life principle, animated principle, vital force). ডাইনামিক মানে হল জীবনীশক্তির ক্রিয়া বা জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া। জীবনীশক্তি অন্যান্য শক্তির মতই দেখা যায়না, কিন্তু দেহমাধ্যমে তার ক্রিয়াধারা দেখে তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। এজন্য এ শক্তিকে অতীন্দ্রিয়শক্তিও বলে। জীবনীশক্তি যে স্তরে ক্রিয়া করে তা হল ডাইনামিক স্তর বা অতীন্দ্রিয় স্তর। জীবন গতিশীল (dynamic)। জীবন ক্রিয়া সাধিত হয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুসংহত ক্রিয়ার মাধ্যমে একই শক্তির ছন্দোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই শক্তি হলো জীবনীশক্তি (vital force or dynamis)। এই শক্তি মানুষের দেহ ও মনকে সঞ্জীবিত রাখে, প্রতিটি দেহযন্ত্রকে স্বীয়কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করে। এই শক্তি মানবদেহকে অনুভব করার, কার্য সম্পাদন করার এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রদান করে। এ স্বাস্থ্য ও ব্যাধিতে এই জড় দেহকে সঞ্জীবিত রাখে। (অনুচ্ছেদ ১০)

স্বাস্থ্য

হ্যানিম্যান বলেন, মানুষের সুস্থাবস্থায় এই অতীন্দ্রিয় (ডাইনামিক) জীবনীশক্তি তার জড়দেহকে সঞ্জীবিত রাখে, অসীম ক্ষমতায় নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে এবং প্রাণক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দেহযন্ত্রের সকল অংশের কর্মক্ষমতা ও অনুভব শক্তি সুন্দর ও সুসমঞ্জসভাবে বজায় রাখে যার ফলে আমাদের অন্তঃস্থিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মন এই সুস্থ জীবন্ত দেহযন্ত্রটিকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের

নিমিত্ত স্বাধীনভাবে নিয়োজিত করতে পারে।[২] অর্থাৎ স্বাস্থ্য হলো দেহীর স্বাভাবিক অবস্থা যখন প্রাণক্রিয়া স্বচ্ছন্দে অব্যাহতভাবে চলে। দেহতন্ত্রে তখন একটা সাম্যাবস্থা (a state of equilibrium) বিরাজ করে। একটা ভাল লাগাবোধ, একটা সুখানুভূতি বিরাজ করে। এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। এ হলো সুস্থাবস্থা। এ ডাইনামিক অবস্থা। একে দেখা যায়না, কিন্তু উপলব্ধির মাধ্যমে, বিভিন্ন নিদর্শন দেখে এর অস্থিত্ব বোঝা যায়।

রোগ

রোগাক্রমণে এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। রোগশক্তি জীবনীশক্তির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কাজেই তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দেহে মনে কতগুলো অসুখকর উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণভাবে এগুলোকেই রোগ বলা হয়। কিন্তু এগুলো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ (symptoms)। এগুলো মিলিতভাবে আভ্যন্তর রোগের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ জীবনীশক্তির অবস্থার বিচ্যুতি বা রোগকে বাইরে তুলে ধরে।[৩] অর্থাৎ রোগ হলো স্বাস্থ্যের এক পরিবর্তিত অবস্থা (a deviated state of health, a dynamic state, disease-dynamis). স্বাস্থ্য ও রোগ জীবনের দু'অবস্থা- দুটি বিপরীত অবস্থা। দুটিই ডাইনামিকঅবস্থা। একটি স্বাভাবিক অবস্থা, আরেকটি তার পরিবর্তিত অবস্থা। রোগ লক্ষণ সাহায্য প্রার্থনারও ভাষা। এগুলোর জন্যই রোগী চিকিৎসকের নিকট সাহায্য অর্থাৎ ওষুধ এবং অন্যান্য পরামর্শ প্রার্থনা করে। এগুলির মাধ্যমেই চিকিৎসক রোগের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন ও ব্যবস্থা করে। এগুলো চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে যোগসূত্র। কাজেই এগুলো দূর করা, অবলুপ্ত করা বা চাপা দেওয়া আমাদের চিকিৎসার লক্ষ্য নয়। এগুলো আরোগ্য বিধানের আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক।

---

২. In the healthy condition of man the spritual vital force, the dynamis, that animates in material body, rules with unbounded sway, and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations, as regards both sensations and functions, so that our indwelling, reason-gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence | Aphor. 9.

৩. Totality of symptoms is the outorderly reflected picture of the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force - Aphor. 7.

আরোগ্য

আমরা যদি সে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য এমনভাবে দিতে পারি যা জীবনী-শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে তবে সে তা গ্রহণ করে এবং তার আরদ্ধকার্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের বিচ্যুত অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা পুণঃস্থাপন করে। তখন সকল অসুখকর উপসর্গের অবসান ঘটে, ভাললাগা বোধ আবার ফিরে আসে। একেই আরোগ্য (cure) বিধান বলে। এও এক ডাইনামিক প্রক্রিয়ার ফল। চিকিৎসার লক্ষ্য এরূপ অরোগ্য বিধান করা।

ওষুধ

রোগশক্তির ন্যায় ওষুধ ও জীবনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন (inimical)। এজন্য ওষুধ প্রয়োগে দেহতন্ত্রে প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাতে স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ঘটে। অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি হয় এবং রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুস্থদেহে ওষুধ প্রয়োগ করে ওষুধ স্বাস্থ্যের কিরূপ বিচ্যুতি ঘটাতে পারে অর্থাৎ কি ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে তা জানা যায়। একে ড্রাগ প্রুভিং (drug proving) বলে। মেটেরিয়া মেডিকায় ওষুধের এই রোগ উৎপাদক ক্ষমতার অনুপুঙ্খ বিবরণ লেখা আছে।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধেই কেবল রোগ আরোগ্য সম্ভব

অতএব কোন রোগের ক্ষেত্রে যদি এমন ওষুধ প্রয়োগ করা যায় যাতে দেহে ক্রিয়াশীল রোগের মত আরেকটি সদৃশরোগ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহলে দেহতন্ত্রে একই রূপ পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই দু সদৃশ অবস্থা অর্থাৎ রোগ ও তাদের লক্ষণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের পৃথক অস্তিত্ব আর থাকে না। ওষুধ শক্তি যদি রোগ শক্তি থেকে বলবত্তর হয় তবে ওষুধজাত রোগে পূর্বতন প্রাকৃতিক রোগটি এবং ওষুধজাত লক্ষণে প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণ বিলীন হয়ে যায়। ফলে রোগ লক্ষণের সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়। একে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি (homoeopathic aggravation) বলা হয়।

ওষুধটি যদি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তবে তার ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। যদি এটি ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তবে তার ক্রিয়া স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হয়। ফলে রোগী ওষুধজাত এই বৃদ্ধি বিশেষ উপলব্ধি করতে পারেনা এবং সে

বৃদ্ধিও অল্পকালের মধ্যে শেষ হয়। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হলে তার ক্রিয়াজাত স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ও তজ্জন্য লক্ষণসমূহ ও অন্তর্হিত হয়। রোগী তার পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে পায়। একে আরোগ্য বলে অভিহিত করা হয়। আরোগ্য বিধানের এই নীতি হল সদৃশনীতি। যে ওষুধ এরূপ আরোগ্য বিধান করে তাকে সদৃশতম ওষুধ, আরোগ্যকারী ওষুধ বা simillimum বলে।

শক্তি নীতির বিবেচ্য বিষয়

অতএব নির্মল আরোগ্য বিধান করতে হলে ওষুধকে রোগ শক্তি থেকে বলবত্তর হতে হবে এবং একই ডাইনামিক স্তরে কাজ করতে হবে। এজন্য ওষুধকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ডাইনামিক স্তরে কাজ করার উপযোগী করে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। একে শক্তিকরণ প্রক্রিয়া (potentization or dynamization) বলে। এতে ওষুধের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটানো হয়। এই শক্তি (potency) হল ওষুধের এক গুণগত অবস্থা (qualitive state)। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির ওষুধের প্রয়োজন হয়। এজন্য বিশেষ স্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া কোন শক্তিকে ওষুধরূপে ব্যবহার করতে হলে তার উপর চিকিৎসকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। কোনক্ষেত্রে কিরূপ শক্তির প্রয়োজন, কখন সেশক্তি বাড়াতে কমাতে বা প্রশমিত করতে হবে এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই শক্তি নীতির বিবেচ্য বিষয়।

মাত্রা নীতির বিবেচ্য বিষয়

মাত্রা হল পরিমাণ। প্রতিটি রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি কতটা পরিমাণ কতবার প্রয়োগ করলে আরোগ্য ক্রিয়া দ্রুত এবং বিনা কষ্টে সম্পন্ন হবে, কোনটি বৃহৎ মাত্রা, কোনটি ক্ষুদ্র মাত্রা, কখন বৃহৎ মাত্রা, কখন ক্ষুদ্র, কখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে সেসকলই হল মাত্রা নীতির বিবেচ্য বিষয়।

প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়

প্রতিটি রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি কত শক্তিতে, কিরূপ মাত্রায় কখন কতবার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কখন শক্তির পরিবর্তন করতে হবে, মাত্রার রদবদল করতে হবে কিংবা ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে, ওষুধ

প্রয়োগকালীন কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে — এসকলই হল প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়।

এসকল আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে চিকিৎসাকার্যে ওষুধ নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সেই ওষুধটির উপযুক্ত শক্তি নিরূপণ, মাত্রা নির্ধারণ এবং উন্নতমানের প্রয়োগশৈলী। রোগীও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা যথাযথ ভাবে পালন করতে হলে স্বীয় বিষয়ের উপর যেমন গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শিক্ষালব্ধ সেই জ্ঞানকে পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করার সামর্থ্য। কেবলমাত্র সঠিক পথে নিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব।

সারাংশ

১. সদৃশনীতি বলতে কি বুঝায়?

রোগ দিয়ে রোগ সারাও। সদৃশ ওষুধই সদৃশ রোগ আরোগ্য করে। তবে এ সাদৃশ্য হতে হবে সার্বিক। রোগীর ও ওষুধের সঙ্গে প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত সার্বিক সাদৃশ্য।

২. সদৃশনীতির সঙ্গে শক্তি ও মাত্রানীতির সম্পর্ক কি?

শক্তি ও মাত্রা নীতি সদৃশনীতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শক্তি ও মাত্রা উপযুক্ত না হলে ওষুধ কখনও সদৃশ হয়না।

৩. আদর্শ আরোগ্য বিধানের শর্ত কি?

উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন, সেই ওষুধটির উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ এবং তার যথাবিহিত প্রয়োগ।

৪. আরোগ্যকারী ওষুধ (simillimum) কাকে বলে?

যে ওষুধ রোগের সঙ্গে সার্বিক সাদৃশ্যযুক্ত এবং উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রযুক্ত হয় তাকেই আরোগ্যকারী ওষুধ বলে। কেননা এতেই রোগ আরোগ্য হয়।

৫. শক্তি ও মাত্রা বলতে কি বুঝায়?

শক্তি হল ওষুধের গুণগত অবস্থা। মাত্রা হল তার পরিমাণ।

আদর্শ আরোগ্যের শর্ত

আরোগ্য ঃ সকল চিকিৎসা পদ্ধতিরই লক্ষ্য হল রোগ আরোগ্য করা। লক্ষণের উপর ভিত্তি করেই সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করা হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এই আরোগ্য (cure) কথাটির এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা রয়েছে। অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের একেবারে শুরুতেই হ্যানিম্যান চিকিৎসকের লক্ষ্য এবং আরোগ্যের সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন। লক্ষ্য স্থির না থাকলে পথ ঠিক হয় না। হ্যানিম্যান লক্ষ্য যেমন স্থির করে দিয়েছেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করতে হলে সে নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে হবে।

চিকিৎসকের লক্ষ্য

চিকিৎসকের লক্ষ্য কি? চিকিৎসকের মহান ও একমাত্র লক্ষ্য হল রোগীকে তার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া, যাকে আরোগ্য বলে অভিহিত করা হয়।[৪] রোগীর লক্ষণসমূহ শুধু দূর করা নয়, তার স্বাস্থ্যের যে বিচ্যুতি ঘটেছে তা দূর করে তার স্বাস্থ্যের পূর্বেকার অবস্থা পুণঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ আরোগ্য ক্রিয়ার দুটি কাজ যুগপৎ সম্পন্ন করতে হবে — রোগের সার্বিক বিনাশসাধন এবং স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার।

8. The physian's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. Aphro. 1

আরোগ্যের শর্ত

হ্যনিম্যান শুধু আরোগ্যের সংজ্ঞাই নির্দেশ করেননি সেই আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত কতগুলো শর্তও স্থির করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আরোগ্য বিধানের উচ্চতম আদর্শ হলঃ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে, সহজবোধ্য নীতির সাহায্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, রোগীকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে রোগীর স্বাস্থ্যের পুণরুদ্ধারকরণ অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রোগের দূরীকরণ ও বিনাশ।[৫]

আদর্শ আরোগ্য বিধানে সাতটি শর্তের পূরণ আবশ্যক ঃ

১. আরোগ্যক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। রোগী কষ্ট পাচ্ছে বলেই চিকিৎসকের নিকট এসেছে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে কষ্ট দূর করতে হবে।

২. আরোগ্য ক্রিয়া হবে মৃদু ও কষ্টহীন। এমন কিছু করা উচিত হবেনা যাতে রোগীর কষ্ট আরও বেড়ে যায় এবং তাকে দৈহিক ও মানসিক ধকল সহ্য করতে হয়।

৩. আরোগ্যের ফল হবে স্থায়ী। সাময়িক উপশম দেওয়া চিকিৎসার লক্ষ্য নয়।

৪. রোগের সামগ্রিক বিনাশ ঘটাতে হবে। রোগের আংশিক বিনাশ, বা রোগ লক্ষণ চাপা দেওয়া কিংবা অবলুপ্ত করা রোগীর প্রভূত অনিষ্ট করতে পারে।

৫. আরোগ্য ক্রিয়া নির্দোষ হতে হবে। এক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে আরেক রোগে পড়লে তাকে আরোগ্য বলা যায় না।

৬. আরোগ্য ক্রিয়ার পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হতে হবে। রোগীর উপর কোনরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে না, কোনরূপ অস্পষ্টতাও থাকবে না।

৭. এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে একটি নীতি অনুসরণ করে — যা হবে সহজবোধ্য, সহজ পরীক্ষাযোগ্য এবং সহজ অনুসরণযোগ্য।

উপরের এ আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে এরূপ আরোগ্য বিধান কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিতেই সম্ভব যদি ওষুধ নির্বাচন, ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ এবং প্রয়োগ প্রকরণ হ্যানিম্যান নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়।

---

৫ The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of health, or removal and annhilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way, on easily comprehensible principles. Aphor. 2.

হেরিং-এর আরোগ্যের অভিমুখ বিষয়ক নীতি

আরোগ্যক্রিয়া সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা বোঝা যাবে কেমন করে? আদর্শ আরোগ্যের গতি হবে জীবন ধারার মূলস্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং একই অভিমুখে, কখনও বিপরীত পথে নয়। এ বিষয়ে হেরিং একটি নীতি সূত্রবদ্ধ করেন। একে হেরিং-এর আরোগ্য বিষয়ক নীতি বলে। নীতিটি হল ঃ আরোগ্যের অভিমুখ হবে উর্ধ্ব থেকে নিম্ন দিকে, ভেতর থেকে বাইরের দিকে, কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ থেকে অপ্রধান অঙ্গে এবং লক্ষণ সমূহের যেভাবে প্রকাশ ঘটেছিল তার পশ্চাৎ গতিতে অপসরণে।*

আরোগ্য নির্দেশক অবস্থা

১. রোগীর মনে একটা ভাললাগা বোধ জাগ্রত হবে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

২. রোগ লক্ষণগুলোর তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং সেগুলো আর ফিরে আসবে না।

৩. যে কষ্টগুলো দেহের অভ্যন্তরে ছিল কিংবা বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিল সেগুলো ক্রমে ক্রমে দেহের বহিরঙ্গে কেন্দ্রীভূত হবে। চর্মে উদ্ভেদ বা কোন স্রাবের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেতে পারে। এজন্য ওষুধ প্রয়োগে কোন উদ্ভেদ বা স্রাব দেখা দিলে কিংবা কোন চাপাপড়া রোগের পুণঃপ্রকাশ ঘটলে তা সুলক্ষণ। সেগুলো বন্ধ করতে নেই।

৪. মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঙ্গের পীড়াসমূহ ওষুধ প্রয়োগের ফলে চর্ম, হাত, পা, বৃহদন্ত্র, চুল বা নখ প্রভৃতিতে প্রকাশিত হলে তা সুলক্ষণ সূচিত করে।

৫. লক্ষণ সমূহ যেভাবে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তার বিপরীত পথে তার বিলীন হয়ে যাওয়া শুভ সূচনা করে। সকলের শেষে যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটি সকলের আগে বিলীন হবে। কারোর যদি প্রথমে একজিমা, পরে হাঁপানি ও শেষে বাতরোগ দেখা দেয় তবে প্রথমে বাতরোগ সারবে, পরে হাঁপানি এবং তার পরে চর্মরোগের প্রকাশ ঘটবে এবং তা বিলীন হবে এবং কখনও দেখা দেবে না। আজকাল এতরকম জটিল রোগের প্রধান কারণই হল রোগ চাপা দেওয়া।

---

* Hering's law of cure : Cure must take place from above downwards, from within outwards, from centre to perphery, from more important to less important organs, and in the reverse order of the appearance of the symtoms.

একথা শুধু অ্যালোপ্যাথিতে নয় হোমিওপ্যাথিতেও সমভাবে প্রযোজ্য। হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ নির্বাচনে অবহেলা, একসঙ্গে একাধিক ওষুধ প্রয়োগ, সেই ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে তার প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভব।

রোগীর আদর্শ আরোগ্য বিধানই আমাদের লক্ষ্য। অতএব সকলক্ষেত্রে চিকিৎসার সকল পর্যায়ে রোগীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে জানতে হবে নির্বাচিত ওষুধটি কিরূপ শক্তি ও মাত্রায় এবং কেমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, ওষুধটি কেমনভাবে কাজ করবে বলে আমরা আশা করছি এবং ওষুধ প্রয়োগের পর আরোগ্যক্রিয়া ঠিক সেইভাবে সেইপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কি না। সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হল ওষুধ কেমন করে কাজ করে তা জানা।

সারমর্ম

১. আরোগ্যক্রিয়ার কটি পর্যায়, কি কি?

আরোগ্যক্রিয়ার দুটি পর্যায় - রোগের সর্বিক বিনাশ ও পূর্বস্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

২. আদর্শ আরোগ্যের শর্ত কি কি?

রোগীকে কোন কষ্ট না দিয়ে, নতুন কোন লক্ষণ সৃষ্টি না করে দ্রুত ও স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নির্মল আরোগ্য বিধান করা।

৩. আরোগ্য ক্রিয়া সঠিক পথে যাচ্ছে কি না বোঝার উপায় কি?

হেরিং-এর আরোগ্যের অভিমুখ বিষয়ক নীতি অনুসরণ করে।

৪. আদর্শ আরোগ্য বিধানের সঙ্গে শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

সুনির্বাচিত ওষুধ উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় যথাবিহিতভাবে প্রয়োগ করলেই কেবল আদর্শ আরোগ্য বিধান সম্ভব হয়। নচেৎ ফল কখনও শুভ হয় না।

ওষুধের ক্রিয়ার ধারা রোগ ও ওষুধের সম্পর্ক

ওষুধ রোগ আরোগ্য করে। অতএব রোগের সঙ্গে ওষুধের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সেসম্পর্ক কি এবং কেমন করেই বা সেসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ওষুধ রোগ সারায়? এ সম্পর্ক তিনধরনের হতে পারে - বিপরীত, বিসদৃশ এবং সদৃশ। অন্যান্য পদ্ধতিতে বিপরীত ও বিসদৃশ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। হোমিওপ্যাথিতে সদৃশ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করা হয়। এর কারণ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, কেননা ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ এবং প্রয়োগকলা এর উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়া

ওষুধের দু'ধরনের ক্রিয়া আছে - প্রাথমিক ক্রিয়া ও গৌণ ক্রিয়া। প্রাথমিক ক্রিয়া (primary action) হল জীবদেহে ওষুধ প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বা সরাসরি ক্রিয়া (direct action). অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে এমন ওষুধ প্রয়োগ করা হয় যার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া রোগীর লক্ষণ সমূহের বিপরীত লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন করতে পারে, অথবা এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে রোগীর লক্ষণগুলো সরাসরি প্রশমিত, অবরুদ্ধ বা বিলুপ্ত হতে পারে। রোগলক্ষণ যত তীব্র হয় ওষুধ তত তীব্র ক্রিয়াশীল ও অধিক প্রযুক্ত হয়। এজন্য জ্বর হলে জ্বরনাশক, ব্যথা হলে ব্যথানাশক, আক্ষেপ হলে আক্ষেপনাশক, জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে জীবাণুনাশক ইত্যাদি এন্টি বা বিপরীতধর্মী ওষুধ প্রধানতঃ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধগুলোকে প্রতিকারক (anti), অবসাদক (depressive), উদ্দীপক (stimulant), জীবাণুনাশক (antibiotic), বলকারক (tonic) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। রোগীর বিভিন্ন রোগ বা উপসর্গ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ওষুধ একসঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়। এসকল ওষুধের

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রশমনের জন্যও যুগপৎ ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। একজন লোকের একসঙ্গে একাধিক রোগ আছে বলে ধরে নিয়ে প্রত্যেকটি রোগ বা উপসর্গের জন্য আলাদা আলাদা ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে রোগের দ্রুত উপশম ঘটে।

কিন্তু তা সাময়িক। অনতিকাল পরে ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় নীতিটি হল, প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।* ফলে সাময়িক উপশমের পর পূর্বতন কষ্টগুলো আরও বর্ধিত আকারে ফিরে আসে। ওষুধ উগ্রঅবস্থায় প্রযুক্ত হয় বলে তার ক্রিয়ায় রোগ লক্ষণের যেমন দ্রুত প্রশমিত হয় তার ক্রিয়ার শেষে প্রতিক্রিয়াও তেমনি তীব্র হয়। এজন্য রোগ লক্ষণের পুনঃপ্রকাশও তীব্র হয়। সে অবস্থা প্রতিকারের জন্য আবার ওষুধ আরও অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। অচির পীড়ার ভোগকাল যেহেতু সীমিত কাজেই রোগও একদিন সেরে যায়। কিন্তু রোগীর স্বাস্থ্যের অশেষ অনিষ্ট হয়। চিররোগের ক্ষেত্রে রোগ ক্রমাগত চাপা দেওয়ার ফলে রোগ জটিল হয়, রোগীর অবস্থা খারাপ হয়, রোগ ক্রমে দুরারোগ্য হয়। এপথ কখনও আরোগ্যের পথ হতে পারেনা।

গৌণ ক্রিয়া

সদৃশমতে ওষুধ প্রয়োগ করলে ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় রোগী যে লক্ষণগুলো বর্তমান রয়েছে তদ্রূপলক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হয়। সদৃশ ওষুধটি এমনভাবে শক্তিকৃত করা হয় অর্থাৎ এমন অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় তাতে রোগশক্তি দেহে যে স্তরে ক্রিয়াশীল রয়েছে সে স্তরে ক্রিয়া করতে পারে। এর ফলে তদ্দ্বারা সৃষ্ট লক্ষণসমূহ পূর্বতন রোগ দ্বারা অধিকৃত স্থানেই প্রকাশিত হয় (লক্ষণসমূহের সাদৃশ্যহেতু) এবং একই পথ ধরে বিস্তার লাভ করে। দুই সদৃশ শক্তি তখন দেহের একই ভূমিতে একই সময়ে একই ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে দুই পৃথক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট কিন্তু সদৃশ লক্ষণসমূহ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের আর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকেনা। ওষুধ শক্তি যদি রোগ শক্তি থেকে বলবত্তর হয় তবে ওষুধজাত লক্ষণ সমূহে রোগের লক্ষণ সমূহ বিলীন হয়ে যায়। ফলে রোগ লক্ষণের সাময়িক বৃদ্ধি ঘটে। একে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলা (homoeopathic aggravation) হয়।

---

* Newton's third law of motion : To every action there is an equal and opposite reaction.

ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগের কারণ

ওষুধ যদি ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রযুক্ত হয় তবে তার ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ার শেষে গৌণক্রিয়া শুরু হয়। এই ক্রিয়া প্রাথমিক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত। ওষুধের মাত্রার পরিমাণ যত ক্ষুদ্র করা যায় এই বৃদ্ধির কালও তত কম হয়। ওষুধ ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রযুক্ত হলে এই বৃদ্ধি বিশেষ অনুভব হয় না। ওষুধের ক্রিয়ার শেষে তার দ্বারা উৎপাদিত লক্ষণ সমূহও তিরোহিত হয়। তখন রোগের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না এবং দেহী তার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পায়। অর্থাৎ রোগের সার্বিক বিনাশ ঘটে এবং রোগী নির্মল আরোগ্য লাভ করে।

শক্তিকৃত ওষুধ ব্যবহারের কারণ

রোগশক্তি যেহেতু ডাইনামিক স্তরে কাজ করে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটে সেজন্য ওষুধকে সে স্তরে ক্রিয়া করার সামর্থ্য থাকতে হবে যাতে সে অবস্থাকে আবার পরিবর্তিত করতে পারে। এজন্য ওষুধকে শক্তি হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। এশক্তির পরিমাণ কতটা? ফরাসী বিজ্ঞানী মোপার্সিয়াস (Maupertious) এর সূত্র অনুযায়ী প্রকৃতি রাজ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটন করতে হলে যে ক্রিয়া শক্তির প্রয়োজন তার পরিমাণ যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। ডাঃ ফিঙ্কের মতে, রুগ্নদেহে বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে যে ক্রিয়াশক্তির প্রয়োজন তার পরিমাণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।[৮] অর্থাৎ নির্বাচিত ওষুধটি শক্তিকৃত অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ওষুধের এই আরোগ্যদায়ক ক্রিয়াধারার বিষয়টি একটি রেখাচিত্রের (graph) সাহায্যে বোঝান হল।[৯] জীবনীশক্তির গতিপ্রকৃতি ধরার জন্য যদি কোন যন্ত্র থাকত এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার রেখাচিত্র অঙ্কন করা যেত তবে জীবনীশক্তির সুস্থাবস্থা, রুগ্নাবস্থা এবং আরোগ্যাবস্থা সেই রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝান যেত। সেই অনুদ্ভাবিত যন্ত্রে নিম্নাঙ্কিত কল্পিত রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝান হল।

---

৮. Maupertious's law of the least quantity : The quantity of action necessary to effect any change in nature is the least possible. According to Dr. Fincke, 'The decisive moment is always a minimum, an infinitesimal.' - Stuart Close, the Genius of Homoeopathy, Haren Brothers. Calcutta -Page 23.

৯. গ্রন্থকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধান ও আরোগ্য কলা। পৃষ্ঠা ৮৪
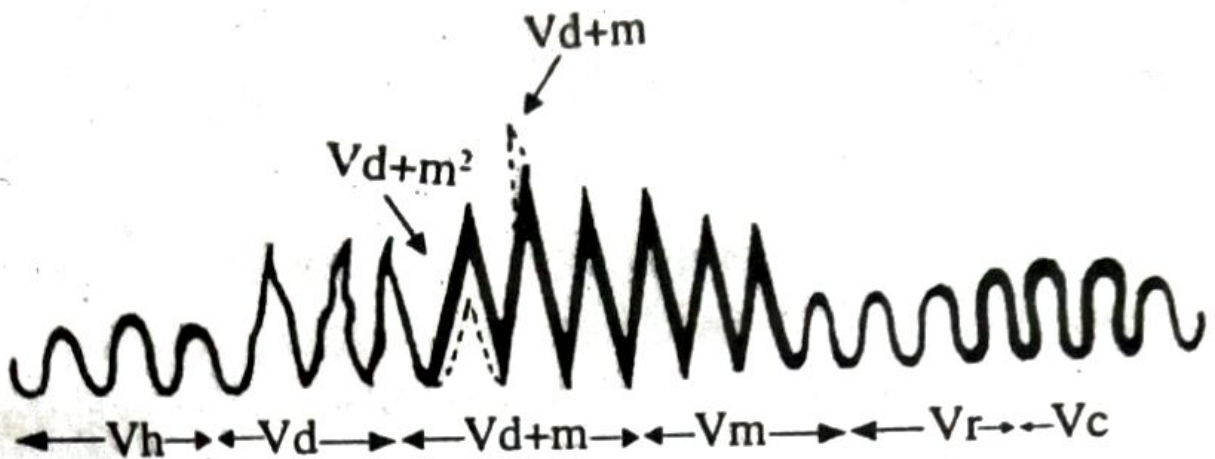
ক) জীবনীশক্তির সুস্থাবস্থা যে রেখাচিত্র অঙ্কন করবে তাকে আমরা Vh বলব (v - vital force, h - health). এ ছন্দময়। এর curve এর কোণ গোলাকৃতি।

খ) রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে সে ছন্দের পতন ঘটে। আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম শুরু হয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় curve টি খাড়া ও সূচাল হয়। একে আমরা Vdবলব (d-disease). Vd হল Vh এর পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের পরিবর্তিত অবস্থা হল রোগ। এর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই।

গ) সদৃশমতে নির্বাচিত ওষুধ এমন শক্তিতে প্রয়োগ করা হয় যা রোগ শক্তি থেকে কিঞ্চিত বলবত্তর। ওষুধ শক্তি সদৃশ অথচ সামান্য বলবত্তর হওয়ায় curve এর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হবেনা। কিন্তু বর্ধিত ক্রিয়ার জন্য curveটি কিছু বড় ও মোটা হবে। একে আমরা Vd+m (d- disease, m-medicine) বলব। এটি হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি নির্দেশক curve $Vd < Vm < Vd+m$

ঘ) ওষুধ শক্তি যদি রোগ শক্তি থেকে কম হয় তবে curve টি একই প্রকার হবে। কিন্তু রোগশক্তির curve এর চেয়ে ছোট হবে। এটিকে আমরা $Vd+m_1$ বলে অভিহিত করব। ফলে এটি রোগ শক্তিকে পুরোপুরি আবৃত করতে পারবে না। ফলে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হবে না। সাময়িক উপশমের পর আবার তার প্রকাশ ঘটবে।

ঙ) ওষুধটি যদি অত্যন্ত অধিক শক্তিতে প্রযুক্ত হয় তবে রোগলক্ষণের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটবে। রোগীর কষ্ট বাড়বে। একে আমরা $Vd+m_2$ বলে অভিহিত করব।

চ) সদৃশ অথচ সামান্য বলান্তর ওষুধ শক্তিতে রোগ বিলীন হয়ে যাবে। তখন কেবলমাত্র ওষুধ শক্তির প্রভাব বর্তমান থাকবে। ফলে curve এর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হবে না। কেবল রেখাচিত্রটি কিছুটা কৃশ হবে। একে আমরা Vm বলে অভিহিত করব। এই রেখাচিত্র থেকে এটা পরিষ্কার হবে যে $Vd < Vd+m < Vm$ অর্থাৎ চেহারা বা লক্ষণ স্বরূপে রেখাচিত্র প্রায় একরূপ হলেও ক্ষমতার তারতম্যহেতু রেখাচিত্র মোটা বা সরু হয়।

ছ) ওষুধ ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রযুক্ত হয়। ফলে ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। তখন গৌণক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে পূর্বতন অবস্থা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করে। curveটি রোগাক্রমণের পূর্বের অবস্থার দিকে ফিরে আসতে থাকে। একে আমরা Vr (r-recovery) বলে অভিহিত করব। এ অবস্থা ক্রমশ আরোগ্যের অবস্থায় পরিণত হয়। একে আমরা Vc (c-cure) বলে অভিহিত করব। এ অবস্থায় রোগী তার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পায়। আমরা বলি রোগ আরোগ্য হল। অর্থাৎ $Vc=Vh$

উপরের এই আলোচনা থেকে এবিষয় পরিষ্কার হবে যে ঃ

১. হোমিওপ্যাথিক ওষুধ রোগের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রাম করেনা। ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় রোগের সদৃশ আরেকটি রোগ সৃষ্ট হয়।

২. রোগাক্রমণ ও আরোগ্যসাধন উভয় প্রক্রিয়া জীবনীশক্তির মাধ্যমে এবং রোগ শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়।

৩. ওষুধের গৌণ ক্রিয়ায়ই আরোগ্যকারী ক্রিয়া।

৪. ওষুধ উপযুক্তভাবে শক্তিকৃত না হলে আদর্শ আরোগ্য সাধন সম্ভব নয়।

৫. মাত্রা অত্যন্ত কম না হলে প্রাথমিক ক্রিয়াকাল দীর্ঘ হয়, গৌণ ক্রিয়া অর্থাৎ আরোগ্যদায়ক ক্রিয়া শুরু হতে দেরী হয়। রোগীর কষ্ট বাড়ে।

৬. আদর্শ আরোগ্য বিধান করতে হলে ওষুধ কেবলমাত্র সদৃশ হলেই হবে না, উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় অবশ্যই তা প্রয়োগ করতে হবে।

সারমর্ম

১. ওষুধ ও রোগের সম্পর্ক কি কি?

বিপরীত, বিসদৃশ বা সদৃশ।

২. অন্যান্য পদ্ধতিতে ওষুধের কোন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়?

বিপরীত বা বিসদৃশ। ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় সরাসরি রোগের মোকাবিলা করা হয়। এজন্য ওষুধ স্থূলমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

৩. হোমিওপ্যাথিতে ওষুধের কোন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়?

সদৃশ। ওষুধের গৌণ ক্রিয়া রোগ আরোগ্য করে। এজন্য মাত্রা ক্ষুদ্রতম হওয়া আবশ্যক।

৪. আদর্শ আরোগ্য বিধানে ওষুধের শক্তি ও মাত্রার ভূমিকা কি?

সদৃশ ওষুধ রোগ সৃষ্টি করে। উপযুক্তভাবে শক্তিকৃত ওষুধ প্রাকৃতিক রোগের ক্রিয়াভূমিতে এক সদৃশ রোগকে সৃষ্টি করে যা পূর্বতন রোগ থেকে বলবত্তর। বলবত্তর এই কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত রোগে পূর্বতন রোগটি বিলীন হয়। ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ওষুধের প্রয়োগের ফলে প্রাথমিক ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। বিপরীত গৌণ ক্রিয়া শুরু হয়, যা স্বাস্থ্যের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনে। কাজেই আদর্শ আরোগ্য বিধানের প্রধান শর্ত উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় সদৃশ ওষুধ প্রয়োগ।

আরোগ্য ক্রিয়ায় শক্তি ও মাত্রার ভূমিকা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা

চিকিৎসাকার্যে ওষুধের শক্তি ও মাত্রার ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা দিয়ে বোঝান হল।

একটি শিশুর জ্বর হয়েছে। কয়েকদিন ধরে গা ম্যাজম্যাজ করছিল। এখন সর্দি ও জ্বর চলছে। জ্বর কমাবার জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কয়েকবার খাওয়ানো হয়। তাতে জ্বর কমে। সর্দি শুকিয়ে কাশি হয়। জ্বর আবার আসে। গাত্রোত্তাপ ১০২° ফাঃ এর কাছাকাছি থাকছে। কমেনা, কিন্তু ১০৩/১০৪ উঠে যায়। শুষ্ক, কষ্টকর কাশি। কাশির সময় বুকে খুব লাগে। কাঁদে। সারা শরীরে ব্যথা। মাথা ব্যথা। টিপে দিলে একটু আরাম লাগে। নড়াচড়া করতে চায় না। তাতে ব্যথা বাড়ে। ঘাম নেই। মুখ, গাত্রচর্ম শুষ্ক। খিদে নেই, কিন্তু পিপাসা যথেষ্ট। অনেকক্ষণ পরপর অনেকটা জল খায়। কোষ্ঠকাঠিন্য। মল শুষ্ক। মূত্র লাল, অল্প। জ্বর বাড়লে বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে, আমি বাড়ি যাব, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন, এ অবস্থায় আমরা কি ওষুধ দেব? আমরা কি এমন ওষুধ দেব যার প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষক্রিয়ায় জ্বর কমে যায়, ব্যথা বেদনা কমে যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়? জ্বর নাশক ওষুধ দিয়ে দেখা গেছে যে তাতে জ্বর চাপা পড়ে, সারে না। কষ্টকর উপসর্গ আরও বাড়ে। রোগলক্ষণ দেহস্তর থেকে মনস্তরে প্রসারিত হয়েছে। এ আরোগ্যের পথ হতে পারে না। এ আরোগ্যের বিপরীত পথ। আমরা তাই আমাদের রোগীটির (the sick) দিকে আবার তাকাই। সেখানে কি ঘটছে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা বুঝতে পারি রোগীতেএকটা সংগ্রাম চলছে, আত্মরক্ষার সংগ্রাম। রোগ শক্তির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জীবনী শক্তির স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। তারই ফলশ্রুতিতে গাত্রোত্তাপ বাড়ছে, সারা গায়ে ব্যথা হচ্ছে, শ্লেষ্মাপর্দা শুষ্ক হয়ে আসছে, পিপাসা পাচ্ছে, কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে, নড়াচড়ায় সব কষ্ট আরও বাড়ছে। এসকল লক্ষণের মাধ্যমে জীবনীশক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে সে কি

ভাবে রোগমুক্ত হতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। এগুলোর মাধ্যমে সে আমাদের কাছে সাহায্য চাইছে, এমন সাহায্য যা কাজে লাগিয়ে সে তার সংগ্রাম তীব্রতর করতে পারে এবং তদ্দ্বারা তার আরব্ধ কার্য তার নির্দিষ্ট পথে দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। এগুলো একটা সতর্কবাণীও - এমন কিছু করোনা যাতে আমার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাতে অনিষ্ট হবে।

আমরা তাই এমন ওষুধ প্রয়োগ করবনা যাতে গাত্রোত্তাপ কমে যায়, ব্যথা বেদনা, শুষ্কতা কমে যায়। বরং এমন ওষুধ দেব যার প্রাথমিক ক্রিয়ায় এসকল কষ্টকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। মেটেরিয়া মেডিকা থেকে আমরা জানি ব্রায়োনিয়া ওষুধটি এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। অতএব ব্রায়োনিয়া হল সদৃশ ওষুধ।

এই ওষুধটি রোগীতে কত শক্তিতে কিরূপ প্রয়োগ করব? রোগীর (the sick) অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা যদি মূল আরক (θ) প্রয়োগ করি তাহলে রোগীতে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না, কেননা রোগশক্তি যে স্তরে কাজ করছে ওষুধ সে স্তরে পৌঁছতেই প্যরবে না। ব্রায়োনিয়া ৩ বা ৬ প্রয়োগ করলে সামান্য উপশম ছাড়া বিশেষ কিছু অনুভূত হবে না। ওষুধটি যদি ৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করা হয় তবে রোগের লক্ষণগুলোর উপশম ঘটবে। কিছুকাল পরে আবার দেখা দেবে। ওষুধটি সেই শক্তিতে আবার প্রয়োগ করলে আবার উপশম দেখা দেবে, তারপর রোগ লক্ষণের পুনঃপ্রকাশ ঘটবে। বারবার ওষুধ প্রয়োগ করে সে অবস্থা সামাল দিতে হবে। রোগটি যেহেতু অচির প্রকৃতির পীড়া এবং মারাত্মক ধরনের নয় সেজন্য একদিন রোগ সারবে। কিন্তু রোগীর ভোগকাল বাড়বে, কষ্ট বাড়বে, দূর্বল হয়ে পড়বে এবং পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেতে কষ্ট হবে। একে আদর্শ আরোগ্য বিধান বলা চলে না। এতে চিকিৎসকের দক্ষতা প্রমান হয় না।

এক্ষেত্রে রোগীর মানসিক লক্ষণসহ অন্যান্য লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সেগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্রায়োনিয়াকে নির্দেশ করছে, শিশুটির বয়স অল্প এবং রোগ চাপা দেওয়ার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে সেজন্য ব্রায়োনিয়া ২০০ শক্তিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শক্তি এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ কর হল। এবার আমরা কি আশা করতে পারি?

ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় গাত্রোত্তাপ কিছুটা বেড়েছে, ব্যথা বেদনার সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। ওষুধ ক্ষুদাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়েছে বলে অনতি বিলম্বে

তার ক্রিয়া শেষ হয়েছে। গৌণ ক্রিয়া শুরু হতেই জ্বর কমতে শুরু করেছে, ব্যথা বেদনা কমছে। তখন দেখা গেল শিশুর সারা গায়ে হাম বের হল। শিশুটির মনে প্রফুল্লভাব ফিরে এল। সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হতে শুরু করল।

এবার আমরা কি করব? আরোগ্যক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ওষুধটি আরও এক বা একাধিক মাত্রা প্রয়োগ করব কি?

ওষুধের প্রথম মাত্রা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি তার যে দ্রব্যটি পাওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল সেটি পেয়ে গেছে এবং পুরোবিক্রমে তার আরব্ধকার্য সম্পাদনে তৎপর হয়েছে। এটা তারই কাজ। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগাক্রমণে আত্মরক্ষার দায়িত্ব তার। তার কাজ তাকে সম্পন্ন করার সময়ও সুযোগ দিতে হবে। তা না করে আমরা যদি আবার ওষুধ প্রয়োগ করি তা হলে কি হবে? জীবনীশক্তিকে একদিকে রোগশক্তি এবং অন্যদিকে এই অনভিপ্রেত ওষুধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করতে হবে। কেননা এ উভয় শক্তিই জীবনীশক্তির প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন (inimical)। তাতে আরোগ্য ক্রিয়া শুধু ব্যহত হবে তা নয়, রোগীর অহেতুক কষ্ট বাড়বে। অতএব প্রথম মাত্রায় কাজ হলে এবং সেকাজ অব্যাহত থাকলে দ্বিতীয় মাত্রা কখনও প্রয়োগ করতে নেই। রোগীর ভাল লাগাবোধ যতক্ষণ বজায় থাকবে ততক্ষণ ওষুধের কাজ চলছে বলে বুঝতে হবে। তখন অপেক্ষা করার পালা। ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করলে দেখা যাবে যে ঐ একমাত্রায়ই শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। এবং যখন সুস্থ হচ্ছে তখন সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ হচ্ছে, রোগের লেশমাত্র তখন অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা যদি ওষুধটি এক হাজার শক্তিতে প্রয়োগ করতাম তাতে কি ঘটত? তাতে রোগীতে প্রতিক্রিয়া তীব্র হত, গাত্রোত্তাপ ও ব্যথা বেদনা অত্যন্ত বাড়ত, হামগুলো একসঙ্গে প্রচণ্ড আকারে বের হত। এতে শিশুটির কষ্ট বাড়ত এবং রোগ সেরে গেলেও তার ধকল কিছুকাল থেকে যেত এবং সে দুর্বল হয়ে পড়ত। এ ধরনের আরোগ্যকে আদর্শ আরোগ্য বলা যায় না এবং কোন চিকিৎসকই তা চাননা।

এ আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে শিশুতে হাম রোগ শক্তি সংক্রামিত হয়েছিল এবং জীবনীশক্তি সেই হামশক্তিকে দেহ থেকে বের করে দিয়ে দেহ যন্ত্রটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, যার ফলে জ্বর গাত্র বেদনা ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল। আমরা যদি প্রকৃতির এই সহজ সরল ভাষা না বুঝে প্রকৃতির বিপরীত

পথে চলি তবে রোগীর কষ্টের সাময়িক উপশম হলেও পরিণাম ক্ষতিকর হত। অথচ সহজ সরল পথে অগ্রসর হলে রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য লাভ কত সুন্দরভাবে সাধিত হয়। এটাই স্বাভাবিক পথ, তাই এ সুন্দর, এ সৃজনশীল। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা করে চলার নামই হোমিওপ্যাথি।

সার সংক্ষেপ

১. উপযুক্ত ওষুধ বলতে কি বুঝায়?

সদৃশ ওষুধই উপযুক্ত ওষুধ।

২. উপযুক্ত শক্তি বলতে কি বুঝায়?

ওষুধের যে শক্তি রোগশক্তি থেকে সামান্য বলবত্তর এবং একই স্তরে ক্রিয়া করে রোগ শক্তির মোকাবিলা করতে পারে তাই উপযুক্ত শক্তি।

৩. উপযুক্ত মাত্রা বলতে কি বুঝায়?

ওষুধের ততটা পরিমাণ যা রোগীতে বর্তমান লক্ষণ সমূহ সৃষ্টি করবে অথচ অনতিকালের মধ্যে গৌণ ক্রিয়ায় সেগুলো বিলীন হয়ে যাবে, নতুন কোন লক্ষণ দেখা দেবে না।

প্রবণতা

শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে প্রবণতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়

এ পৃথিবীতে কারণ (cause) ছাড়া কিছু ঘটে না। সুস্থ থাকার পেছনেও কিছু কারণ বর্তমান থাকে। কারণ ছাড়া কোন রোগও হয় না। প্রকৃতপক্ষে রোগ হল কারণ সম্ভূত এক ঘটনা (causal phenomenon)। কাজেই আরোগ্য বিধান করতে হলে সে কারণ সনাক্ত করতে হবে এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আরোগ্য বিধান হল কারণের প্রতিকার। সুস্থ থাকার, রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং আরোগ্য বিধান প্রধানতঃ যার উপর নির্ভর করে তার নাম প্রবণতা (susceptibility).

প্রবণতা

জীবের কিছু স্বাভাবিক ধর্ম (fundamental attribute) থাকে। উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া (to react to stimuli) এদের মধ্যে অন্যতম। জীবের এই মৌলিক ধর্ম জীবদেহে একটা বিশেষ অবস্থা (state or condition) হিসাবে বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থাকে প্রবণতা বলে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবসমূহে জীব কিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে (nature of reaction to internal and external influences) তা প্রধানতঃ প্রবণতার উপর নির্ভর করে। এই প্রতিক্রিয়ার ধরনের উপর মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগ নির্ভর করে। এজন্য ওষুধ নির্বাচন, সেই ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ এবং তার প্রয়োগবিধি এই প্রবণতার উপর নির্ভর করে। এজন্য হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করতে হলে প্রবণতা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে প্রবণতাই হবে আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

স্বাস্থ্য ও প্রবণতা

জীবন নিয়ত ক্রিয়াশীল, গতিশীল। জীবনক্রিয়া নিয়ত বিরামহীনভাবে চলে। এর ফলে মানবদেহে সর্বদাই ক্ষয়ক্ষতি হয়, অভাব সৃষ্ট হয়। দেহতন্ত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অভাব বা শূন্যতা থেকে তা পূরণ করার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা চাহিদার সৃষ্টি হয়। জৈবিক কারণে আমাদের দেহতন্ত্রে এভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাতে যথোপযুক্ত সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রবণতার উপর নির্ভর করে। ক্ষুধা পিপাসার প্রতি উপযুক্ত সাড়া দেওয়া, খাদ্য পেলে তা গ্রহণ করা, পরিপাক করা ও আত্তীকরণ করা (assimilate) এবং পুষ্টিলাভ, ক্ষয়পূরণ ও রেচন (excretion) সকলই প্রবণতার উপর অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। প্রবণতা বলতে আমরা তাই বুঝি কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা (desire), আকর্ষণ (attraction) বা ঝোঁক (affinity)। প্রবণতা দেহতন্ত্রে কোন কিছুর অভাব (need), চাহিদা (demand) বা ক্ষুধা (hunger) সূচিত করে। অভাব বোধ থেকেই বাঞ্ছিত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষন বাড়ে, এক প্রকার দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। এজন্য সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য যদি তার গ্রহণ করার মত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে প্রাণসত্তা (vital principle) তা গভীরভাবে আকর্ষণ করে এবং তা আত্মসাৎ করে পরিতৃপ্ত হয়। তার চাহিদার নিবৃত্তি ঘটে। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। তার জীবন ক্রিয়া স্বাভাবিক ছন্দে অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। জীবনের এ হল স্বাভাবিক ধর্ম। এই হল সুস্থতার লক্ষণ। একে জীবের স্বাভাবিক গ্রহণ ক্ষমতা বা সুস্থ প্রবণতা (normal susceptitility) বলে। [১০]

স্বাভাবিক প্রবণতা

স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনের গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় এ যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তেমনি আত্মরক্ষা মূলক ক্রিয়াতেও (defensive function) এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ হল তার জীবনের মূলধন। এই তার আত্মরক্ষার শক্তির উৎস। সুস্বাস্থ্যই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এজন্য চিকিৎসকের অন্যতম প্রধান কাজ হল এই সুস্থ প্রবণতাকে অক্ষুন্ন রাখা। ওষুধ প্রয়োগ বা অন্য কোন ভাবে এ সম্পদের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

১০. লেখকের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্য কলা। পৃষ্ঠা - ৪০

সুস্থ প্রবণতার ক্ষতিসাধন

দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকাল আধুনিক চিকিৎসায় এমন সকল ওষুধ ঐমন পরিমাণে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে মানুষের এই সুস্থ প্রবণতার অপূরণীয় ক্ষতি হয়। মানুষ একরোগ থেকে মুক্ত হয়ে আরেক রোগের শিকার হয় এবং ক্রমে ক্রমে এক জটিলপ্রকৃতির চিররোগের রোগীতে পরিণত হয়। হ্যানিম্যান ওষুধ সৃষ্ট এই ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে বারবার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এ অবস্থা প্রতিকারের বিশেষ কোন পথ নেই এবং থাকতে পারে না।[১১] এ অবস্থা কেবলমাত্র অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে ঘটে তা নয়, হোমিওপ্যাথিতে ঘটা সম্ভব এবং ঘটে। হোমিওপ্যাথিতে শক্তিকৃত ওষুধ যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করলে মানুষের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয় তার ফল সুদুর প্রসারী হয় এবং তার প্রতিকারের কোন পথই প্রায় খোলা থাকে না। অতএব চিকিৎসার নামে আমরা এমন কিছু যেন না করি যাতে মানুষের আপাত হিতের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী অহিত না হয়।

এজন্য ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিষয়ে এত যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কেন্টের বিখ্যাত উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনেক রোগী দেখার পর (আত্মবীক্ষা করলে) তুমি দেখবে তুমি তাদের মধ্যে কয়েক জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছ। আমাদের ওষুধগুলোর যদি মানুষের মৃত্যু ঘটাবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাদের রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতাও নেই। এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে উচ্চ শক্তির ব্যবহার করা মানে ক্ষুর নিয়ে কাজ করা। আমি বরং উন্মুক্ত ক্ষুর হাতে এক জন নিগ্রোর সঙ্গে একঘরে থাকতে রাজি আছি কিন্তু উচ্চ শক্তির ওষুধ ব্যবহারকারী অজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে নয়। উচ্চ শক্তির ওষুধগুলো যেমন অশেষ অপকার করতে পারে তেমনি অশেষ উপকারও করতে পারে।[১২]

---

১১. These inroads on human health effected by the allopathic nonhealing art (more particularly in recent times) are of all chronic diseases, the most deplorable, the most incurable, and I regret to add that it is apparently impossible to discover or to hit upon any remedies for their cure when they have reached any considerable height. Aph. 75.

১২. After you have seen a great many cases you will find that you have killed some of them. If our medicines were not powerful enough to kill folks, they are not powerful enough to cure sick folks. It is well for you to realise that you are dealing with razors when dealing with high potencies. I would rather be in a room with a dozen negroes slashing with razors than in the hands of an ignorant prescriber of high potencies. They are means of tremendous harm as well as of tremendous good - Kent. Lectures on Meteria Medica Sett. Dey & Co. Page- 526

রোগ প্রবণতা

মানুষের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন প্রবণতার উপর নির্ভর করে তেমনি রোগের সংক্রমণ ও তার প্রকাশধারাও প্রবণতার উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতার যখন হানি বা বিচ্যুতি ঘটে তখন মানুষ রোগের সহজ শীকার হয়ে পড়ে। এই বিকৃতি প্রবণতাকেই রোগ প্রবণতা (morbid susceptibility) বলে।

রোগ প্রবণতার কারণ

সুস্থ প্রবণতার জন্য আমরা সর্বদা নানারকম রোগ শক্তি দ্বারা পরিবৃত থাকলেও রোগাক্রান্ত হই না। মানুষের দেহে কোন রোগের প্রতি প্রবণতা বা দুর্বলতা না থাকলে সে সেই রোগ আকর্ষণ করতে পারে না। অর্থাৎ রোগ সংক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা চাই। যার যেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ বিশেষ রোগের প্রতি প্রবণতা থাকে সে সহজেই সে রোগের তেমন সহজ শিকার হয়। এজন্যই কেউ প্রায়ই সর্দি কাশিতে ভোগে, কারোর প্রায়ই জ্বর হয়, কারোর আক্ষেপ, কারোর পেট খারাপ, কারোর রক্তপাত বা কোন স্রাব, কেউ আবার সর্বদাই একটা না একটা রোগে ভোগে।

রোগ প্রবণতায় মায়াজমের ভূমিকা

চিররোগবিষ (chronicmiasm) মানবদেহে রোগ সংক্রমণের জন্য এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই রোগবিষ দেহকোষ ও মনকোষকে বিক্ষত করে, ঘুণ ধরার ন্যায় দেহে একপ্রকার দুর্বলতার সৃষ্টি করে, তার প্রতিরোধ ক্ষমতায় চিড় ধরায়। এই বিক্ষত অবস্থা একটা কলঙ্কের (stigma) মত। জিনের মধ্য দিয়ে এ অবস্থা, এ দুর্বলতা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি চাপে এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ঘাত প্রতিঘাতে এ বিক্ষত অবস্থা তত প্রকট হতে থাকে। এ সময় কোন উদ্দীপক কারণ (exciting cause), যা কোন দৈহিক বা মানসিক আঘাত, অনিয়ম, পরিবেশ বা পরিস্থিতির প্রতিকূল প্রভাব, রোগ বীজাণু হতে পারে, বিস্ফোরকের মত কাজ করে। সুপ্তরোগাবস্থা তখন রোগরূপে প্রকাশ পায়। মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার জন্য ৩টি শর্তের পূরণ আবশ্যক — সে রোগের প্রতি প্রবণতা, রোগ শক্তি ও রোগ প্রবণতার একই ভূমিতে অবস্থান (on the same plane of vibration) এবং রোগ বিকাশের জন্য কোন তাৎক্ষণিক কারণ।

প্রবণতা ও আরোগ্য ক্রিয়া

রোগের সংক্রমণ যেমন রোগ প্রবণতার উপর নির্ভর করে রোগের আরোগ্য বিধানও তেমনি এই প্রবণতার উপর নির্ভর করে। সুস্থাবস্থায় মানুষের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, রুগ্নাবস্থায় তেমনি ওষুধের প্রয়োজন হয়। সুস্থাবস্থায় প্রবণতার পরিতৃপ্তি হল ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসুখ। রুগ্নাবস্থায় প্রবণতার পরিতৃপ্তি হল আরোগ্য লাভ, পূর্বস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার। আরোগ্য হল রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি, রোগের মূলকারণের বিনাশ। মূল কারণের বিনাশ হল মায়াজমের প্রতিকার। ওষুধ উপযুক্তভাবে শক্তিকৃত না হলে মায়াজমের প্রতিকার করা কখনও সম্ভব নয়। তাহলে আরোগ্য বিধানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পথ কি? সকল ক্ষেত্রে লক্ষণ সমষ্টি (totality of symptoms) হল আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। লক্ষণ সমষ্টি রোগ প্রবণতা তথা রোগের পরিচয় দেয়, মায়াজমকে সনাক্ত করে এবং রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটাবার ওষুধও নির্দেশ করে। অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি যেমন রোগকে প্রকাশ করে তেমনি রোগের বিনাশের উপায়ও নির্দেশ করে। এজন্য সদৃশ ওষুধ উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগের পূর্ণ বিনাশ ঘটে এবং পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে আসে এই হলো নিশ্চিত পথ, একমাত্র পথ।

এখন তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়, ওষুধের উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য উপায় কি? পরবর্তী অধ্যায়গুলো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে।

সারমর্ম

১. শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কি?

প্রবণতা।

২. প্রবণতা কি?

বাইরের উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া করার স্বাভাবিক ক্ষমতা।

৩. প্রবণতা কত প্রকার?

দু প্রকার - সুস্থ প্রবণতা ও রুগ্ন প্রবণতা।

৪. রুগ্ন প্রবণতার কারণ কি?

ক্রনিক মায়াজম।

৫. আরোগ্য সাধনের নির্ভরযোগ্য উপায় কি?

রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটানো। সদৃশ ওষুধ উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটে, রোগের সার্বিক বিনাশ ঘটে, আরোগ্য লাভ হয়।

৬. শক্তিকৃত ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কি?

ওষুধ এমন শক্তিতে প্রয়োগ করা হয় যাতে রোগের মূল কারণের বিনাশ ঘটে। প্রবণতার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে এবং আরোগ্য বিধান সুনিশ্চিত হয়।

শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের উপায়

প্রবণতা এবং শক্তি ও মাত্রা

শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল প্রবণতা। রোগাক্রমণে প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ যখন রোগ শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে স্বাভাবিক জীবনক্রিয়া ব্যাহত হয়। জীবনীশক্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ প্রবণতা বেড়ে যায় (susaptibility is exaggerated). সেই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে যেমন পুষ্টিকর পথ্যের প্রয়োজন তেমনি সংগ্রামকে তীব্রতর করতে রসদ হিসাবে ওষুধের প্রয়োজন। এজন্য রুগ্নাবস্থায় পথ্যাপথ্যের গুরুত্ব এত বেশী। এ পথ্য এমন হবে যাতে সুস্থ প্রবণতা অক্ষুন্ন থাকে এবং আরব্ধ সংগ্রামে অর্থাৎ ওষুধের ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

বিশেষ ওষুধের চাহিদার প্রকাশ

প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে প্রতিক্রিয়া তীব্র হওয়া। ফলে আকাঙ্ক্ষিত সাহায্যের জন্য তদনুযায়ী লক্ষণের প্রকাশ ঘটে। এই লক্ষণগুলোর সাহায্যে জীবনী শক্তি প্রার্থিত ওষুধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা জানি, যে দ্রব্যের প্রতি দুর্বলতা বা চাহিদা থাকে তা পেলে মানুষ তৎক্ষনাৎ সাগ্রহে তা গ্রহণ করে, অর্থাৎ সদৃশের প্রতি অতি মাত্রায় দুর্বলতা বা প্রবণতা থাকে। এজন্য সদৃশ ওষুধ অল্প মাত্রায় পেলেই প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটে। তখন আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ক

লক্ষণ সমূহের গুরুত্বের উপর প্রবণতার মান (degree of susceptibility) নির্ভর করে। রোগীর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রবণতা থাকে সদৃশতম ওষুধের (simillimum) প্রতি। এজন্য প্রবণতা যত বেশী ওষুধের শক্তি বা গুণগত অবস্থা ততবেশী এবং মাত্রা বা পরিমাণ ততকম। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, প্রবণতা মাপার উপায় কি? প্রবণতা যত বেশী থাকবে ওষুধের চাহিদা তত তীব্র হবে। অতএব সেই রোগের এবং ওষুধের পরিচায়ক লক্ষণগুলো (characteristic symptoms) তত বেশী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। এজন্য ওষুধ যত সদৃশ হবে, রোগীর লক্ষণ সমূহে ওষুধের পরিচায়ক লক্ষণগুলো তত বেশী প্রকট হয়ে উঠবে, রোগীর প্রবণতা তত বেশী হবে এবং ওষুধের তত উচ্চশক্তি লাগবে।[১৩] লক্ষণ সমূহে পরিচায়ক লক্ষণ যত কম থাকবে কিংবা বিভিন্ন ওষুধের লক্ষণ প্রকাশ পাবে সেখানে প্রবণতা কম। যেখানে রোগের সাধারণ লক্ষণ ছাড়া কোন পরিচায়ক লক্ষণই প্রকাশ পায় না সেখানে প্রবণতা ন্যূনতম। এসকল ক্ষেত্র অনারোগ্য। উপশমনই তখন একমাত্র পথ। শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়া মূলতঃ রোগের স্তর অনুযায়ী সদৃশমতে নির্বাচিত ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থার সাজুয্য বিধান করা। (It is solely a question of approximating the quality and quantity of the dose to the grade or plane of the disease according to the law of similars).[১৪] এজন্য রোগের স্তর যেখানে নিম্ন এবং রোগীর প্রতিক্রিয়া শক্তির কম সেখানে ওষুধও নিম্নশক্তির লাগবে।

---

১৩. The more similar the remedy the more clearly and positively the symptoms of the patient take on the peculiar and characteristic form of the remedy, the greater the susceptibility to the remedy, and the higher the potency required - Stuart Close . Genius of Homoeopathy. Haren and Brothers. Calcutta 2nd Edition - page 192

১৪. Stuart Close. Ibid Page 195

প্রবণতা শক্তি ও মাত্রার সম্পর্কের সূত্র

প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ককে আমরা নিম্নোক্ত সূত্রে প্রকাশ করতে পারি :

প্রবণতা যত বেশী ওষুধ ও রোগের লক্ষণের সাদৃশ্য তত বেশী, শক্তি তত বেশী, মাত্রা তত কম। প্রবণতা যত কম, শক্তি তত কম, মাত্রা তত বেশী। অর্থাৎ প্রবণতার সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক সমানুপাত (direct ratio) এবং মাত্রার সম্পর্ক ব্যস্ত অনুপাত (inverse ratio). এরদ্বারা এও বোঝা যায় যে শক্তি ও মাত্রা পরস্পরের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতে সম্পর্কযুক্ত।[১৪]

শক্তি ও মাত্রা একই মুদ্রার (coin) দু'পিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। দু টি বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য চিকিৎসাকার্যে দুটিকে একই সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়। তা নইলে ঈপ্সিত ফল কখনও লাভ করা যায় না।

শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের উপায়

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণের উপায় কি? সদৃশনীতিই এক্ষেত্রে পথ নির্দেশক নীতি। রোগীর লক্ষণসমূহ যত্ন পূর্বক সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে পরিচায়ক লক্ষণগুলো বেছে নেওয়া হয় এবং তার সাহায্যে লক্ষণ সমষ্টি নির্ধারণ করা হয়। লক্ষণ সমষ্টিতে রোগীর এক জীবন্ত চিত্র (diseased personality) ফুটে ওঠে। এই রুগ্ন ব্যক্তিত্বে ওষুধের ব্যক্তিত্বও (drug personality) ফুটে ওঠে। এই দুয়ে সাদৃশ্য দেখে আমরা ওষুধ নির্বাচন করি।

এই দুই চরিত্রে যতবেশী সাদৃশ্য থাকবে, ওষুধ তত বেশী সদৃশ বলে গণ্য করতে হবে এবং ওষুধের তত উচ্চশক্তি এবং ক্ষুদ্রতম মাত্রার প্রয়োজন হবে। কোন রোগীতে যদি নাক্সভমিকার প্রতিকৃতি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যদি আমরা নিশ্চিত হই যে এটি নাক্সেরই রোগী তাহলে নাক্স উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। যদি নাক্সের কেবলমাত্র বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ প্রকট থাকে তবে মধ্যশক্তি এবং কয়েকমাত্রা এবং যেখানে রোগের কিছু সাধারণ লক্ষণ বর্তমান থাকে সেখানে নিম্নশক্তি, বৃহৎমাত্রার প্রয়োজন হবে।

---

১৪. H.A. Roberts. The Principles and Art of Cure by Homoeopathy. B. Jain Publishers.

এজন্য বর্ধিষ্ণু শিশুতে, কোমলশীলা নারীতে কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী খুঁতখুঁতে স্বভাবের পুরুষে যখন যথাক্রমে ক্যালকেরিয়া, পালসেটিলা, নাক্সভমিকা বা অন্য কোন ওষুধের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তখন সে ওষুধের উচ্চশক্তির একমাত্রা যে আমূল পরিবর্তন সাধন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে তা অসম্ভব বলে মনে হয়।

প্রবণতার পরিবর্তন

প্রতিটি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি তার প্রবণতাও স্বতন্ত্র। এজন্য একই রোগের আক্রমণে বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়। ঠান্ডা লাগার জন্য বা বৃষ্টিতে ভেজার জন্য কারোর হয়ত কিছুই হল না, কারোর সামান্য সর্দি, হাঁচি হল, কারোর প্রবল জ্বর হল আবার কারোর হয়ত শ্বাসের প্রচণ্ড কষ্ট বা বাতের ব্যথা শুরু হল। এজন্য ব্যক্তি মানুষের প্রতিক্রিয়ার ধরন অনুযায়ী শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধের প্রয়োজন হয় তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও মাত্রারও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি মানুষের প্রবণতাও আবার সবসময় একই রূপ থাকে না। অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার পরিবর্তন হয়। বয়স, ধাতুপ্রকৃতি (constitution and temperament), বৃত্তি ও জীবনযাত্রার ধরন, নিদানগত অবস্থা (pathological condition), অভ্যাস, পরিবেশ, রোগের প্রকৃতি, তীব্রতা, পর্যায় ভোগকাল এবং ওষুধ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে প্রবণতার পরিবর্তন হয়।[১৬] এজন্য একই মানুষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ওষুধ যেমন লাগে, তেমনি বিভিন্ন শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন হয়। মূল কথা হল প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে রোগের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে, মেটেরিয়া মেডিকা থেকে তার সদৃশ দোসর ওষুধটি খুঁজে বার করতে হবে এবং উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় তা প্রয়োগ করে সে অবস্থার প্রতিকার করতে হবে। যে চিকিৎসক একাজটি যত পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন তিনি ততবড় কুশলী চিকিৎসক। সাফল্য একমাত্র তাঁরই করায়ত্ত।

এবিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

---

১৬. Stuart Close - Ibid Page 194. and B.K. Sarkar - Organon of Medicine, M Bhattacharyya & Co., Calcutta Seventh Indian Edition. Page 428.

সারসংক্ষেপ

১. শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি?

প্রবণতার পরিমাপ করা।

২. প্রবণতার পরিমাপ করার উপায় কি?

সাদৃশ্যের পরিমাপ করা। ওষুধের লক্ষণের সঙ্গে রোগের লক্ষণের সাদৃশ্য যত নিবিড় হবে প্রবণতা তত বেশী হবে। সাদৃশ্য যত কম প্রবণতা তত কম।

৩. প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ক কি?

প্রবণতা যত বেশী শক্তি তত বেশী, মাত্রা তত কম। প্রবণতা যত কম শক্তি তত কম, মাত্রা তত বেশী।

৪. শক্তি ও মাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক কি?

শক্তি ও মাত্রার পরস্পরের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতে সম্বন্ধযুক্ত।

৫. ওষুধের বিভিন্ন শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন হয় কেন?

বিভিন্ন লোকের প্রবণতা বিভিন্ন। তাছাড়া নানা কারণে প্রবণতার পরিবর্তন হয়, এজন্য যেমন বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োজন হয় তেমন বিভিন্ন শক্তি ও মাত্রারও প্রয়োজন হয়।

৬. সদৃশতম ওষুধের উচ্চশক্তি ও কম মাত্রার প্রয়োজন হয় কেন?

সদৃশতম ওষুধের প্রতি রোগীর প্রবণতা অত্যন্ত বেশী থাকে। এজন্য উচ্চশক্তি ও কম মাত্রার প্রয়োজন হয়।

শক্তিকরণ

ওষুধের শক্তির অর্থদ্যোতনা

হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। এর কারণ কি? এই শক্তি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়? বিভিন্ন শক্তির ওষুধের সম্পর্ক কি? কেনই বা চিকিৎসাকার্যে বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজন হয়? কেমন করেই বা এসকল ওষুধ প্রস্তুত করা হয়? শক্তিকৃত অবস্থায় ওষুধ প্রয়োগ করে কি আরোগ্য বিধান করা সম্ভব? ওষুধের শক্তি ও মাত্রার যথেচ্ছ প্রয়োগের ফল কি হতে পারে? শক্তি ও মাত্রা নীতি আলোচনা করার পূর্বে এসকল 'কেন'-র জবাব অবশ্যই জানতে হবে।

সদৃশ নীতি ও শক্তিকরণ নীতি

সদৃশনীতি (doctrine of similars) এবং শক্তিকরণ নীতি (doctrine of potentization) পরস্পরের পরিপূরক নীতি। শক্তিকরণ নীতি অনুসরণ না করে সদৃশনীতি অনুযায়ী চিকিৎসা সম্ভব নয়। হ্যানিম্যানের বহু পূর্ব থেকে চিকিৎসাকার্যে সদৃশনীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু এ নীতির উপর ভিত্তি করে কোন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ হল সদৃশনীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে তদোপযোগী যে ওষুধের প্রয়োজন তা জানা ছিল না। সদৃশনীতি অনুযায়ী চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করা হবে আর অ্যালোপ্যাথিক ধাঁচের ওষুধ প্রয়োগ করা হবে এ অনেকটা কাঁঠালের আমসত্তের মত। এতে কখনও ঈপ্সিত ফল লাভ হতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করতে হলে ওষুধও হোমিওপ্যাথিক হতে হবে। ওষুধ হোমিওপ্যাথিক হতে হলে তাকে রোগশক্তির সদৃশ ও সমকক্ষ হতে হবে। ওষুধ রোগশক্তির সদৃশ হয় যদি ওষুধ রোগশক্তি যে ধরনের স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে ওষুধও তদ্রূপ বিচ্যুতি ঘটাতে পারে। রোগশক্তির সমকক্ষ বা বলবত্তর হতে হলে ওষুধকেও তদনুযায়ী শক্তি সম্পন্ন

হতে হবে। এজন্য ওষুধের রোগোৎপাদিকা শক্তির অর্থাৎ ওষুধ সুস্থদেহে কিরূপ রোগ সৃষ্টি করতে পারে তা পূর্ব থেকে জানা থাকতে হবে। ওষুধের রোগোৎপাদিকা শক্তিই ওষুধের আরোগ্যদায়ী শক্তি।

ওষুধের রোগোৎপাদিকা শক্তি জানার একমাত্র উপায় হল সুস্থমানবদেহে তা পরীক্ষা করে তার গুণাগুণ জানা। সুস্থ মানবদেহে ওষুধ পরীক্ষার এই অভিনব পদ্ধতিকে 'ড্রাগ প্রুভিং' (drug proving) বলে। এ পদ্ধতি আবিষ্কার করে হ্যনিম্যান চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মুক্ত করেন। আর যে নীতি অনুসরণ করে ওষুধের শক্তির বিকাশ ঘটানো হয় এবং রোগীক্ষেত্রে তা ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয় তাকে শক্তিকরণ নীতি বলে।

শক্তিকরণ নীতির বিবর্তন

শক্তিকরণ নীতি দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। সদৃশনীতি আবিষ্কারের পর হ্যানিম্যান প্রথমে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ওষুধ স্থূলমাত্রায় প্রয়োগ করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে এতে আরোগ্যের পূর্বে রোগের সাংঘাতিক বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়। আদর্শ আরোগ্য বিধানের যে শর্ত তিনি অর্গাননের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ আরোগ্যক্রিয়া হবে দ্রুত, মৃদু, নিরুপদ্রব এবং কষ্টবিহীন, তা এক্ষেত্রে আদৌ পূরণ হচ্ছেনা। ওষুধের স্থূলমাত্রার প্রয়োগের জন্যই এরূপ বিভ্রাট ঘটছে বলে মনে করে তিনি ওষুধের মাত্রা (পরিমাণ) কমাতে শুরু করেন। এজন্য তিনি দুটি পন্থা অবলম্বন করেন। তরল বা দ্রবণীয় ভেষজের ক্ষেত্রে দ্রবীকরণ ও ঝাঁকানি (dilution and succussion) এবং কঠিন ভেষজের ক্ষেত্রে মিশ্রণ ও ঘর্ষণ (mixture and trituration)। প্রথম ক্ষেত্রে ভেষজ পদার্থের সামান্য অংশ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অনৌষধি মাধ্যম যথা পরিস্রুত জল বা সুরাসারের (অ্যালকোহলের) সঙ্গে মিশ্রিত করে নির্দিষ্ট কয়েকবার সজোরে ঝাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে দুগ্ধশর্করার সঙ্গে মিশ্রিত করে উত্তমরূপে ঘর্ষণ করার ব্যবস্থা করেন।

তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে ওষুধের পরিমাণ যত কমান যায় এবং ঝাঁকানি বা ঘর্ষণের সংখ্যা যত বাড়ান যায় ওষুধ বৃদ্ধি তত কম হয় এবং আরোগ্যক্রিয়া দ্রুততর হয়। শুধু তা নয়। ভেষজের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এক সম্পূর্ণ নতুন ধর্মের, এক নতুন শক্তির প্রকাশ ঘটে। ভেষজ পদার্থের আসল স্বরূপ হল শক্তি যা সাধারণ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ায়

ভেষজের সেই আবদ্ধ শক্তির মুক্তি ও বিকাশ ঘটে। এমনকি যে সকল পদার্থ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ভেষজ গুণসম্পন্ন বলে জানা ছিল না, যেমন সাধারণ লবণ, বালি, কাঠকয়লা, পার্বত্য শৈবাল সেগুলোও এই পদ্ধতির ফলে নতুন শক্তির আধারে পরিণত হল। এছাড়া যে সকল পদার্থের কিছু ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিচয় জানাছিল যেমন পারদ, গন্ধক, আফিঙ , নানাধরনের এসিড এবং যেসকল পদার্থ তীব্র বিষ বলে গণ্য হত, যেমন আর্সেনিক, সাপের বিষ সহ নানারকম বিষ সেগুলোও এই পদ্ধতিতে নতুন নতুন ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ শক্তিরূপে পরিণত হল। অনুরূপভাবে যক্ষ্মা, বসন্ত, ক্যান্সার প্রভৃতি মারণব্যধি আক্রান্ত কোষকলা থেকে এবং এক্স-রে, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে অমৃতসম অমূল্য সব ওষুধ আবিষ্কৃত হল। এমনি করে এক অভিনব মেটেরিয়া মেডিকার উদ্ভব হল। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই হল আমাদের বিচিত্র ও বহুরূপে ব্যবহার্য শক্তিশালী অস্ত্রের ভান্ডার।

শক্তিকরণ

ভেষজের এই শক্তিকে ওষুধরূপে ব্যবহার করতে হলে সেই শক্তির উপর চিকিৎসকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। এজন্য হ্যানিম্যান এক বিশেষ স্কেল অনুযায়ী ধাপে ধাপে বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেন। যে পদ্ধতিতে ভেষজের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটানো হয় এবং ওষুধরূপে সহজে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয় তাকে শক্তিকরণ (potentization, dynamization, attenuation) বলা হয়।

এভাবে ওষুধের উগ্রক্রিয়ার দরুন রোগের বৃদ্ধি কমাবার জন্য তিনি ওষুধের পরিমান কমাবার উদ্দেশ্যে দ্রবীকরণ বা মিশ্রণ দিয়ে যে পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিলেন তা ক্রমে ক্রমে চিকিৎসাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী শক্তিকরণ পদ্ধতিতে পরিণত হল।

শক্তিকরণ 'ডাইলিউশন' নয়

শক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে 'ডাইলিউশন' (dilution) বলা সমীচীন নয়। 'ডাইলিউশন' হল একটি তরল পদার্থের অন্য একটা তরল পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণ, আর শক্তিকরণ হল ভেষজের নিষ্ক্রিয় শক্তির উন্মেষ ও বিকাশসাধন এবং ওষুধরূপে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা।

শক্তি বলতে কি বুঝায়

শক্তি (potency) হল ওষুধের ক্রিয়াক্ষমতা নির্দেশক ক্রম। শক্তি হল ওষুধের এক গুণবাচক অবস্থা (qualitative state). মানবদেহে কোন স্তরে ক্রিয়া করে কিরূপ পরিবর্তন সংঘটন করবে ওষুধের বিভিন্ন শক্তি বা ক্রম তা নির্দেশ করে। শক্তিকরণের ফলে ওষুধ অধিকতর দুর্বল বা অধিকতর শক্তিশালী হয় না। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো আরও স্পষ্ট ও ক্রিয়াক্ষম হয়। অর্থাৎ যে শক্তি ভেষজে প্রচ্ছন্ন ও সমাহিত ছিল তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত ও ক্রিয়াশীল হয়। কোন ওষুধের ৩০ শক্তি সে ওষুধের ৬ শক্তি থেকে ৫ গুণ, কিংবা ১০ হাজার শক্তির ওষুধ ১ হাজার শক্তির ওষুধের ১০ গুণ বেশী শক্তিশালী নয়। কোন ওষুধের নিম্নশক্তি ও উচ্চশক্তির ওষুধের পার্থক্য তাদের শক্তির দুর্বলতা বা প্রাবল্যে নয়, তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ও ক্রিয়া ক্ষমতায়। মূল আরক বা নিম্নশক্তি দেহের স্থূলস্তরে কাজ করে কেবলমাত্র সাধারণ লক্ষণ (common symptoms) উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু ওষুধকে যত উচ্চ থেকে উচ্চতর ক্রমে উন্নীত করা যায় তত মানুষের দেহ ও মনের গভীরতর স্তরে ক্রিয়া করে দেহতন্ত্রে গুণগত পরিবর্তন সংগঠন করে। ফলে নানাপ্রকার অদ্ভুত, বিস্ময়কর, বিরল ও দৃষ্টি আকর্ষক লক্ষণ সমূহের আবির্ভাব ঘটে। এগুলোকে পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms) বলে। এগুলো সম্মিলিতভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অর্থাৎ যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশিত প্রতিচ্ছবি (outwardly reflected image of the internal economy). অন্যভাবে বলা যায় ওষুধের শক্তি হল তার রোগোৎপাদিকা শক্তি। ওষুধের বিভিন্ন শক্তি দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকৃতির রোগ উৎপাদন করি। ওষুধের এই শক্তিগুলো একটি ওষুধ থেকে অন্য ওষুধের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এজন্য চিকিৎসাকার্যে কোন রোগের ক্ষেত্রে কিরূপ সদৃশ কৃত্রিম রোগ উৎপন্ন করতে হবে তা আমরা সহজেই নিরূপণ করতে পারি। মনে রাখতে হবে সদৃশনীতির মূল কথাই হল, রোগ দিয়ে রোগ সারাও। শক্তি নিরূপণের প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব এইখানেই।

শক্তিকরণের উদ্দেশ্য

১. ওষুধের অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটানো। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের কোন স্থান এতে নেই।

২. বিভিন্ন স্তরে কার্যকর হওয়ার উপযোগী বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা।

৩. সুস্থ মানবদেহে ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা।

৪. ভেষজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উদঘাটন এবং অন্য ওষুধের সঙ্গে স্বাতন্ত্রীকরণ।

৫. ওষুধের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগের উপযোগী করে প্রস্তুত করা।

৬. ওষুধকে শক্তিরূপে ব্যবহারে চিকিৎসকের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

সারমর্ম

১. শক্তিকরণ নীতি ও পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়?

ভেষজের আসল স্বরূপ হল শক্তি। ভেষজের পরিমাণ যত কমান যায় এবং মাধ্যমের সংখ্যা যত বাড়ানো যায় এবং ঝাঁকানি বা ঘর্ষণের সংখ্যা বাড়ানো যায় ততই ভেষজের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটে। যে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয় তাকে যথাক্রমে শক্তিকরণ নীতি ও পদ্ধতি বলে।

২. হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তি বলতে কি বুঝায়?

শক্তি হল ভেষজের এক গুণগত অবস্থা। এটি দেহের বিভিন্ন স্তরে ভেষজের ক্রিয়া করার ক্ষমতা বুঝায়।

৩. উচ্চশক্তি ও নিম্নশক্তি বলতে কি বুঝায়?

উচ্চশক্তি ও নিম্নশক্তি বলতে ওষুধটি দেহে কোনস্তরে ক্রিয়া করে কি ধরনের বিচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম তা নির্দেশক করে।

৪. ওষুধের শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ক কি?

শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ক ব্যস্ত অনুপাত।

৫. ওষুধের বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজনীয়তা কেন হয়?

রোগের প্রকৃতি বিভিন্ন। মানুষেরও প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়া শক্তি বিভিন্ন। এজন্য স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিও বিভিন্ন রকম হয়। এই বিভিন্ন ধরনের অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ওষুধের বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজন হয়।
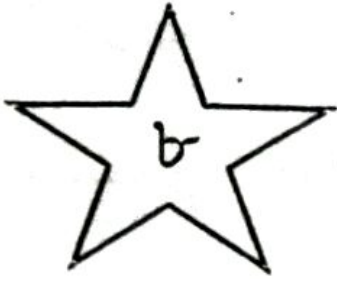
শক্তিকরণ প্রক্রিয়া

ফার্মাকোপিয়া, ফার্মেসী, ফার্মাকোলজি

ভেষজ পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে চিকিৎসা কার্যে ওষুধরূপে তা ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করার যে অভিনব পদ্ধতি হ্যানিম্যান আবিষ্কার করেন তাকে শক্তিকরণ প্রক্রিয়া (process of dynamization or potentization) বলে। তিনি অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থে, ক্রনিক ডিজিসেস গ্রন্থে এবং মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে গ্রন্থে ভেষজ পদার্থ সমূহের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ, তা থেকে ওষুধ প্রস্তুত করণ, সংরক্ষণ এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশাবলী থাকে তাকে ফার্মাকোপিয়া বলে। আর ভেষজ পদার্থ আহরণ, ওষুধ প্রস্তুতকরণ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার বিদ্যাকে ফার্মেসী (pharmacy) বলে। ফার্মাকোলজি হল (pharmacology) মানুষ বা অন্য প্রাণীর উপর ওষুধের ক্রিয়ার বর্ণনাকারী বিজ্ঞান।

চিকিৎসাকার্যে ফার্মেসীর জ্ঞান আমাদের প্রধাণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে সাহায্য করে ঃ

১. বিভিন্ন ওষুধের উৎস, তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াধারা ও গভীরতা সম্বন্ধে।

২. ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয় বিষয়ে।

৩. ওষুধের ক্রিয়াকাল নির্ধারণে।

৪. ওষুধ নির্বাচনে।

৫. সঠিকভাবে প্রেসক্রিপসন লিখতে, যা ওষুধ সরবরাহকারী ও রোগীর পক্ষে সহজেই অনুসরণ করা যায়।

ফার্মাকোপিয়ার ইতিহাস

১৮২৫ সালে লিপজিগের ডাঃ সি. ক্যাসপারি (Dr. C. Caspari) ওষুধ প্রস্তুতকরণের নির্দেশাবলী সম্বলিত প্রথম হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া (pharmacopoeia) রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া এবং ১৮৯৭ সালে আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুত করার সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে মাদার টিঞ্চার আমদানী করত। কিন্তু ওষুধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ওষুধ আমদানী করা দেশের ফার্মাকোপিঁয়া অনুসরণ না করে প্রধানতঃ ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ করত। এতে ওষুধের শক্তিকরণ যথাযথ হত না। এই অসুবিধা দূরকরার জন্য স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় উদ্যোগী হন এবং মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এন্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও ইংরাজীতে ফার্মাকোপিয়া প্রকাশ করেন। এটিই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া। এটি এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার ডাঃ বি. কে. সরকারকে চেয়ারম্যান করে ফার্মাকোপিয়া কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭১ সালে হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া অব ইন্ডিয়া প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ওষুধ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ এই ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ করা হয়।

শক্তি করণ পদ্ধতির প্রকারভেদ

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুত করার জন্য দুটি পদার্থের প্রয়োজন হয় — ভেষজ পদার্থ (drug) এবং মাধ্যম (medium or vehicle)। ভেষজ গুণহীন কোন বস্তু (neutral substance), যাতে কোন অম্ল (acid) বা ক্ষারধর্ম (alkali) থাকে না এই মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মাধ্যম দুপ্রকার — তরল ও কঠিন। সুরাসার (alcohol) পরিস্রুত জল তরল মাধ্যম হিসাবে এবং দুগ্ধশর্করা (sugar of milk), অনুবটিকা (globules), টেবলেট (tablets or tabloids) কঠিন মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্কেল

সাধারণতঃ ৩টি পৃথক স্কেল অনুযায়ী ওষুধ প্রস্তুত করা হয় — দশমিক, শতমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক। তরল ওষুধের ক্ষেত্রে ওষুধের মূল আরক (mother tincture) এবং কঠিন ভেষজ পদার্থের ক্ষেত্রে মূলবস্তু (mother substance) এবং প্রথম থেকে তৃতীয় শক্তির ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন ওষুধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং তা ফার্মাকোপিয়া বর্ণিত ফরমূলা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী শক্তির ওষুধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সকল ওষুধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। কঠিন পদার্থকে দুগ্ধশর্করার সঙ্গে খলে ঘর্ষণ করে এবং তরল ভেষজকে সুরাসারের সঙ্গে মিশ্রিত করে ঝাঁকানি দিয়ে শক্তিকরণ করা হয়।

দশমিক প্রক্রিয়া

এ পদ্ধতি কনষ্টেনটাইন হেরিং (Constantine Hering) উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতির নীতি হল, প্রতিশক্তির ওষুধে পূর্ববর্তী শক্তির ওষুধের পরিমাণ কমে একদশমাংশ থাকবে (reduced to one-tenth of the mother tincture or the previous potency)। প্রথম শক্তির ওষুধে মূল বস্তু বা আরকের একদশমাংশ থাকবে। দ্বিতীয় শক্তির ওষুধে প্রথম শক্তির ওষুধের একদশমাংশ থাকবে। এমনিভাবে পরবর্তী প্রতিশক্তিতে পূর্ববর্তী শক্তির ওষুধের এক দশমাংশ থাকবে।

সাধারণতঃ মূল ভেষজ বস্তুর (mother substance) ১ভাগ (১গ্রেণ) ৯ভাগ (৯গ্রেণ) দুগ্ধশর্করার সঙ্গে ২০ মিনিট করে ৩বারে মোট ১ঘন্টাকাল ঘর্ষণ করে প্রথম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। প্রথম শক্তির ওষুধের ১ভাগ আবার ৯ভাগ দুগ্ধশর্করার সঙ্গে অনুরূপভাবে ১ঘন্টা ঘর্ষণ করে দ্বিতীয় শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

শততমিক প্রক্রিয়া

এ পদ্ধতির নীতি হল প্রতিশক্তির ওষুধে পূর্ববর্তী শক্তির ওষুধের পরিমাণের এক শতাংশ থাকবে। এ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ মূল আরকের ১ভাগের সঙ্গে ৯৯ভাগ সুরাসার মিশ্রিত করে ১০ বার উত্তমরূপে ঝাঁকি (succussion) দিয়ে প্রথম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। প্রথম শক্তির ওষুধের ১ভাগ আবার ৯৯ভাগ

শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। প্রথম শক্তির ওষুধের ১ভাগ আবার ৯৯ভাগ সুরাসারের সঙ্গে মিশিয়ে ১০বার ঝাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে লক্ষ শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ প্রস্তুতকরণের নীতি

এ পদ্ধতির নীতি হল প্রতিশক্তির ওষুধে পূর্ববর্তী শক্তির ওষুধের পরিমাণ ৫০ হাজার ভাগ কম থাকবে। অর্থাৎ দশমিক, শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতিতে যথাক্রমে প্রতিশক্তির ওষুধে পূর্বশক্তির ওষুধের পরিমাণ থাকে একদশমাংশ, এক শতাংশ এক পঞ্চাশ সহস্রাংশ। এ নিয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

সারাংশ

১. শক্তিকরণের প্রধান উপাদান কি?

ভেষজ পদার্থ ও মাধ্যম।

২. ক'টি স্কেলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়?

তিনটি - দশমিক, শততমিক এবং পঞ্চাশ সহস্রতমিক।

৩. বিভিন্ন স্কেলে ভেষজ ও মাধ্যমের অনুপাত কি?

দশমিকে, শততমিক ও পঞ্চাশসহস্রতমিকে ভেষজ ও মাধ্যমের অনুপাত যথাক্রমে ১:৯, ১:৯৯, ১:৪৯,৯৯৯

৪. বিভিন্ন স্কেলে প্রতি শক্তির ক্রমে ওষুধের পরিমাণ কত?

দশমিক, শততমিক ও পঞ্চাশসহস্রতমিক পদ্ধতিতে পূর্ব শক্তির ওষুধের যথাক্রমে একদশমাংশ, একশতাংশ ও এক পঞ্চাশসহস্রাংশ।

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ

পটভূমিকা

অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত চিকিৎসাকার্যে সাধারণতঃ শততমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহৃত হত। কিন্তু শততমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহারে নানাবিধ কঠিন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। আরোগ্য বিধানের যে শর্ত তিনি অর্গাননের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নির্দেশ করে দিয়েছেন শততমিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধে তা সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। এ সমস্যাগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. ওষুধ প্রয়োগজনিত বৃদ্ধি অত্যন্ত বেশী হত। রোগী আরোগ্য লাভের পূর্বে অত্যন্ত কষ্ট পেত। অথচ আদর্শ আরোগ্যের শর্ত হল আরোগ্য ক্রিয়া হবে কষ্টবিহীন। ওষুধের ক্রিয়া অবশ্যই মৃদু হবে।

২. আরোগ্য বিধান করতে দীর্ঘ সময় লাগত। আদর্শ আরোগ্যের শর্ত হল আরোগ্য ক্রিয়া হবে দ্রুত এবং স্বল্পতম সময়ে তা সাধিত হবে।

৩. ওষুধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত একই শক্তির ওষুধের গুণগত মানের বিস্তর তফাৎ হত। একই ওষুধের একই শক্তির মানের যাতে কোনরকম তারতম্য না ঘটে এজন্য এমন এব পদ্ধতির উদ্ভাবন জরুরী ছিল যা সকলে অবশ্যই অনুসরণ করবে।

৪. বর্তমান পদ্ধতিতে ওষুধের শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল না।

৫. ওষুধের শক্তির ক্রমগুলোর মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী ছিল। ৩০ শক্তির পর ২০০, ২০০ শক্তির পর ১ হাজার, ১ হাজারের পর ১০ হাজার এবং তারপর

৫০ হাজার ও ১ লাখ। এতে অতি অনুভূতিশীল রোগীদের ক্ষেত্রে দারুন বৃদ্ধি দেখা যেত।

৬. শক্তি ও মাত্রা নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ ছিল। একই রোগাবস্থার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসক একই ওষুধ বিভিন্ন শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করতেন। চিকিৎসাকার্যে ওষুধ প্রয়োগের কোন নির্দিষ্ট রীতিনীতি ছিল না। কেউ উচ্চশক্তির প্রবক্তা হলেন, কেউবা নিম্নশক্তির। কেউ একমাত্রার পক্ষপাতী, কেউ বহুমাত্রার। প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় মতবাদ যে সঠিক তা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

৭. ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ক্রনিক ডিজিসেস গ্রন্থ প্রকাশনার পর অবস্থা আরও জটিল হল। এতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ক্রনিক মায়াজমের প্রতিকারার্থে উচ্চতর শক্তির (যেমন ৬ থেকে ৩০) ব্যবহার করা উচিত। এই নির্দেশের পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গ্রস (Gross), স্ক্রেটার (Schreter) স্টাফ (Staff) করসাকফ (Graf von Korsakoff) প্রমুখ আরও উচ্চতর শক্তি (৬০, ৯০, ২০০, ১৫০০) ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং প্রত্যেকে তার ধারণা যথার্থ বলে প্রচার শুরু করেন।

এক কথায় শক্তি ও মাত্রার ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যের অবস্থা চলছিল। এ সমস্যা হ্যানিম্যানকে অত্যন্ত বিব্রত করছিল। একসময় অনন্যোপায় হয়ে হ্যানিম্যান নির্দেশ দেন যে সকল ক্ষেত্রেই ৩০ শক্তির ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। হ্যানিম্যান নিজে উচ্চশক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন এবং উচ্চশক্তির ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ওষুধের শক্তিকে যত উন্নত করা যায় তত তাদের ক্রিয়া গভীর (penetrating) ও দ্রুত হয় এবং তাদের ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি এক মৃগী রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। এক বয়স্ক মহিলা। অবিবাহিত। তার প্রতি ৯, ১২, ১৪ মাস অন্তর মৃগী রোগের আক্রমণ হত। তাকে লক্ষণ সাদৃশ্য অনুযায়ী সালফার ৯০ (xxx), যা তিনি নিজে তৈরী করেছিলেন, তার ১ ফোঁটা কিছুটা দুগ্ধশর্করার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হল। এক ঘন্টার মধ্যে তার আক্রমণ বন্ধ হয়ে যায় এবং আর কখনও হয়নি।[১৭]

কিন্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে যাতে সকল চিকিৎসক একই রোগাবস্থায় একই ওষুধ ব্যবহার করেন এবং একই ফল লাভ করেন এজন্য তিনি সকলকে একই শক্তি

১৭. R. E. Dudgeon - The Lesser Writings of Samuel Hahnemann. B. Jain Publishers (p) Ltd 1989. Page 763.

ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাঃ স্ক্রেটারকে (Schreter) এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন। তিনি তাতে বলেন যে, আমি তোমার দ্বারা ৩০ শক্তির উচ্চতর ওষুধ (যেমন ৩৬,৬০) অনুমোদন করি না। এ বিষয়ে একটা সীমা থাকা দরকার। সীমাহীনভাবে এ চলতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ৩০ শক্তি পর্যন্ত তৈরী করা হবে এরূপ নিয়ম স্থির করা থাকলে সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করার জন্য একই রকম নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। এর ফলে তাঁর যখন কোন আরোগ্যের ঘটনা উল্লেখ করেন তখন আমরাও তাঁদের মত একই উপকরণ ব্যবহার করে চিকিৎসা করতে পারি। এক কথায় আমরা পরীক্ষিত পথে বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারি। তা হলে আমাদের শত্রুরা আমাদের চিকিৎসায় কোন স্বাভাবিক মান নেই, কোন কিছুই স্থির নেই বলে আমাদের নিন্দা করতে পারবে না। [১৮]

কিন্তু এতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করেন। তাঁরা মনে করেন শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে রোগীর বয়স, ধাতু প্রকৃতি প্রভৃতি যেমন বিবেচনা করতে হয় তেমনি রোগের গতি প্রকৃতি ও বিবেচনা করতে হয়। অতএব সকল রোগের ক্ষেত্রে ৩০ শক্তির ওষুধ ব্যবহার হ্যানিম্যানের নির্দেশের পরিপন্থী। হ্যানিম্যান এঁদের বক্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করে নেন। কিন্তু উপায় কি? এ অবস্থা প্রতিকারের একটা পন্থা উদ্ভাবন তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। ওষুধ প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সকল চিকিৎসকের পালনযোগ্য একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ বিধি নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এসকল সমস্যা সমাধানে হ্যানিম্যান দীর্ঘ ৪/৫ বছর (১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত) কঠোর পরিশ্রম করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি এবিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। অবশেষে ওষুধ প্রস্তুত করণের ও প্রয়োগের

---

১৮ I do not approve of your dynamizing the medicines higher (as for instance upto XII and XX - (36th and 60th dilution). There must be some end to the thing, it cannot go on infinity. By laying down as a rule that all homoeopathic remedies be attennated and dynamized upto X (30th dilution) we have a uniform mode of procedure in treatment of all homoeopathists, and when they discribe a cure, we can repeat it as they, and we operate with the same tools. In one word, we would do well to go forward uninterruptedly in the beaten path. Then our enemies will not be able to reproach us with having nothing fixed - no normal standard. S. Hahnemann. Remarks on Extreme Attenuation of Homoeopathic Medicine. Brithsh Journal of Homoeopathy. Vol. V. Page 398. and Lesser Writings P. 765.

বিষয়ে এক নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং রোগীতে তা প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল লাভ করেন। তিনি তাঁর শিষ্যগণকে বলেন যে, গত ৪/৫ বছর ধরে নবতম পরিবর্তিত ও নির্ভুল পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।[১৯]

তিনি তাঁর এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা অর্গাননের ষষ্ঠ সংস্করণে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী হ্যানিম্যান প্যারি থেকে জার্মানীতে তার প্রকাশক মিঃ স্কোবকে (Mr Schaub of dusseldorf) একটি চিঠি লেখেন, গত ১৮ মাস পরিশ্রম করে আমার অর্গাননের ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পন্ন করেছি। এটি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভুল।[২০]

এখানে লক্ষণীয় যে হ্যানিম্যান নবতম পদ্ধতিকে নির্ভুল পদ্ধতি (perfect method) এবং ষষ্ঠ সংস্করণকে প্রায় নির্ভুল (most nearly perfect) বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা সঙ্গতই হয়েছে।

ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশে বিলম্বের কারণ

ষষ্ঠ সংস্করণ লেখা সম্পন্ন করার পরের বৎসর ২রা জুলাই, ১৮৪৩ সালে হ্যানিম্যান পরলোক গমন করেন। হ্যানিম্যানের দ্বিতীয়া স্ত্রী ম্যাডাম ম্যালানী পান্ডুলিপি খানি ফেরৎ নিয়ে নিজের হেফাজতে রাখেন এবং প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ দাবী করেন। হ্যনিম্যানের বন্ধু ও শিষ্য বোনিং হোসেন, হেরিং, ডানহাম, বেয়াস (Bayes) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রিটিশ ও আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও অনুরাগীগণ বইটি প্রকাশনার জন্য অনেক চেষ্টা করেও বিফল হন। পরবর্তীকালে ম্যাডাম ম্যালানীর মৃত্যুর পর ডাঃ হেল (Hale) মূল পান্ডুলিপিখানি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন এবং ১৯২০ সালে এটি জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। পরের বছর

---

১৯. During the last 4 or 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfect method - Ap. 246 Foot note - 132.

২০. I have now, after eighteen months of work, finished the sixth edition of my 'Organon', the most nearly perfect of all.

১৯২১ সালে ডাঃ উইলিয়াম বোরিক (Dr W. Boerricke) এটি ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। পঞ্চম সংস্করণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এর সকল বই বিক্রি হয়ে যায়। তথাপি এজন্যই ষষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশ ৭৯ বছর অপ্রকাশিত থেকে যায়। প্রকাশনার এই দীর্ঘ বিলম্বের দরুন কেন্ট প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথির দিকপালগণ এটি পরীক্ষা করার সুযোগ পান নাই। ফলে বিশ্ববাসী তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ১৯২০-২১ সালে প্রকাশিত হলেও এবিষয়ে কোন হোমিওপ্যাথ কিংবা কোন হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। পরে ফরাসী দেশের ডাঃ চার্লস পাহুদ (Dr Charles Pahud of Lozen, France) The British Homoeopathic Journal এর ১৯৫০ সালের এপ্রিল সংখ্যায় 'My experience about Hahnemann's 50 Millesimal Scale of Potency' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে জেনেভার ডাঃ পিয়েরি স্মিড্ (Dr Pierre Schmidt) ঐ পত্রিকায়, The Journal of American Institute of Homoeopathy এবং আরো কয়েকটি পত্রিকায় এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং এবিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতবর্ষে ১৯৫৭ সাল থেকে ডাঃ দেবেন্দ্র কুমার রায়, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ বিজয় কুমার বসু প্রমুখ বিদগ্ধ চিকিৎসকগণ 'হ্যনিম্যান' মাসিক প্রত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতার হ্যানিম্যান্ পাবলিশিং কোম্পানী ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রস্তুত শুরু করে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯৫৮ সালে বাংলাদেশে ডাঃ চণ্ডীপদ চক্রবর্তী এবং ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী নবতম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত ও তদ্দ্বারা চিকিৎসা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাঃ চৌধুরী কলকাতায় নবতম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য 'হোমিওপ্যাথি ইন্টারন্যাশনাল' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে এ পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সারাংশ

১. পঞ্চাশসহস্রতমিক শক্তির ওষুধের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?

ভেষজের শক্তির পূর্ণ বিকাশসাধন, ওষুধজ বৃদ্ধি কমানো, আরোগ্য ক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, ওষুধ প্রস্তুত করণে একই প্রথা অনুসরণ করা, শক্তি ও মাত্রা সমস্যার সমাধান করা এবং চিকিৎসা কার্যে সকলের জন্য একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' স্থির করা।

২. ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের বিলম্বের কারণ কি?

হ্যনিম্যানের মৃত্যু এবং তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা।

৩. ষষ্ঠ সংস্করণ বইটি প্রথম প্রকাশ কে করেন?

ডাঃ হেল জার্মানীতে ১৯২০ সালে এবং ডাঃ বোরিক ইংরাজীতে ১৯২১ সালে।

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী

হ্যানিম্যান অর্গাননের ষষ্ঠ সংস্করণে ২৬৯ ও ২৭০ অনুচ্ছেদে এবং তৎসংলগ্ন ১৫০ থেকে ১৫৬ নম্বর পাদটীকায় পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আশ্চর্যের বিষয় হল এখন পর্যন্ত কোন ফার্মাকোপিয়ায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। শততমিক পদ্ধতির ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এতে প্রথমে মূল ভেষজবস্তু (mother substance) তৈরী করা হয়। পরে তা থেকে বিভিন্ন শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

মূল ভেষজবস্তু প্রস্তুত করণ

শততমিক পদ্ধতিতে ভেষজের মূল বা পাতার রসের তারতম্য অনুসারে কিংবা ভেষজ শুষ্ক তরল ইত্যাদি অবস্থাভেদে তৃতীয় শক্তি পর্যন্ত ওষুধ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফর্মূলা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু নবতম পদ্ধতিতে সকল ভেষজ পদার্থকে শুষ্ক তরল নির্বিশেষে দুগ্ধশর্করার সঙ্গে নিষ্পেষণ করে চুর্ণাকারে প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে ভেষজ পদার্থটিকে শততমিক পদ্ধতিতে তৃতীয় শক্তির বিচুর্ণ প্রস্তুত করা হয়। তিনটি পর্যায়ে এ কাজটিসম্পন্ন করা হয়।

প্রথম পর্যায় — ১ গ্রেণ মূল ভেষজ পদার্থ ১০০ গ্রেণ দুগ্ধশর্করার সঙ্গে মিশ্রিত করে ১ঘন্টা ধরে ঘর্ষণ ও মার্জন করে প্রথম শততমিক শক্তির বিচুর্ণ প্রস্তুত করা হয়। এই বিচূর্ণে মূল ভেষজের ১/১০০ বা $১০^{-২}$ অংশ থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায় — এই বিচূর্ণ থেকে ১ গ্রেণ নিয়ে ১০০ গ্রেণ দুগ্ধশর্করার সঙ্গে মিশ্রিত করে উপরের বর্ণিত পদ্ধতিতে ১ঘন্টা খলে ঘর্ষণ ও মার্জন করে দ্বিতীয়

শততমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়। এর ১ গ্রেণ মূল ভেষজের অংশ থাকে ১/১০০ × ১/১০০ = ১/১০,০০০ = $১০^{-৪}$

তৃতীয় পর্যায় — এই বিচূর্ণের ১ গ্রেণ আবার ১০০ গ্রেণ দুগ্ধশর্করার সঙ্গে মিশ্রিত করে ১ঘন্টা ঘর্ষণ ও মার্জন করে তৃতীয় শততমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়। এই বিচূর্ণের ১ গ্রেণে মূল ভেষজের বস্তুর অংশ থাকে ১/১০,০০০ × ১/১০০ = ১/১,০০০,০০০ = $১০^{-৬}$ অর্থাৎ দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ (one millionth part). এটিকে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ তৈরীর মূলবস্তু বা মাতৃশক্তি (mother substance) হিসাবে ধরা হয় এবং এ থেকেপরবর্তী শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করণ

তিন পর্যায়ে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম পর্যায় — মূলবস্তুর ১ গ্রেণ ৫০০ ফোঁটা তরল সুরাসারে (১০০ ফোঁটা সুরাসার (alcohol) + ৪০০ ফোঁটা পরিস্রুত জল) মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণের ১ ফোঁটায় মূল ভেষজের $১০^{-৬}$ × ১/৫০০ অংশ থাকে, আর মূল বস্তুর ১/৫০০ অংশ থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায় — এ মিশ্রণের ১ ফোঁটা একটি শিশিতে রেখে তাতে ১০০ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করা হয়। শিশিটি এমন হবে যাতে তার ২/৩ অংশ পূর্ণ এবং ১/৩ অংশ খালি থাকে। এবার রবারের ন্যায় কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তুর উপর এই শিশিটি রেখে ১০০ বার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে প্রথম শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। এতে মূল বস্তুর বা মাতৃশক্তির অংশ থাকে ১/৫০০ × ১/১০০ = ১/৫০,০০০ (আদি ভেষজের ১০-৬ × ১/৫০,০০০) অর্থাৎ ৫০ সহস্রের একভাগ।

তৃতীয় পর্যায় — ১০০ টি অনুবটিকার ওজন ১ গ্রেণ হয় এবং এরূপ ক্ষুদ্র অনুবটিকা এই ওষুধে সিক্ত করে ব্লটিং কাগজে শুষ্ক করে একটি শিশিতে রেখে তাকে উত্তমরূপে ছিপিবদ্ধ করতে হয়। এই শিশিটির গায়ে ১ম ক্রম (I) বলে চিহ্নিত করা হয়;

দ্বিতীয় শক্তির ওষুধ প্রস্তুকরণ

প্রথম শক্তির একটি অনুবটিকা নিয়ে সেটিকে ১ফোঁটা পরিস্রুত জলে দ্রব করতে হবে। এর সঙ্গে ১০০ ফোঁটা সুরাসার মিশ্রিত করে পূর্বোক্ত নিয়মে ১০০ বার ঝাঁকি দিতে হবে। প্রথম শক্তির ওষুধের ন্যায় ওষুধটি অনুবটিকায় প্রস্তুত করতে হবে। একটি শিশিতে তা রেখে ছিপিবদ্ধ করে তার গায়ে দ্বিতীয় ক্রম (II) লিখে চিহ্নিত করতে হবে। এতে প্রথম শক্তির ওযুধের পরিমাণের ১/৫০,০০০ ভাগ কম থাকবে।

উচ্চতর শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করণ

একই নিয়ম অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ ৩০ শক্তি পর্যন্ত ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ শক্তি অবধি ওষুধ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

অনুবটিকার আকার

হ্যানিম্যান শততমিক ওষুধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের অনুবটিকা ব্যবহার করতেন। তিনি তাদের সর্ষের দানা (mustard seed), পোস্তদানা (popy seed), ক্ষুদ্র বটিকা (pellet) ইত্যাদি নামে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের ক্ষেত্রে সর্বদাই একই আকারের ও একই ওজনের অনুবটিকা ব্যবহার করতেন। তিনি নির্দেশ দেন যে সকল ক্ষেত্রেই অনুবটিকার আকার ও ওজন এমন হবে যে তার ১০০টির ওজন ১গ্রেণ (০.০৬৩ গ্রাম) হয় অর্থাৎ ১০ নং অনুবটিকা এবং এরূপ ৫০০ টি অনুবটিকা যেন ১ ফোঁটা ওষুধে সিক্ত করা যায়। সুতরাং নবতম শক্তির ওষুধে প্রতিক্রমে পূর্ববর্তী শক্তির ওষুধের পরিমাণ কমে ৫০ হাজার ভাগের ১ ভাগ হয়। অথচ আরোগ্যকারী ক্রিয়া বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।[২১]

নামকরণ

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধকে হ্যানিম্যান নবতম পদ্ধতির ওষুধ বা অনুবটিকার সাহায্যে প্রস্তুত ওষুধ (medicamens are Golbules) বলে বর্ণনা করেছেন। শততমিক শক্তির ওষুধকে 'Medicamens a la gouttee' অর্থাৎ medicines of the drops বা ফোঁটা মাত্রায় প্রস্তুত ওষুধ বলে অভিহিত করা হত। তিনি এর অন্য কোন নামকরণ করেননি।[২২]

---

২১ পাদটিকা — ১৫৬, অনুচ্ছেদ ২৭০

২২. T.L. Bradford. The Lifes and Letters of Dr. Samuel Hahnemann. B. Jain Publishers (P) Ltd. 1986. Page - 466.

জেনেভার ডাঃ পিয়ের স্মিড (Pierre Schmidt) একে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ (Fifty millesimal potencies) বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিক্রমে ওষুধের পরিমাণ কমে দশভাগের একভাগ হলে দশমিক শক্তির ওষুধ, একশ ভাগের এক ভাগ হলে শততমিক শক্তির ওষুধ বলা হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিক্রমে ওষুধের পরিমাণ কমে ৫০ হাজার ভাগের একভাগ হয় সেজন্য পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ বলাই যুক্তি সঙ্গত।

শক্তি নির্দেশক চিহ্ন (Notation)

ওষুধের শক্তির ক্রম বোঝাবার জন্য ওষুধের নামের পাশে একটি নম্বর সূচক চিহ্ন বসানো হয়। দশমিক শক্তির পাশে X বসানো হয়। যেমন ফেরামফস 3X। শততমিক শক্তির ওষুধের নামে পাশে শুধু শক্তি সূচক সংখ্যাটি বসানো হয়, যেমন অ্যাকোনাইট ৩০। হ্যানিম্যান নবতম শক্তির ওষুধ বোঝাতে 'O' চিহ্নটি ব্যবহার করতেন। পোস্তদানার মত ১টি অনুবটিকা দিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়েছে (ফোঁটামাত্রায় নয়) এবং ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১টি মাত্র অনুবটিকা সাধারণতঃ ব্যবহার করতে হবে '0' চিহ্নটি দ্বারা এই নির্দেশ জ্ঞাপন করা হয়।[২৩] হ্যানিম্যান শক্তিসূচক সংখ্যার পরে '0' চিহ্নটি দিতেন যেমন $^1/_0$, $^2/_0$, $^3/_0$ ডাঃ পিয়ের স্মিডও এভাবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে '0' চিহ্নটি সংখ্যার আগে বসিয়ে যেমন $^0/_1$, $^0/_2$, $^0/_3$ ইত্যাদি রূপে লেখার প্রচলন হয়ে গেছে।

কেহ কেহ একে M/1, M/2, M/3 ইত্যাদি রূপে (M-Millisemal) এবং কেহ কেহ একে LM/1, LM/2, LM/3 ইত্যাদি (L-50M-1000, LM - 50,000) চিহ্ন ব্যবহার করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে শততমিক শক্তির ওষুধে আরও কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন θ মানে মূল আরক বা মাদার টিঞ্চার, C১০০ শক্তি, D ৫০০, M ১ হাজার, CM ১লক্ষ, DM ৫লক্ষ, MM ১ কোটি ইত্যাদি।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধের তুলনামূলক মান

বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধের শক্তির সঙ্গে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের তুলনামূলক মান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা শক্তির মান ভেষজ ও মাধ্যমের অনুপাত এবং ঝাঁকানির উপর নির্ভর করে। তাছাড়া ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মাতৃশক্তিতেই ভেষজের দশলক্ষ ভাগের একভাগ অংশ থাকে। কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হ্যানিম্যান পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ উদ্ভাবন করেন। এর সঙ্গে অন্য পদ্ধতির ওষুধের প্রস্তুত করণে যেমন কোন মিল নেই, গুণমানের ক্ষেত্রে বা প্রয়োগ প্রণালীতেও কোন মিল নেই।

সারাংশ

১. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধে মূলবস্তু বা আদিশক্তি কেমন করে প্রস্তুত করা হয়?

এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভেষজ পদার্থকে শততমিক তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়।

২. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধে ভেষজ বস্তু ও মাধ্যমের অনুপাত কি?

মূল ভেষজবস্তু ও মাধ্যমের অনুপাত ১ : ৫০,০০০

৩. প্রতিশক্তিক্রমে ভেষজের পরিমাণ কি হারে কমে?

প্রতিক্রমে কমে ৫০ হাজার ভাগের ১ ভাগ হয়।

৪. এতে অনুবটিকার আকার ও ওজন কিরূপ?

১০০ টির অনুবটিকার ওজন ১ গ্রেণ। ১০ নং অনুবটিকা।

৫. ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের এই নামকরণ কে করেন?

জেনেভার ডাঃ পিয়ের স্মিড।

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রয়োগগত বিভাগ

রোগীর আদর্শ আরোগ্যবিধানের নিমিত্ত নির্বাচিত ওষুধের উপযুক্ত শা ক্ত ও মাত্রা নির্ণয় ও তার প্রয়োগবিধির গুরুত্ব আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তত্ত্বগত জ্ঞানের সার্থকতা তার যথার্থ প্রয়োগে। প্রতিটি রোগীর রোগের ঘটনা এক বাস্তব সমস্যা বলে গণ্য করতে হবে। গনিতশাস্ত্রে কোন সমস্যা সমাধান করতে কিছু তথ্য (data) দেওয়া থাকে। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে সেই তথ্যের সাহায্যে সমস্যা (problem) সমাধান করতে হয়। চিকিৎসাকার্যেও তেমনি সংগৃহীত লক্ষণাবলীকে তথ্য হিসাবে ধরে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে সমস্যার সঠিক সমাধান করতে হয় এবং বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যাচাই করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। অনেকেই অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কিন্তু কোন আবিষ্কৃত সত্যের নীতিনিষ্ঠ অনুশীলন ব্যতীত যে অভিজ্ঞতা তা একেবারেই মূল্যহীন। কেন্ট বলেন, অভিজ্ঞতার বলে কোন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা কেবল আবিষ্কৃত সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত (confirm) করতে পারে। যে ব্যক্তির কোন নীতি নেই, যে সত্য অনুসন্ধানী নয়, যাঁর কোন নিয়ম নেই, প্রতিটি বিষয়ে যে নিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে না কেবল সে ব্যক্তিই মনে করতে পারে অভিজ্ঞতা বলে আবিষ্কার করা সম্ভব।[২৪] তিনি অন্যত্র বলছেন যতক্ষণ না মানুষের মনে সত্যের পরিস্ফুটন ঘটবে তার সকল অভিজ্ঞতা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।[২৫] অতএব আমাদের প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে যুক্তির পথ ধরে অভ্রান্ত লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। বর্তমান বিভাগ সেই লক্ষ্যে পৌছবার নিশ্চিত নিশানা।

---

২৪. Experience can only confirm that which has been discovered through principle or law guiding in the proper direction....one who has no doctrines, no truste, no law, who does not rely upon law for every thing, imagines he discovers by experience - Kent. Lectures on Homoeopathic Philosophy. B. Jain Publishers. Third Print. Page - 35.

২৫. Unless man has truth in his mind his experiences are false. Ibid. Page - 252.

১ অধ্যায়

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ
রোগীর অবস্থা

লক্ষণরাজি পথপ্রদর্শক

প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয়, কি ওষুধ দেব ? আমরা রোগীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনি, তার আত্মীয় পরিজনদের বক্তব্যও শুনি, এবং রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করি। তারপর যত্নসহকারে রোগীলিপি প্রস্তুত করি। সংগৃহীত লক্ষণসমূহের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে পরিচায়ক লক্ষণ সমূহের সাহায্যে লক্ষণ সমষ্টি নির্ণয় করি। তারপর সদৃশনীতি অনুযায়ী একটি উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করি। এবার আমাদের দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় নির্বাচিত ওষুধটি কত শক্তিতে কিরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করব ? ওষুধ নির্বাচনের বেলায় যেমন সদৃশনীতি এবং রোগীর লক্ষণসমূহ আমাদের পথপ্রদর্শক শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণেও তেমনি সদৃশনীতি ও লক্ষণরাজি আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। এ পথ প্রদর্শক অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিভরযোগ্য। এ কখনও আমাদের বিফল করেনা।

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণের উপায়

ওষুধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য রোগপ্রবণতার পরিতৃপ্তি বিধান করা। এজন্য শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়া মূলতঃ প্রবণতার পরিমাপ করা। প্রবণতা পরিমাপ করা অর্থাৎ শক্তিও মাত্রা নির্ধারণ করা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে— রোগীর অবস্থা, রোগের প্রকৃতি এবং ওষুধের প্রকৃতি, সংক্ষেপে 3 D's - The Diseased, The Disease, The Drug. প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রশ্ন করি, রোগীটির ধাতুপ্রকৃতি কিরূপ, সে যে রোগাবস্থায় ভুগছে তার প্রকৃতি কিরূপ এবং এ অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য যে ওষুধটি আমরা নির্বাচন করেছি তার প্রকৃতিই কিরূপ। তারপর আমরা শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিই।

শক্তির স্তর বিভাগ

শক্তি নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে শক্তির স্তর বা পর্যায় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। ওষুধের শক্তিকে প্রধানতঃ ৩টি স্তরে ভাগ করা হয় — নিম্ন, মধ্য ও উচ্চশক্তি। মূল আরক (θ) থেকে ৩০ শক্তিকে নিম্নশক্তি, ৩০ থেকে ২০০ মধ্যশক্তি, তদূর্ধ্বে যাবতীয় শক্তিকে উচ্চশক্তি বলা হয়।

কোন শক্তিকে ভিত্তিশক্তি গণ্য করা হয়

প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে শক্তি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য আমাদের এমন একটা শক্তি থাকা দরকার যাকে ভিত্তি করে আমরা রোগীর বা রোগের অবস্থা অনুযায়ী তার উর্ধ্বে বা নিম্নশক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারি। শক্তির একটা নির্দিষ্ট স্তর স্থির না থাকলে বিচার বিবেচনা অনেকসময়ই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ৩০ শক্তি কে এই ভিত্তিশক্তি (base potency) ধরা হয়। কেন্টের মতে ৩০ শক্তিকে যে কোন রোগের যে কোন অবস্থায় নিরাপদ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[২৬]

কোনশক্তি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত

রোগের আরোগ্য বিধানের জন্য ওষুধের সব রকমশক্তিরই প্রয়োজন হয়। কাজেই উন্মুক্ত মন দিয়ে একেবারে নিম্নশক্তি থেকে উর্ধ্বতম শক্তি পর্যন্ত আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে। আমরা শুধু নিম্নশক্তি কিংবা কেবল উচ্চশক্তি অথবা মধ্যপন্থা নিরাপদ বলে সকলক্ষেত্রে ৩০শক্তি ব্যবহার করব এবং তাতেই সকল রোগ আরোগ্য হবে এরূপ আশা করা বৃথা। হোমিওপ্যাথির মূলনীতিই ছিল স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি (doctrine of individualisation)। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র, প্রতিটি রোগস্বতন্ত্র। অতএব প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে রোগীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তার প্রবণতার বিচার করতে হবে।

---

২৬. ক. It ought to be distinctly felt that the 30th potency is low enough to begin business with in any acute or chronic disease, but where the limit is no mortal can see-Kent. Ibid. Page-252

খ. The 30th is low enough for anybody or anything. - Kent. Ibid. Page - 257.

কোন শক্তি ও মাত্রা বিরুদ্ধ নিদর্শন

এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কোন রোগীর কোন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কোন শক্তিও মাত্রায় কোন ওষুধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলে তা সতর্কবাণী হিসেবে গণ্য করে সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। যেমন চাপা দেওয়া যক্ষ্মারোগের ইতিহাসে হিপার সালফার, সালফার, সিলিসিয়া ইত্যাদি নির্বাচিত হলে তার উচ্চ শক্তির প্রয়োগ, কিংবা অনারোগ্য রোগীর ক্ষেত্রে সদৃশতম ওষুধের উচ্চশক্তি ও অধিকমাত্রায় প্রয়োগ রোগীর জীবন সংশয় ঘটাতে পারে।

এবার আমরা রোগী, রোগ ও ওষুধের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ নিয়ে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব। মনে রাখতে হবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ তিনটি বিষয় অবশ্যই যুগপৎ বিবেচনা করতে হবে।

রোগীর অবস্থা

প্রতিটি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র তার প্রবণতাও স্বতন্ত্র। রোগাক্রমণে এই প্রবণতার বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের প্রবণতা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হয় এবং তদনুযায়ী শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে প্রবণতার পরিবর্তন হয় ঃ

১. বয়স (age) — বয়স যখন কম থাকে তখন প্রবণতা বেশী থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে প্রবণতা তত কমতে থাকে। শিশু, তরুণ ও তেজস্বী (vigorous) ব্যক্তির প্রবণতা বেশী। এজন্য এদের ক্ষেত্রে মধ্য থেকে উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের প্রবণতা কম। এদের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি ও মাত্রার সম্পর্ক ব্যস্ত অনুপাত। এজন্য আমরা কেবলমাত্র শক্তির কথা উল্লেখ করব। মাত্রা তদনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে।

বর্ধিষ্ণু বয়সে শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতিশীল (sensitive) হয়। যে অঙ্গগুলো তখন বেশী বাড়ে সেগুলো আরও বেশী অনুভূতিশীল হয়। এজন্য এ বয়সে মধ্য ও উচ্চশক্তির ওষুধের প্রয়োজন হয়। একারণেই সে অঙ্গের প্রতি বেশী ক্রিয়াশীল

ওষুধ উচ্চশক্তিতে ভাল কাজ করে। এজন্যই এ বয়সে শিশুদের ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকেরিয়া ফস, সিলিসিয়া ইত্যাদি ওষুধ নির্দেশিত হলে মধ্য ও উচ্চ শক্তিতে (২০০, ১০০০) এত ভাল কাজ করে। দাঁত ওঠার সময় যখন কোন শিশু দিনরাত্রি যন্ত্রণায় চিৎকার করে, মেজাজ খিটখিটে হয়, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে একটু আরাম বোধ করে, কিংবা কোন তরুণী যখন বাধকব্যথায় (dysmenorrhea) অসহ্য ব্যাথায় ছটফট করে, মেজাজ এমন বিগড়ে যায় যে অযথা লোককে গালিগালাজ করে তখন সাধারণতঃ ক্যামোমিলার কথা আমাদের মনে হয়। তখন ক্যামোমিলা কত শক্তিতে প্রয়োগ করলে দ্রুত উপশম লাভ করা যাবে? আমরা যদি এ ওষুধটি মূল আরক, ৩, ৬ বা ১২ ইত্যাদি শক্তিতে প্রয়োগ করি তাহলে সাময়িক উপশম হবে ঠিকই কিন্তু একটু পরে ব্যথা আরও তীব্র হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ২০০ শক্তির ১ মাত্রা মন্ত্রের মত কাজ করবে। ৩০ শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করলে অন্তত ৬/৭ মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে। কেননা এ অবস্থায় সে ওষুধের প্রতি রোগীর প্রবণতা অত্যন্ত বেশী থাকে। রোগলক্ষণ দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের ঐ একটি ওষুধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। প্রবণতা যত বেশী শক্তি তত বেশী, মাত্রা তত কম। এজন্য ক্যামোমিলার ২০০ শক্তির ১ মাত্রায় সে প্রবণতা পরিতৃপ্তি বিধান করবে। চাহিদা মিটে গেলে চাহিদাজ্ঞাপক নিদর্শনও আর থাকবেনা। যদি তখনও চাহিদা থাকে তবে আরও দু একমাত্রা প্রয়োগ করে প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটাতে হবে। লক্ষণকেই সর্বদা আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাব ধরে অগ্রসর হতে হবে।

বার্ধক্যে প্রতিক্রিয়া শক্তি কমে যায়, যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওষুধের লক্ষণ দেখা যায়। এজন্য এসকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত ওষুধের নিম্নশক্তির কয়েকমাত্রা বেশ কিছুকাল ধরে প্রয়োগ করতেহয়। পরে অবস্থা কিছুটা সুস্থিত হলে মধ্য শক্তিতে কয়েকমাত্রা কিছুকাল পরপর প্রয়োগ করতে হয় যাতে অবস্থার পুনরায় অবনতি (relapse) না ঘটে।

এক ভদ্রলোক বয়স ৭০, বাত, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে ভুগছেন এবং নিয়ম করে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খান। কিন্তু ইদানীং ডান কুচকির হার্নিয়ায় খুব ব্যথা হয়েছে। অস্ত্রোপচার করার মত রোগীর অবস্থা নেই অগত্যা হোমিওপ্যাথি।

হার্নিয়া ডান কুচকিতে মনে হয় আটকে আছে। অণ্ডকোষটিও উপরদিকে টেনে ধরেছে, চেপে ধরা অনুভূতি। পুরো তলপেটে ব্যথা। পেট চেপে একেবারে পিঠের সঙ্গে লেগে রয়েছে। ব্যথা তলপেটে থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিন্য। কাল শক্ত মল। মলদ্বারে আক্ষেপ, সঙ্কোচন ও ভেতরদিকে টেনে ধরার অনুভূতি। অবরুদ্ধ বায়ুজনিত শূল বেদনা। প্রস্রাব স্বল্প, কষ্টকর, ফোঁটাফোঁটা। ভদ্রলোক আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ।

আমাদের ওষুধ নিঃসন্দেহে প্লাম্বাম মেটালিকাম। এ ওষুধ এই রোগীর ক্ষেত্রে কত শক্তি প্রয়োগ করলে এঁকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে? অবশ্যই নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা। এঁকে প্লাম্বাম ৩ ১ ফোঁটা মাত্রায় রোজ ৩বার ৩দিন দেওয়ায় তাঁর হার্নিয়ার ব্যথা কমে যায়। পায়খানা প্রস্রাব অনেকটা স্বাভাবিক হয়। পরে ওষুধটি ৩০ শক্তিতে দিনে ২বার ৭দিন খাওয়ায় সে এসকল কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

চিকিৎসার সকল পর্যায়েই রোগীর অবস্থা, লক্ষণের তীব্রতা ও স্পষ্টতা এবং সাদৃশ্যের নিবিড়তা শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে। একারণেই শিশুদের নিম্নশক্তি ও বয়স্কদের উচ্চশক্তি প্রদেয়, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এথেকে আরেকটা বিষয় পরিষ্কার হবে যে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার সময়ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ করে। আরেকটা বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে যে সকলরোগী দীর্ঘকাল কোনও ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত তাদের সেই ওষুধ সেবন হঠাৎ বন্ধ করে দিলে হিতের পরিবর্তে অহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

[ক্রমশ :]

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ
রোগীর অবস্থা

২. ধাতু প্রকৃতি (Constitution and temperament) — স্নায়ুপ্রধান (nervous), রক্তপ্রধান (sanguine), রাগপ্রধান (choleric) ধাতুর অনুভূতিপ্রবণ (sensitive) ব্যক্তির প্রবণতা বেশী। এজন্য এদের ক্ষেত্রে ওষুধের উচ্চশক্তির ক্ষুদ্রমাত্রার প্রয়োজন হয়।

শ্লেষ্মা প্রধান (phlegmatic), গণ্ডমালা প্রধান (scrofulous) এবং যাদের প্রতিক্রিয়া শক্তি কম (torpid) তাদের প্রবণতা কম। এদের নিম্নশক্তি ও অধিকমাত্রার প্রয়োজন হয়।

৩. বুদ্ধি ও ভাবাবেগের ক্ষেত্র (intelligence and emotion) — যারা বুদ্ধিমান ও আবেগপ্রবণ তাদের প্রবণতা বেশী। কাজেই এদের ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রমাত্রার প্রয়োজন।

যাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্প্রভ, ভাবাবেগ কম তাদের প্রবণতা কম। কাজেই এদের ক্ষেত্রে ওষুধের নিম্ন ও মধ্যশক্তি, অধিকমাত্রা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে হয়। এভাবে ধীরে ধীরে প্রবণতার পরিবর্তন হয় এবং মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। যে সকল শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি কম, পড়া বুঝতে পারে না, মনে রাখতে পারে না, পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না তাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য অ্যানাকার্ডিয়াম বা তদ্রূপ কিছু ওষুধের উচ্চশক্তি প্রয়োগে স্মৃতিশক্তি বাড়ার সম্ভবনা কম।

এসকল ক্ষেত্রে ধাতুগত ওষুধ নির্বাচন করে অবস্থা অনুযায়ী নিম্ন বা মধ্য

শক্তি থেকে ক্রমশ উচ্চশক্তিতে যেতে হয়। প্রতিশক্তির ওষুধ বেশ কয়েকবার প্রয়োগ করতে হবে।

বুদ্ধিমান, চঞ্চল শিশু এবং আবেগপ্রবণ তরুণ তরুণীদের ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি ও কম মাত্রার প্রয়োজন হয়। হাবা, বোবা, পৌরুষহীনদের (imbacile) প্রবণতা কম। অতএব নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা। এদের ক্ষেত্রে ওষুধের কখনও মূল আরকের প্রয়োজন হয়।

৪. অভ্যাস ও বৃত্তি (habit and occupation) — বুদ্ধিজীবী, উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ব্যক্তি, কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, যারা ঘরে বসে কাজ করে (sedentary life) , যাদের দৈহিক থেকে মস্তিষ্কের কাজ বেশী করতে হয়, সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদি রুটিনমাফিক করতে অভ্যস্ত তাদের প্রবণতা বেশী। এদের ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রমাত্রা। এজন্য শিল্পী, কবি, দার্শনিক, লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সাংবাদিক প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি ও কম মাত্রার প্রয়োজন হয়।

যাদের মাংসপেশী দৃঢ় (strong muscle), যাদের দৈহিক শক্তিই প্রধান সম্পদ, যারা কঠোর কায়িক পরিশ্রমে জীবিকার্জন করে, ঘরের বাইরে যাদের বেশী সময় কাটাতে হয়, যাদের নিদ্রা ও বিশ্রামের সময় কম, মোটা ভাত কাপড়ে যাদের জীবন কাটে, যাদের জীবন যাত্রার মান সাধারণ স্তরের, যাদের থাকা খাওয়ার কোন স্থিরতা নেই, যাদের উত্তেজনা জাগাতে মাদকজাতীয় কোন উগ্র উত্তেজক দ্রব্য অনেকটা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, সাধারণ উত্তেজক দ্রব্য অনেকটা খেলেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়না তাদের প্রবণতা কম। এজন্য ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিশ্রমিক, শিল্পশ্রমিক, কুলি, দিনমজুর প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরে যারা রয়েছে তাদের প্রবণতা কম। এদের ক্ষেত্রে নিম্ন শক্তি ও অধিকমাত্রার প্রয়োজন হয়। অনেকসময় এদের ক্ষেত্রে ওষুধের মূলআরকেরও প্রয়োজন হয়।

আর এই দু'শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে যারা আছে, যাদের জীবন ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আজীবন দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, যাদের আয়

সীমিত কিন্তু ব্যয় কোন সীমা মানতে চায়না, যাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই, যাদের সর্বদা অবস্থা অনুযায়ী আপোষ করে চলতে হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাজ করে যেতে হয় সমাজের এই বৃহৎ অংশ যাদের মধ্যবিত্ত বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের প্রবণতা মাঝারি ধরনের। এদের মধ্য থেকে উচ্চশক্তির ওষুধ মাঝে মাঝেই প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য মাঝারি চাষী, ছোট ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, মাঝারিধরনের স্বনিযুক্ত কর্মী প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ৩০ থেকে ২০০ শক্তির ওষুধের বেশী প্রয়োজন হয়।

৫. ভেষজ বা রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের প্রবণতা কমে যায়। এজন্য তামাক শিল্পের শ্রমিক ও দোকানদার, মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারী এবং রাসায়নিক শিল্প, সুগন্ধি ও প্রসাধন সামগ্রীর প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রবণতা কম হয়। এজন্য এদের ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ওষুধ অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

তবে এদের যদি ভেষজের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দরুন রোগ হয় তবে সেই ভেষজের বা তজ্জাতীয় কোন ভেষজের উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়। কেননা এদের সেই ভেষজের প্রতি প্রবণতা তীব্র হয়। সাধারণতঃ ভেষজের উচ্চশক্তি নিম্নশক্তির কুফলের প্রতিকার করে (antidotes) ।

৬. যারা দুর্বল প্রকৃতির, যারা প্রায়ই একটা না একটা অসুখে ভোগে তাদের প্রবণতা কম। কাজেই এদের ক্ষেত্রে ওষুধের নিম্নশক্তি, কয়েকমাত্রা বেশ কিছুকাল ধরে প্রয়োগ করতে হয়।

৭. যারা অসহিষ্ণু প্রকৃতির, যাদের ধৈর্য কম, রোগ হলে অতিমাত্রায় অস্থির হয়ে পড়ে এবং তক্ষুনি উপশম চায়, যারা ক্রমাগত চিকিৎসক ও ওষুধ পরিবর্তন করে তাদের প্রবণতা কম। এদের ক্ষেত্রে সর্বদাই কোন শীঘ্রক্রিয় ওষুধের নিম্নশক্তি কয়েকমাত্রা প্রয়োজন হয়। এদের ক্ষেত্রে কোন ধাতুগত ওষুধ যেমন সিলিসিয়া যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তার উচ্চশক্তির একমাত্রা প্রয়োগ করে তার ফলাফলের

জন্য অপেক্ষা করতে বলা বৃথা। সামান্য বৃদ্ধিও এরা সহ্য করবে না, কিছু সময় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবে না। কেননা এদের সে মানসিকতা নেই। এদের সঙ্গে সঙ্গে উপশম চাই। আরোগ্য এদের কাছে গৌণ বিষয়। একটা ওষুধ খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে উপশম না হলে অন্য ওষুধ চাইবে, অন্য ওষুধ খাবে বা অন্য চিকিৎসকের নিকট চলে যাবে। এসকল ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ওষুধ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্য বা উচ্চশক্তির ওষুধ দিলেও প্রচুর প্লাসিবো ব্যবস্থা করতে হবে। এদের ক্ষেত্রে ওষুধের মূল আরক অনেক সময় টনিকের কাজ করে। পরে ধীরে ধীরে উচ্চতর শক্তিতে যেতে হয়। এসকল ক্ষেত্র হল পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শক্ষেত্র।

একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম

৮. অতিরিক্ত ওষুধ গ্রহণে প্রবণতা কমে যায়। কাজেই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নিম্নশক্তির ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু তাতে বিশেষ সুফল লাভ করা যাবে না। যারা সর্বদাই কোননা কোন ওষুধ খায়, অ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক বা অন্য কোন ওষুধ, কিংবা এসব ওষুধই বিভিন্ন কষ্টের উপশমের জন্য দীর্ঘদিন ধরে রুটিনমাফিক খেতে অভ্যস্ত তাদের প্রবণতা খুব কমে যায়। এদের অনেকে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, অনিদ্রা ইত্যাদির জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এবং অম্ল অজীর্ণ ব্যথা বেদনার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ স্থূল মাত্রায় নিজেদের ইচ্ছামত খেয়ে চলে। এজন্য এ ওষুধগুলো যে স্তরে ক্রিয়া করে সে স্তরে প্রবণতা খুবই কমে যায়। সেজন্য এসকল ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ওষুধ দেহে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু উচ্চ শক্তির ওষুধ যে স্তরে ক্রিয়া করে সেস্তর তখনও অনাক্রান্ত রয়ে গেছে। এজন্য এসকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উচ্চশক্তির ওষুধ ক্ষুদ্রমাত্রায় বাঞ্ছিত সুফল প্রদান করবে।[২৭] এজন্য যারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য জোলাপজাতীয় ওষুধ, মূত্র পরিষ্কারের জন্য মূত্র পরিষ্কারক ওষুধ (cathertics), অজীর্ণতার জন্য পরিপাকশক্তি

---

২৭. Stuart Close. Ibid. Page - 199.

বর্ধক ওষুধ, দৈহিকশক্তি বাড়াবার জন্য টনিক, যৌনশক্তি বাড়াবার জন্য উত্তেজনা বর্ধক ওষুধ স্থূলমাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে খেতে অভ্যস্ত তাদের ওষুধ দেওয়া বৃথা। এসব পুরনো রোগীদের অনেকে আবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে কিংবা কোন বন্ধুবান্ধব বা দোকানদারের পরামর্শমত নিজেরাই ওষুধ খায়। অনেক সময় দীর্ঘকাল ধরে একই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করার জন্য সেই ওষুধের প্রুভিং-এর চিত্র এদের মধ্যে ফুটে ওঠে। তখন লক্ষণসাদৃশ্য অনুযায়ী সেই ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগতো কমবেই না বরং বেড়ে যাবে। তখন কিছুকাল বিনা ওষুধে কিংবা প্লাসিবো দিয়ে রাখতে হয়। প্রয়োজনে সে অবস্থা প্রতিকারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

৯. রোগীর অভিপ্রায় — চিকিৎসাকালে রোগীর অভিপ্রায়ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। চিররোগের চিকিৎসায় দীর্ঘসময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। যদি রোগীর ধৈর্যধারণ সম্ভব না হয় এবং আশু উপশম চায় তবে ওষুধ নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। আর যদি স্থায়ী আরোগ্য লাভের জন্য কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয় তবে উচ্চশক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এসকল ক্ষেত্র পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

১০. ইডিওসিনক্রেসি (idiosyncracy) - কিছু লোক আছে যারা বিশেষ কোন দ্রব্য বা প্রভাব দ্বারা মাত্রাতিরিক্তভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। অথচ এসকল দ্রব্য বা প্রভাব অন্যলোকে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনদ্রব্য, পরিবেশ ও পরিস্থিতি, বিশেষ বিশেষ ওষুধ প্রভৃতিতে এদের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এরা কিন্তু অন্য সকল দিক থেকে স্বাভাবিক বোধ করে। দেহতন্ত্রের এই অবস্থাকে বিশেষ প্রবণতা বা অস্বাভাবিক প্রবণতা (idiosyncracy) বলে এবং যাদের এই প্রবণতা রয়েছে তাদেরকে বিশেষ প্রবণতাযুক্ত ব্যক্তি (idiosyncratic) বলে। এ সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়, তা নইলে বিপদ হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে সর্বদাই ওষুধ নিম্নশক্তিতে ব্যবহার করতে হয়। উচ্চশক্তি বিপজ্জনক হতে পারে। কখনও ৩০ শক্তির উর্দ্ধে প্রয়োগ করতে নেই। এ সকল ক্ষেত্রও পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শস্থল।

মনে রাখতে হবে ইডিওসিনক্রেসী বলতে কোন দুর্বল ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাধারণ প্রবণতা বুঝায় না। এটি কোন কিছুর প্রতি উচ্চপ্রবণতা ও নির্দেশ করে না। এটি সম্পূর্ণরূপে গঠনগত বিশৃঙ্খলা (morphological imbalance) এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার। দেহের এই অবস্থার দরুণ কোন বিশেষ দ্রব্য প্রভাবের প্রতি ব্যক্তিমানুষে অত্যধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, অন্য মানুষ যেখানে অতি সামান্য বা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয় না। এটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা অর্জিত হতে পারে।

সারমর্ম

১. শক্তি নিরূপণে ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হয় কেন?

শক্তি নিরূপণের উদ্দেশ্য ব্যক্তিমানুষের প্রবণতার পরিতৃপ্তি বিধান করা। প্রবণতার পরিমাপ করার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হয়।

২. শক্তি নিরূপণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় কি?

রোগীর অবস্থা, রোগের অবস্থা এবং ওষুধের প্রকৃতি।

৩. প্রবণতার পরিবর্তন কিসে হয়?

বয়স, ধাতুপ্রকৃতি, বৃত্তি, অভ্যাস, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের ক্ষেত্র, রোগভোগ।

৪. ইডিওসিনক্রেসী বলতে কি বুঝায়?

ব্যক্তিমানুষের দেহতন্ত্রের এক বিশেষ অবস্থা যারজন্য কোন বিশেষ দ্রব্য বা প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হয়।

---

২৮. অনুচ্ছেদ ১১৭

২৯. Stuart Close. Ibid. Page - 112,113.

৫. কোন কোন ক্ষেত্র পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শস্থল ?

সকলক্ষেত্রেই পঞ্চাশসহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগ করা চলে, তবে অসহিষ্ণু প্রকৃতির লোক, যারা অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত, ইডিওসিনক্রেসীর ক্ষেত্র এবং দুরারোগ্য রোগীর ক্ষেত্র পঞ্চাশসহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শস্থল।

৬. কোন শক্তির ওষুধ সকল বয়সে সকল রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে ?

৩০ শক্তি।

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ — রোগের অবস্থা

শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের লক্ষ্য

শত্রু শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে শত্রুর প্রকৃতি, তার শক্তির গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থা, আক্রমণের স্থান ও তার গুরুত্ব, আক্রমণের গতি ও তীব্রতা এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। রোগশক্তির সঙ্গে মোকাবিলায় ও তেমনি রোগের প্রকৃতি, শক্তি, গতি ও তীব্রতা, দেহে আক্রান্ত অংশের অবস্থান ও গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই চিকিৎসাকার্য পরিচালনার নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। পরিকল্পনাহীন কোন কাজ সফল হতে পারেনা। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই-এ আমাদের অস্ত্র হল ওষুধ। কোন ওষুধটি অবস্থা বিশেষে বিশেষ কার্যকরী হবে সেটি ঠিক করা অর্থাৎ ওষুধ নির্বাচন করা আমাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ হল এই ওষুধটি কত শক্তিতে কিরূপ পরিমাণে কখন কিভাবে প্রয়োগ করা হলে রোগশক্তি সম্পূর্ণ পরাভূত হবে এবং দেহরাজ্যে আবার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে তা স্থির করা। শুধু অস্ত্র থাকলেই হবে না সে অস্ত্র যথাযথ ভাবে প্রয়োগের জ্ঞান থাকা তাই এত আবশ্যক। রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী শক্তি ও মাত্রা নিরূপণের উপায় নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

রোগের প্রকৃতি

রোগ সমূহকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — বাহ্যিক কারণ জনিত পীরা (diseases caused by mechanical and exterior sources) এবং অভ্যন্তরীণ পীড়া বা প্রকৃত পীড়া (dynamic diseases)।

বাহ্যিক কারণ জনিত পীড়া — নানা কারণে অনেক সময় সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়মগুলি মেনে না চললে, অতিরিক্ত রোদ-বৃষ্টি, ঠান্ডা লাগলে, আহার নিদ্রায় অনিয়ম হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এগুলোকে সাধারণ অসুস্থতা (indisposition) বলা হয়। আহার বিহারে সংযম আনলে, স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চললে এবং বিশ্রাম নিলে এগুলো আপনা থেকেই চলে যায়। অনেক সময় রোগীর কষ্টের লাঘবের জন্য এবং স্বাস্থ্য দ্রুত ফিরিয়ে আনতে কোন লঘুক্রিয় ওষুধের প্রয়োজন হয়। লক্ষণ সাদৃশ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ওষুধটি তখন নিম্ন শক্তিতে দু-তিন মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।[২৮]

এক যুবক বিয়ে বাড়িতে সারা রাত জেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করেছে, হৈ-হল্লোর করেছে, প্রচুর পানাহার করেছে। পরের দিন সকালে পেটে প্রচন্ড ব্যথা, পেট বায়ুতে ফুলে উঠেছে, পেটে একটা শক্ত পাথর চেপে আছে বলে মনে হচ্ছে, বার বার পায়খানার বেগ পাচ্ছে কিন্তু পায়খানা বিশেষ হচ্ছেনা। বমি বমি ভাব কিন্তু বমি করতে পারছে না। মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা এবং প্রচন্ড অস্থিরতা। অনিয়মজনিত এ কষ্টকর অবস্থার প্রতিকারে ওষুধ অবশ্যই দিতে হবে। এক্ষেত্রে নাক্সভমই আমাদের ওষুধ। এর ৩০ শক্তির ২ মাত্রা আধ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করাতে রোগী দুবার পায়খানা করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

এছাড়া দুর্ঘটনা যে কোন সময় যে কোন রোগের হতে পারে। আঘাত, পতন বা অন্য কোন কারণে কোন স্থানে ব্যথা হতে পারে, ফুলে যেতে পারে, হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। দেহে কোন হাড় বা কাঁটা ঢুকে যেতে পারে, কোন জায়গা কেটে বা পুড়ে যেতে পারে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য দেহে ঢুকে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। আহত স্থানে তখন সাধারণতঃ যান্ত্রিক সাহায্যের (mechanicaliaid) দরকার হয়। কখনও শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এসকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি নিম্নশক্তি কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। যেমন আঘাতে আর্নিকা, রুটা, হাইপেরিকাম, রাসটক্স, লিডাম ইত্যাদি, রক্তপাতে ও ক্ষতে কেলেন্ডুলা, ইপিকাক, এসিড নাইট্রি ক, হাইপেরিকাম, লিডাম, পোড়াক্ষতে

২৮. অনুচ্ছেদ ১১৭

ক্যান্থারিস, কস্টিকাম ইত্যাদি ওষুধের প্রয়োজন হয়। তখন এগুলো ৬,৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। পরে কখনও ২০০ শক্তির প্রয়োজন হতে পারে। কাঁটা বের করার জন্য হিপার সালফার, মার্কুরিয়াস এবং সিলিসিয়ার প্রয়োজন হয়। তখন এগুলো ৩ বা ৬ শক্তিতেকয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় ওষুধ সেবনের সঙ্গে বাহ্যিক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।[৩০]

আঘাত লেগে কোন জায়গা ফুলে কালশিরা পড়লে আর্নিকা-৩০ অভ্যন্তরীণ প্রয়োগের সঙ্গে এর মাদার টিঞ্চার আহত স্থানে লাগালে, কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে ক্যালেন্ডুলা ৬ অভ্যন্তরীণ প্রয়োগের সঙ্গে ক্যালেন্ডুলা θ বাহ্যিক প্রয়োগ করলে, পুড়ে গেলে ক্যান্থারিস ৬ অভ্যন্তরীণ প্রয়োগের সঙ্গে ক্যান্থারিস θ বাহ্যিক প্রয়োগ করলে আরগ্য ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়। এরূপ বাহ্যিক প্রয়োগে কোন রোগ চাপা পড়েনা। কেননা এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন রোগ নেই। এছাড়া ভয় পেয়ে বা অন্য কারণে অচৈতন্য হয়ে পড়লে, কোন কারণে শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হলে, শরীর থেকে রক্ত বা জলীয় পদার্থ অতিরিক্ত নির্গত হলে নির্বাচিত ওষুধটি নিম্ন শক্তিতেঘন ঘন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি (management) যেমন অক্সিজেন দেওয়া, স্যালাইন দেওয়া, রক্ত দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। এধরনের জরুরী ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিম্নশক্তিতে কয়েকমত্রা প্রয়োগ করলে রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে।

৩০. অণুচ্ছেদ ৭, পাদটীকা এবং অণুচ্ছেদ ১৮৬

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ
রোগের অবস্থা

প্রকৃত রোগের শ্রেণী বিভাগ

প্রকৃত রোগ দু প্রকার - অচির রোগ (acute diseases) এবং চির রোগ (chronic diseases)। এই দুই প্রকার রোগের প্রকৃতি আলাদা। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা। শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের বিবেচ্য বিষয়ও আলাদা।

অচির রোগ এবং শক্তি ও মাত্রা

১.০ অচির রোগ হল সুপ্ত সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস (transient explosion of latent psora)। কোন উদ্দীপক (exciting cause) সুপ্ত সোরাকে জাগিয়ে তোলে। এর প্রকাশে সাধারণতঃ তীব্রতা থাকে। দেহতন্ত্রে কেবলমাত্র ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা (functional changes) দেখা যায়, কোন গঠনগত পরিবর্তন (organic changes) দেখা যায় না। দেহে এর প্রকাশ স্থল (location), অনুভূতি (sensation), হ্রাসবৃদ্ধি (modality) এবং সহচর লক্ষণ (concomitant symptoms) সমূহের মাধ্যমে এ স্পষ্টভাবে নিজের প্রকাশ ঘোষণা করে। ফলে লক্ষণ সমূহে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষক, আশ্চর্যজনক, বিরল এবং অদ্ভুত লক্ষণ সমূহ (পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ) (striking, singular, uncommon and peculiar, characteristic signs and symptoms) দেখা যায়। - অনুচ্ছেদ ১৫৩।

এ সকল ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন জরুরী। এজন্য সাহায্য প্রার্থনার ভাষায় কোন অস্পষ্টতা থাকেনা। লক্ষণ সমষ্টি (totality of symptoms) দ্ব্যর্থহীনভাবে

একটি ওষুধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। চিকিৎসার উদ্দেশ্য যেহেতু প্রজ্বলিত সোরাকে প্রশমিত করা, তাকে নির্মূল করা নয় এজন্য কোন লঘুক্রিয় ওষুধের নিম্ন ও মধ্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অচির রোগের ভোগকাল সীমিত। এ সময়ের মধ্যে হয় আরোগ্য নয় মৃত্যুতে এর ক্রিয়া শেষ হয়। এজন্য নির্বাচিত ওষুধটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করে যেতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত রোগের আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পায়। আরেকটি কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। অচির পীড়ার চিকিৎসায় সাধারণতঃ প্রথম কয়েক ঘন্টায় সামান্য হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু ওষুধের মাত্রা যত ক্ষুদ্র হবে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি তত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী হবে।[৩১]

১.১ অচির পীড়া সাধারণতঃ তিনভাবে মানুষকে আক্রমণ করে— ব্যক্তিগতভাবে (individually), বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লোককে (sporadically) এবং এক জায়গায় বহু লোককে একসঙ্গে (epidemically) - (অনুচ্ছেদ ৭৩)। অচির পীড়ায় ব্যক্তিগতভাবে অসুস্থ হলে উদ্দীপক কারণের অনুসন্ধান করতে হয় এবং তদনুযায়ী ওষুধ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হয়। এজন্য সর্দিকাশি জ্বর, উদরাময়, আমাশয়, টনসিল প্রদাহ, উদরশূল, দন্তশূল প্রভৃতি পীড়ায় ওষুধ নিম্ন শক্তিতে (৬.৩০) কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।

১.২ আকাশ, বায়ু, আবহাওয়ার প্রভাবে কিংবা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কোন পদার্থ দ্বারা একই সময়ে কিছুলোক এখানে সেখানে অসুস্থ হতে পারে। এর কারণ হল সেই সমস্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা একই সময়ে কিছুলোকের মধ্যে দেখা যায়। যেমন চোখ ওঠা, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি ওষুধের লক্ষণই অধিকাংশ রোগীতে দেখা যায়। তখন সে ওষুধটি নিম্ন শক্তিতে (৬,৩০) দিনে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।

এ সকল ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষেধক ওষুধ আছে যেগুলো রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকরী হয়। যেমন হুপিং কাশিতে পার্টুসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম, চোখ ওঠায় ইউফ্রেসিয়া, হাম রোগে মর্বিলিনাম ইত্যাদি। এগুলো সাধারণতঃ ২০০ শক্তিতে সপ্তাহে ১ মাত্রা প্রয়োগ করা হয়।

---

৩১. The smaller the dose of the homoeopathic remedies, so much the slighter and shorter is this apparent increase of the disease during the first hours. Aphor. 159

তবে কোন বাড়িতে এরূপ রোগ দেখা দিলে যাদের এ রোগ হয়নি তাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ২ বার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

১.৩ সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ সর্বদাই নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করা হয়। চর্মরোগ, উদরাময়, আমাশয়, চোখ ওঠা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। চর্মরোগে সালফার নির্দেশিত হলে তখন তার ৩০ শক্তি প্রয়োগেও বৃদ্ধি দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে ১২ শক্তিতে প্রয়োগ করলে সাধারণতঃ বৃদ্ধি দেখা যায়না। এ সকল ক্ষেত্র ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শস্থল।

১.৪ অচির রোগের মধ্যে কিছু রোগ আছে যেগুলোর ক্রিয়ার গতি অত্যন্ত দ্রুত। এদের আক্রমণে রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কলেরা, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, ডিপথেরিয়া, স্কার্লেট ফিভার, এনসেফেলাইটিস ইত্যাদি পীড়ায় রোগশক্তির প্রবল দাপটে ওষুধশক্তির ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এজন্যে এ সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটি নিম্নশক্তিতে ঘন ঘন প্রয়োগ করে যেতে হয় যতক্ষণ না প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার অর্থ ওষুধশক্তি রোগশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করা শুরু করেছে। তখন প্রয়োগের সময় দীর্ঘ করতে হয়। হ্যানিম্যান এশিয়াটিক কলেরা মহামারীর সময় ক্যাম্ফার, কুপ্রামমেট ও ভেরেট্রাম এল্বাম ইত্যাদি ওষুধ লক্ষণ সাদৃশ্য অনুযায়ী নিম্নশক্তিতে (৬শক্তি) ঘন ঘন প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। রোগের তীব্রতা অনুযায়ী এসকল ক্ষেত্রে ৫/৭ মিনিট অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োজন বোধে ওষুধের মূল আরক (θ) ৪/৫ ফোঁটা মাত্রায় ৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে প্রতিক্রিয়া শুরু হলে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তিতে এবং দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এ বিষয়ে হ্যনিম্যানের নির্দেশের সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হল:

কলেরা যখন প্রথম দেখা দেয় তখন প্রথম পর্যায়ে সাধারণতঃ তার বলক্ষয়কারক আক্ষেপিক চরিত্র থাকে। রোগী হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়ে, সোজা হয়ে বসতে পারেনা, মুখের চেহারা বদলে যায়। চোখ বসে যায়। মুখ নীলাভ, মুখ,

হাত এবং দেহের অন্যান্য অংশ বরফ শীতল হয়। রোগী হতাশ ও উৎকণ্ঠিত হয়। দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়। বিহ্বল ও অর্ধ অচৈতন্যের মত হয়। গলার স্বর বসে যায়। এ অবস্থায় সে গোঙাতে থাকে এবং জিজ্ঞেস না করলে বিশেষ কোন অসুবিধার কথা বলে না। পেটে জ্বালা, পায়ের এবং অন্যান্য মাংস পেশীতে টান ধরে। গায়ে হাত দিলে চিৎকার করে ওঠে। তার পিপাসা থাকে না, পায়খানা, বমি বা অন্য কোন অসুস্থতা থাকে না।

এ অবস্থায় ক্যাম্ফার দ্রুত উপশম দেয়। এক ফোঁটা স্পিরিট ক্যাম্ফার (এক আউন্স ক্যাম্ফার ও বারো আউন্স অ্যালকোহল মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়) একটু চিনির সঙ্গে অথবা এক চামচ জলে মিশিয়ে অন্ততঃ প্রতি ৫ মিনিট অন্তর অন্তর প্রয়োগ করে যেতে হবে। হাতের তালুতে কিছু স্পিরিট অব ক্যাম্ফার নিয়ে রোগীর হাতে, পায়ে ও বুকে ঘষতে হবে। কিছু ক্যাম্ফার গরম লোহার পাত্রে রেখে রোগীর নাকের কাছে ধরা যেতে পারে। এতে আক্ষেপের জন্য তার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে সে যদি কিছু খেতে না পারে তাহলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে ক্যাম্ফার গ্রহণ করতে পারবে।

এতেই সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি চিকিৎসা শুরু করতে দেরী হয় তাহলে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। তখন ক্যাম্ফারে আর বিশেষ কোন কাজ হবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চাল ধোওয়া জলের মত সাদা, হলদে বা লালচে রঙের ঘন ঘন মলত্যাগ, সঙ্গে একই ধরনের প্রচন্ড বমি, অদম্য জল পিপাসা, পেটে গুড় গুড় আওয়াজ, হাইতোলা, গোঙানি, হাত পা বরফের মত ঠান্ডা, হাত পা মুখ নীল হওয়া, চোখ বসে স্থির হয়ে যাওয়া, ইন্দ্রিয় শক্তির লোপ পাওয়া, নাড়ী অত্যন্ত ধীর হওয়া, হাতে পায়ে টেনে ধরা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

এ অবস্থায় প্রতি ৫ মিনিট অন্তর আগের নিয়মে ক্যাম্ফার প্রয়োগ করে যেতে হবে। এতে ১৫ মিনিটের মধ্যে উপকার না পাওয়া গেলে তবে কিউপ্রাম নিম্নশক্তিতে প্রতিঘন্টায় বা প্রতি অর্ধঘন্টায় প্রয়োগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পায়খানা ও বমি বন্ধ হয়।

একই ধরনের উপকার পাওয়া যায় ভেরেট্রাম এল্বামের নিম্নশক্তি প্রয়োগে। কিন্তু কুপ্রামে সাধরণতঃ অধিকতর উপকার পাওয়া যায়।

ওষুধ প্রয়োগে বেশী দেরী হলে কিংবা অনুপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ হয়ে থাকলে সাধারণতঃ প্রলাপ সহ টাইফয়েড অবস্থা দেখা দেয়। এ অবস্থায় ব্রায়োনিয়া এবং রাসটক্স নিম্নশক্তি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করলে সুফল লাভ করা যায়।[৩২]

এ সকল ক্ষেত্রে যে সকল ওষুধ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো মধ্যশক্তিতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ প্রতিষেধক ওষুধটি ২০০ শক্তিতে সপ্তাহে একবার প্রয়োগকরা হয়। তবে বাড়িতে এ ধরনের রোগী থাকলে প্রথম দুদিন পরপর দুবার, পরে ২ দিন বা ৩ দিন অন্তর আরও দুবার ওষুধ গ্রহণ করা উচিত।[৩২]

চিররোগ

২.০ চির রোগের (chronic diseases) কারণ হলো কোন চির রোগ বিষ বা ক্রনিক মায়াজম। এই মায়াজম দেহ কোষ ও মন কোষকে বিক্ষত করে, দেহ তন্ত্রকে ভেতরে ভেতরে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষকে রোগপ্রবণ করে তোলে। কোন উদ্দীপক কারণে রোগের প্রকাশ ঘটে। রোগের প্রকাশের তীব্রতায় রোগী হতচকিত হয়ে পড়ে। কোন উপশমদায়ক ওষুধ প্রয়োগে রোগের প্রশমন ঘটে। কিছুকাল পরে আবার কোন উদ্দীপক কারণে রোগ সেভাবে বা অন্যরূপে প্রকাশিত হয়। এভাবে অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়। রোগের কারণের বিনাশ না ঘটালে এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের অন্য কোন পথ নেই। এ সকল ক্ষেত্রে মায়াজম দোষ প্রতিকার করতে সক্ষম এমন কোন এন্টিমায়াজমেটিক ওষুধ সাধারণতঃ উচ্চশক্তিতে ও ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। উচ্চশক্তির ওষুধের ক্রিয়া ও জীবদেহে তার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল ধীরে চলতে থাকে। এজন্য এক মাত্রা ওষুধ প্রয়োগ করে তার ক্রিয়াফলের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। এসকল ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি থেকে শুরু করা ভাল। কেননা তাহলে অনুসরণ করার জন্য কয়েকটি শক্তিক্রম পাওয়া যায়। কেন্টের পদ্ধতি হল, একটি শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগের পর তার ফলাফল

---

[৩২] R. E. Dudgcom. The Lesser Writings of Samuel Hahnemann. Page 753

দেখে ওষুধের ক্রিয়ার শেষে ধাপে ধাপে পরবর্তী শক্তিতে যেতে হয়। এভাবে যদি উচ্চতম শক্তিতে পৌঁছবার পর ও সে ওষুধের লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে ২০০ শক্তি থেকে আবার আগের মত শুরু করতে হয়। ৩৩

২.১ চির রোগবিষ অর্জিত (aquired) বা বংশগত (hereditary) হতে পারে। অর্জিত রোগে পীড়ার স্তর অনুযায়ী ওষুধের নিম্ন থেকে মধ্যশক্তি এবং পরে উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। অর্জিত সিফিলিস রোগে মার্কারি নির্দেশিত হলে ৩০ শক্তির ওষুধ বেশ কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করার পর উচ্চশক্তিতে যেতে হয়। অতএব চির রোগ হলেই সর্বদা উচ্চশক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে একথা ঠিক নয়।

২.২ চির রোগ যদি বংশগত হয় তবে নির্বাচিত ওষুধটি অবশ্যই উচ্চ থেকে উচ্চতম শক্তিতে ক্রমশঃ প্রয়োগ করতে হয়। কোন শিশু যদি সর্দিকাশির ধাত, বাত, হাঁপানি ইত্যাদি বংশগত রোগের ধারা বহন করে তবে তাকে অবশ্যই ওষুধটি উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিফিলিস মায়াজমের দরুণ কানপাকা রোগে নির্বাচিত ওষুধটির উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়। এ দোষের দরুণ যদি মানসিক রোগ দেখা দেয় তবে উচ্চ থেকে উচ্চতম শক্তির প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা

২.৩ চির রোগের চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরে চলে। এ সময়ে অনেক রকম রোগের ঘটনা ঘটতে পারে। এগুলোকে অচির পীড়া বলে গণ্য করতে হবে এবং সেভাবেই চিকিৎসা করতে হবে। তখন চির রোগের লক্ষণের সঙ্গে বর্তমান লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ নির্বাচণ করতে নেই। মনে রাখতে হবে চির রোগ চির রোগই, অচির রোগ অচিরই। দুটিকে কখনই মিশিয়ে ফেলতে নেই। হাঁপানি রোগের চিকিৎসার সময় জ্বর, আমাশয়, উদরাময় ইত্যাদি রোগের আক্রমণ হতে পারে। তখন এ সকল রোগের লক্ষণের উপর ভিত্তিকরেই ওষুধ নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত ওষুধটি নিম্নশক্তিতে, প্রয়োজন হলে মধ্যশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

---

৩৩. Elizabeth Wright - A Brief Study Course in Homoeopathy. Jain Publishers. 1983. Page 45.

২.৪ চিররোগের প্রবল উচ্ছ্বাসের সময় কখনও গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ প্রয়োগ করতে নেই। তখন কোন লঘুক্রিয় ওষুধ নিম্নশক্তিতে ঘন ঘন প্রয়োগ করে সে অবস্থা প্রশমিত করতে হয়। এজন্য হাঁপানি রোগের প্রবল আক্ষেপের সময় প্যাসিফ্লোরা, ব্লাটা ওরিয়েন্টা, অ্যাসপিডস পারমা ইত্যাদি ওষুধের মূল আরক ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। মৃগী রোগের আক্ষেপের সময় এমিল নাইট্রোসাম জাতীয় ওষুধের মূল আরকের ঘ্রাণ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এ অবস্থা প্রশমিত হলে পরে ধাতুগত ওষুধ উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

২.৫ একদৈশিক রোগ (one sided disease) [৩৪] — একদৈশিক রোগ সর্বদাই চিররোগের অন্তর্গত। একদৈশিক রোগ দৈহিক বা মানসিক হতে পারে। দৈহিক একদৈশিক রোগ কেবলমাত্র দেহস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। রোগী অন্যথায় সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে। যেমন আধকপালে মাথা ব্যথা, শ্বেতপ্রদর স্রাব, টিউমার ইত্যাদি। এগুলোকে স্থানীয় পীড়া বলে মনে না করে চিররোগের দেহস্তরে কেন্দ্রীভূত রোগ মনে করতে হবে। এসকলক্ষেত্রে রোগী যখন আপাত সুস্থ বোধ করে তখন নির্বাচিত ওষুধের উচ্চশক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এসকল ক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধে চিকিৎসা করা শ্রেয়।

আবার কিছু একদৈশিক রোগ আছে যেগুলো প্রধানতঃ মনস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে এবং মনোরাজ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যাবতীয় মানসিক রোগ এ শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। এসকলক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ওষুধপ্রয়োগ বৃথা, কেননা ওষুধ সে স্তরে পৌছতেই পারবেনা। এসকলক্ষেত্রে উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা

১. মানসিক রোগের তরুণ প্রকাশ অধিকাংশক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সোরার অগ্নিশিখার মত আকস্মিক উচ্ছ্বাস। এ অবস্থায় কখনও এন্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করতে নেই। প্রথমে অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, স্ট্রামোনিয়াম, হায়োসায়ামাস, মার্কারি প্রভৃতি ওষুধের উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রমাত্রা প্রয়োগ করা উচিত। রোগীর সে অবস্থা প্রশমিত হওয়ার পর কোন এন্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। অনুচ্ছেদ - ২২১

---

৩৪. অনুচ্ছেদ - ১৭৩

২. রোগের বর্ধিতঅবস্থায় দীর্ঘক্রিয় ওষুধ উচ্চশক্তিতে কখনও প্রয়োগ করতে নেই। তাতে অন্তর্নিহিত মায়াজমের বিকশিত অবস্থাকেজটিল করে তুলবে।

২.৬ চিররোগের শেষদিকে যখন যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি (organic degeneration) হয় তখন কখন ও গভীরক্রিয় ওষুধ উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে নেই, কেননা এতে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তা জীবনীশক্তি সহ্য করতে পারবে না।

২.৭ চাপাপড়া রোগ (supressed diseases) — চাপা দেওয়া রোগের চিকিৎসায় নির্বাচিত ওষুধটি উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। কেননা নিম্নশক্তির ওষুধ অবরুদ্ধ রোগকে মুক্ত করতে পারবে না। এজন্য গণোরিয়া রোগ চাপা দেওয়ার জন্য যদি বাত হয় এবং মেডোরিনাম ওষুধটি নির্দেশিত হয় তবে ওষুধটি অবশ্যই উচ্চশক্তিতে (১ হাজার শক্তিতে) প্রয়োগ করতে হয়। ওষুধ প্রয়োগে যদি চাপা পড়া রোগটির পুনঃ প্রকাশ ঘটে তবে তা সুলক্ষণ। এ কথা রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে। রোগের পুনঃ প্রকাশ দেখে ভয় পেয়ে প্রতিকারার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিপদ হতে পারে।

২.৮ চিররোগের যে সকল ক্ষেত্রে পরিণতি অনিবার্যভাবে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, যেমন ক্যানসার রোগ, সেক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধ নিম্নশক্তিতে দিনের পর দিন প্রয়োগ করতে হয়। কেননা রোগের প্রবল পরাক্রমে জীবনীশক্তি মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ত সাহায্যের প্রয়োজন - বার্নেট। এ অবস্থা ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের আদর্শস্থল। কেননা রোগীর নিয়ত সাহায্যের প্রয়োজন কিন্তু সামান্য বৃদ্ধিও সহ্য করার মত অবস্থা তার নেই।

সতর্কতা

১. রোগের গতি যেখানে বাইরে থেকে ভেতরদিকে, পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে, নিম্নথেকে উর্ধ্বদিকে, অপ্রধান অঙ্গ থেকে প্রধান অঙ্গে সঞ্চারিত হয় তখন বুঝতে হবে অবস্থা মারাত্মক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিকারমূলক ওষুধটি নিম্নশক্তিতে ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্টের পরামর্শ স্মরণীয়। সকল চিররোগের

প্রথম প্রকাশ দেহের উপরিভাগে। পরে ক্রমে ক্রমে তা মানুষের অন্তর্ভাগে প্রসারিত হয়। কারোর যদি হার্টের বাত হয় এবং ওষুধ প্রয়োগে সেই বাতরোগ হার্ট ছেড়ে হাঁটুতে সঞ্চারিত হয় তা হলে বুঝতে হবে সে আরোগ্যের পথে। সে হয়ত বলবে ডাক্তারবাবু, ওষুধ খাওয়ার আগে আমি হাঁটাচলা করতে পারতাম, কিন্তু হাঁটু এমন ফুলে গেছে যে আমি একদম হাঁটতে পারছি না। তখন বুঝতে হবে সে আরোগ্যের পথে। তিনি যদি তা বুঝতে না পেরে হাঁটুর ব্যথার ওষুধ ব্যবস্থা করেন তবে বাত আবার হার্টকে আক্রমণ করবে এবং সে মারা যাবে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ওষুধ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে বাইরে প্রকাশিত রোগ অর্ন্তমুখী হয়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে।[৫৫]

২. যেখানে চাপাপড়া রোগের পুনঃ প্রকাশ অভিপ্রেত নয় কিংবা তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে সেখানে ওষুধটি নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। এসকলক্ষেত্রে কোন গভীরক্রিয়াশীল ওষুধ প্রয়োগ করতে নেই। কারোর যদি ফুসফুসে যক্ষ্মারোগ হয় কিংবা চর্মে কুষ্ঠ রোগ হয় এবং অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে তা সারে এবং পরবর্তীকালে তার টনসিল প্রদাহ, বাত বা অন্যকোন রোগ দেখা দেয় তাহলে এমন ওষুধ প্রয়োগ করতে নেই যাতে যক্ষ্মারোগ বা কুষ্ঠরোগের পুনঃ প্রকাশ ঘটে। এজন্য এসকলক্ষেত্রে হিপার সালফার, ফসফোরাস, সিলিসিয়া, সালফার ইত্যাদি গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের উচ্চশক্তি চাপাপড়া রোগকে টেনে বের করে আনবে। এতে রোগী দৈহিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এসকলক্ষেত্রে সর্বদাই লঘুক্রিয় ওষুধ প্রয়োগ করে উপশম প্রদান করতে হবে। আরেকটি কথা ও এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার বিশাল ভেষজভাণ্ডারে পলিক্রেস্ট ওষুধ ব্যতীত আর ও বহু ওষুধ আছে যেগুলো এরূপ অবস্থা প্রতিকার করতে খুবই কার্যকরী।

[ক্রমশ:]

---

৫৫. Kent. Lectures on Homoeopathic Philosophy. B. Jain Publishers. Page 23-24.

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ ওষুধের প্রকৃতি

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণে আরও কতগুলো বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলো নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করছি।

১.১ রোগের প্রকাশস্থল (Location) — রোগ দেহের কোন না কোন স্থানে প্রকাশ হবেই। এজন্য ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নিরূপণে রোগের প্রকাশ স্থল বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। রোগটি দেহের বহিরঙ্গে কিংবা কোন অপ্রধান অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে না কোন অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আক্রমণ করেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চর্ম, বৃহদন্ত্র, মূত্রযন্ত্র, প্রষ্টেট, চুল, নখ প্রভৃতি স্থানে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীভূত রোগে ওষুধের নিম্নশক্তি ও অধিকমাত্রার প্রয়োজন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, স্নায়ু প্রভৃতি অনুভূতিশীল অঙ্গে প্রকাশিত রোগে মধ্য থেকে উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়। হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্কের মেনিন্‌জেসের পীড়ায় নিম্নশক্তির প্রয়োজন হয়। এজন্য চর্মের খোস চুলকানি রোগে, পাকস্থলীর গোলযোগে, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি রোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রতায়, যকৃতের পীড়ায়, প্রষ্টেটের পীড়ায় নিম্ন থেকে মধ্যশক্তি, দাঁত, স্নায়ুর পীড়া, মেরুদন্ডের পীড়ায় মধ্য থেকে উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়।

৩.২ রোগ যখন দেহস্তরে অবস্থান করে এবং সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে তখন নিম্ন থেকে মধ্যশক্তি, যখন সার্বদৈহিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তখন মধ্য থেকে উচ্চশক্তি আর যখন মনস্তরে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন হয়। মনস্তরের যাবতীয় রোগে সাধারণতঃ উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়।

কেননা নিম্নশক্তি সেখানে পৌঁছতেই পারবে না। প্রেমে ব্যর্থতার জন্য কোন

তরুণীর যদি বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, অক্ষুধা অনিদ্রা ও হতাশা দেখা দেয় তবে সেখানে ইগ্নেশিয়া ৬ বা ৩০ শক্তি দেওয়া বৃথা। এসকল ক্ষেত্রে ইগ্নেসিয়ার ১ হাজার শক্তির একমাত্রাই মনোরাজ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়ন করবে।

৩.৩ অনুভূতি(sensation) — রোগের অনুভূতি, যেমন ব্যথা জ্বালা ইত্যাদি তীব্র সেখানে প্রতিক্রিয়া তীব্র। এখানে আশু সাহায্যের প্রয়োজন। এখানে নিম্নশক্তি, পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তিতে যেতে হয়। অনুভূতি যেখানে কম সেখানে প্রতিক্রিয়া শক্তিদুর্বল। কাজেই প্রতিক্রিয়া আনার জন্য ওষুধ নিম্নশক্তিতে ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য কলিক ব্যথায় রোগী যখন ছটফট করে, ব্যথার চোটে শরীর দু-ভাঁজ হয়ে যায় তখন কলোসিন্থ ৩০ শক্তির এক মাত্রাই মন্ত্রের মত কাজ করে। কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অসহ্য ব্যথায় যখন পাগলের মত ছটফট করতে থাকে তখন সিমিসিফিউগা, ক্যামোমিলা, বেলেডানা, ম্যাগফস ইত্যাদি নির্দেশিত ওষুধগুলো নিম্নশক্তিতে (৬,৩০) ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। অন্তবর্তী সময় ঐ ওষুধই ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করলে পরবর্তী আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পায়।

আবার বৃহদন্ত্রের নিস্ক্রিয়তার দরুণ কয়েকদিন মলত্যাগ না হওয়া যদি কোন রোগীতে নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে বিশেষ অসুবিধা বোধ না করে তবে এলুমিনা, ওপিয়াম, প্লাম্বাম ইত্যাদি সূচিত হলে সর্বদাই নিম্নশক্তি (৬,৩০) দিয়ে শুরু করতে হয়। একই কারণে মূত্র যন্ত্রের নিস্ক্রিয়তার দরুণ মূত্রকৃচ্ছ্রতা দেখা দিলে বার্বেরিস ভলগারিস, প্যারাইরা ভার্বা ইত্যাদি ওষুধ নিম্নশক্তিতে (θ) প্রয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে লিভারের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য দরুণ জন্ডিস, যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি দেখা গেলে চেলিডোনিয়াম, কার্ডুয়াস ইত্যাদি ওষুধের মূল আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ২/৩ বার করে বেশ কয়েক দিন ব্যবস্থা করতে হয়।

৪. রোগের স্তর ও ক্রিয়াধারা (stage of disease and nature of changes effected) — রোগ কোন স্তরে এবং কেমনভাবে ক্রিয়া করছে তার উপরেও শক্তি ও মাত্রা নির্ভর করে। সাধারণতঃ রোগের সূচনা বা প্রারম্ভিক অবস্থায় নিম্নশক্তি এবং পরবর্তী অবস্থায় প্রয়োজনবোধে মধ্য থেকে উচ্চশক্তির প্রয়োজন

হয়। ব্রঙ্কাইটিস, টনসিলাইটিস, সিষ্টাইটিস প্রভৃতি পীড়ায় প্রথমে নিম্নশক্তি (৩০), পরে মধ্য থেকে উচ্চশক্তি। সিফিলিস রোগীর প্রাথমিক পর্যায়ে যখন স্যাঙ্কার (chancre) বর্তমান থাকে এবং অচিকিৎসিত থাকায় কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়নি, তখন নার্ভাস ও রক্তপ্রধান ধাতুর রোগীর মার্কারি সূচিত হলে মধ্য ও উচ্চশক্তি এবং শ্লেষ্মা প্রধান ও শ্লথ প্রকৃতি রোগীকে নিম্নশক্তি (৩) আরোগ্য করবে। কিন্তু সে পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে নিম্নশক্তিতে আর কোন কাজ করবে না। রোগী যদি প্রচুর মার্কারি ও পটাশজাত ওষুধ সেবন করে থাকে তবে প্রথমে তার প্রতিকার (antidote) করতে হবে। পরে নির্বাচিত ওষুধটি উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

একথা শুধু সিফিলিস ও মার্কারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সকল রোগের বেলায়ও প্রযোজ্য। মার্কারি সিফিলিসের একমাত্র ওষুধ নয়। সকল ক্ষেত্রেই রোগী ও ওষুধকে স্বাতন্ত্রীকরণ (individualisation) করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যদি আমরা আরোগ্য বিধান করতে চাই।[৩৬]

৪.১ রোগের গতি, তীব্রতা ও অভিমুখ — কলেরা, ডিপথেরিয়া, মাম্পস, টিটেনাস প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের রোগ দ্রুতগতিতে খারাপ অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। তখন প্রাথমিক অবস্থায় জীবনীশক্তি রোগের দাপটে পর্যুদস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন নির্বাচিত ওষুধটি নিম্নশক্তিতে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করলে প্রতিক্রিয়াশক্তি জাগ্রত হয়। সে ওষুধটির আরও প্রয়োজন থাকলে ক্রমশ উচ্চতর শক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। রোগ যেখানে ধীরগতিতে অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে নিদানগত অবস্থার সৃষ্টি করে সেখানে ওষুধের নিম্ন ও মধ্যশক্তি এবং ক্ষুদ্রমাত্রা প্রয়োগ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এজন্য নিউমোনিয়া রোগে ফসফোরাস নির্দেশিত হলে ফসফোরাসের ৩০ শক্তি দিনে ২ বার করে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিক্রিয়ার ধরন দেখে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ খুবই উপযোগী।

---

৩৬. Stuart Close. Ibid- Page 200

৪.২ রোগ যখন অন্তিম অবস্থায় পৌছয় তখন প্রতিক্রিয়া শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন কেবল সাধারণ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। তখন ওষুধ সর্বদাই নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

৪.৩ বিশৃঙ্খলার ধরন (nature of changes) — রোগ যখন ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তখন প্রবণতা অনুযায়ী নিম্নশক্তি থেকে উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হয়। পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া, যৌনাঙ্গের ক্রিয়া, রক্ত সংবহনতন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতিতে যখন ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য সৃষ্টি হয় তখন সাধারণতঃ ৩০ বা ২০০ শক্তি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। আর যখন যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি হয় (structural changes) তখন নিম্নশক্তির প্রয়োজন হয়। হার্টের ভাল্বের ক্ষতি হলে, ফুসফুসে গহ্বর সৃষ্টি হলে কিংবা লিভারে ক্ষয় (fatty degeneration) হলে ওষুধ সর্বদাই নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। রোগের নিদানগত অবস্থায় (pathological conditions), যেমন অন্ত্রে আলসার, লিভারে স্ফোটক, মুত্র থলিতে পাথর ইত্যাদিতে ওষুধ নিম্নশক্তিতে অধিকমাত্রায় বেশ কিছুকাল প্রয়োগ করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় মূল আরকেরও প্রয়োজন হয়।

এক ভদ্রমহিলা কিছুকাল যাবত মূত্র কৃচ্ছ্রতায় ভুগছিলেন, কিন্তু গত ৩ দিন যাবত কষ্ট অত্যন্ত বেড়ে যায়। প্রতিমুহূর্তে অসহ্য মুত্রত্যাগের বেগ, তলপেটে কাটা ছেঁড়ার মত যন্ত্রনা, কিন্তু প্রস্রাব বিশেষ হয় না। কখনও ফোঁটা ফোঁটা হয়। কখনও দু এক ফোঁটা রক্ত পড়ে। প্রস্রাবের আগের সময় ও পরে অসহ্য জ্বালাকর ব্যথায় পাগলের মত ছটফট করে। কখনও রাগে চিৎকার করে। কখনও কাঁদে। মলত্যাগের সময়ও প্রচন্ড জ্বালা ও কোঁথানি। মলত্যাগের পর সারা শরীর কেঁপে ওঠে।

তাকে ক্যান্থারিস ৬ এক ফোঁটা মাত্রায় প্রতিঘন্টায় ৪ মাত্রা দেওয়ায় তার জ্বালাযন্ত্রনা অনেকটা লাঘব হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে। পরে রোজ ৩ বার করে ২ দিন ওষুধ দেওয়ায় কয়েকটা ছোট পাথর বের হয়ে যায় এবং তার জ্বালা যন্ত্রনা কমে যায়, প্রস্রাবও স্বাভাবিক হয়।

৪.৩ নিদানগত অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে প্রবণতা যেরূপ থাকে রোগের অগ্রগতির সঙ্গে প্রবণতা তার থেকে কমতে থাকে। ওষুধের ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাও তদনুযায়ী কমতে থাকে। শেষে অন্তিম অবস্থায় (terminal condition) যখন পৌঁছয় তখনএ ক্ষমতার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তখন ওষুধের নিম্নতম শক্তিই (মূল আরক) কেবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সহায় হয়। হৃৎপিন্ডের পীড়ায় যখন হৃৎকপাটিকার ক্ষয়ক্ষতি হয় (valvular diseases) তখন প্রায়ই ডিজিটেলিস কোন শক্তিতেই কাজ করে না। কিন্তু তার মূল আরকের কয়েক ফোঁটা তাকে দ্রুত আরাম দেয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এই শক্তি ও মাত্রা শারীরবৃত্তীয় (physiological or pathogenetic) স্তরে কাজ করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ধরন অনুধাবন করলে এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে এর ক্রিয়া ডাইনামিক এবং আরোগ্যদায়ক। আরোগ্যদায়ক প্রতিক্রিয়া তাকেই বলা হয় যার প্রকৃতি রোগ লক্ষণের তিরোধানের গতি ও অভিমুখের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বৃহৎমাত্রা, ক্ষুদ্রমাত্রা, ডাইনামিক ক্রিয়া

অন্যভাবে বলা যায়, কেবলমাত্র পরিমাণ (quantity) দ্বারা pathogenetic মাত্রা বুঝায়না। ওষুধের গুণগত অবস্থাওপরিমাণের (quantity) আনুপাতিক সম্পর্ক (proportionality) এবং রোগীর প্রবণতার উপর ওষুধের কার্যকরী ক্ষমতা নির্ভর করে। অত্যন্ত অনুভূতিশীল ব্যক্তির পক্ষে যে শক্তি ও মাত্রা বৃহৎ, ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক হতে পারে সেই শক্তিও মাত্রাই অন্যকোন রোগীতে, দীর্ঘকাল রোগে ভোগার দরুণ যার ব্যাপক যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে এবং নানা প্রকার চিকিৎসার ফলে যা জটিল আকার ধারন করেছে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। সকল ক্ষেত্রে আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয় হলো নির্বাচিত ওষুধটি প্রদত্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে রোগীতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে কি? অর্থাৎ নির্বাচিত ওষুধটি রোগাবস্থার সঙ্গে সার্বিক সদৃশ্যযুক্ত হয়েছে কি? অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয় হল রোগের প্রকৃতি, গতি ও স্তর অনুযায়ী ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত

ক্রিয়াক্ষমতার পরিমাপ করা। যদি রোগের স্তর (grade) নিম্নমানের হয় তবে প্রবণতাও নিম্নমানের হয়। লক্ষণও সাধারণ প্রকৃতির হয়। এ ক্ষেত্রে ওষুধও নিম্নক্রমে দিতে হয়। এজন্য যে সকল রোগে সাধারণ লক্ষণ (common symptoms), নিদানগত লক্ষণ (pathological symptoms), স্থূল ওষুধের অধিকমাত্রায় প্রয়োগজনিত লক্ষণ (pathogenetic symptoms), অঙ্গ ভিত্তিক লক্ষণ (organ symptoms), অন্তিম অবস্থার লক্ষণ (symptoms of terminal condition) প্রভৃতি বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রে ওষুধের নিম্নশক্তি ও অধিকমাত্রার প্রয়োজন হয়। রোগীর প্রবণতার যে স্তরে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট ধরনের লক্ষণ দেখা যায় এ সকল ক্ষেত্রে সে স্তর পার হয়ে গেছে। এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে মধ্য বা উচ্চশক্তি বিশেষ কাজ করবে না। উপরন্তু ক্ষতি করতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে রোগ যতক্ষণ থাকবে তার লক্ষণও থাকবে, এবং তার ওষুধও থাকবে। আমাদের কেবল বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণবায়ুটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির আওতায় থাকবে। যখন কোন লক্ষণই আর অবশিষ্ট থাকে না তখন বুঝতে হবে অন্তিমলগ্ন সমুপস্থিত। তখন আর ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিদানগত লক্ষণ বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রেও এ লক্ষণও সূক্ষ্মলক্ষণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচায়ক হতে পারে যদি মেটেরিয়া মেডিকায় তদ্রূপ লক্ষণ থাকে। কেননা আমরা তখনই কেবল ওষুধ নির্বাচন করতে পারি যখন রোগীতে প্রকাশমান লক্ষণের সদৃশ লক্ষণ মেটেরিয়া মেডিকায় থাকে। কাজেই স্থূলনিদানগত লক্ষণ থাকলেই হোমিওপ্যাথির আওতার বাইরে চলে গেল এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। আশাহীন অন্তিমক্ষেত্রে ওষুধের মূল আরক প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে হয় যতক্ষণ না প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ সকল ক্ষেত্রে স্থূল মাত্রাই সূক্ষ্ম মাত্রা। একটি মোটরগাড়ি সমতলে চালাতে যে শক্তি লাগে পাহাড়ে উঠতে গেলে তার বেশী শক্তি লাগে। যদি পাহাড়টি খুব বেশী খাড়া হয় তাহলে চালককে গাড়িটি কিছুটা পেছনের দিকে চালিয়ে এনে সেই

চলন্ত অবস্থার বর্ধিতশক্তিতে আবার সামনের দিকে উঠতে হয়। আবার পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে নামার সময় গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে গাড়িটিকে আপন গতিতে নামতে দিতে হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আমাদের রোগের অবস্থা অনুযায়ী কখনও উচ্চ, কখনও মধ্য, কখনও নিম্নশক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আবার কখনও রোগীকে ওষুধ ছাড়াও রাখতে হয়। এ অবস্থায় ওষুধ বিহীন ওষুধই অর্থাৎ প্লাসিবোই আমাদের ওষুধ।[৩৭]

৫.০ বিরামশীল রোগ — বিরামশীল ব্যাধির প্রকৃতি হল এই ব্যাধি কিছুকাল পরপর ঘুরে ঘুরে আসে। অন্তবর্তী সময়ে রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে। বিরামশীল ব্যাধি জ্বরবিহীন বা জ্বরযুক্ত হতে পারে। হাঁপানি, মৃগী, আধকপালে মাথাব্যথা ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। নানাপ্রকার সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর সকলই চিররোগের অন্তর্গত। এদের পেছনে সোরাদোষ সক্রিয় থাকে। কখনও এর সঙ্গে সিফিলিস দোষের সংমিশ্রণ থাকে। এতে সাধারণতঃ সোরার লক্ষণেরই প্রাধান্য থাকে এবং সোরা দোষঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। পরে আবার সোরা দোষঘ্ন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শেষ করতে হয়। রোগের বিরামকালে ওষুধ মধ্য থেকে উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। রোগের পুনরাক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত চায়নাব উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। (অনুচ্ছেদ ২৩১-২৩৪)

সবিরাম জ্বর বিচ্ছিন্নভাবে বা মহামারীরূপে আক্রমণ করতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে আক্রমণ শেষ হওয়া মাত্র কিংবা তার অব্যবহিত পরে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এ সকল পীড়া প্রথমে সোরাজনিত সাধরণ অ্যাকুট পীড়া বলে মনে করে তদণুযায়ী সোরা দোষঘ্ন নয় এমন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। যদি তাতে আরোগ্যবিলম্বিত হয় তবে বুঝতে হবে সোরা সক্রিয় রয়েছে। তখন সোরা দোষঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সালফার বা হিপার-সালফার উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রমাত্রায় এবং পুনঃপ্রয়োগ বেশী না করে তাকে দমন করতে হয়। (অনুচ্ছেদ ২৩৪-২৪৪)

৩৭. Stuart Close. Ibid. Page - 196

বিবিধ

১. অ্যাকুট পীড়ায় সাধারণতঃ অ্যাকুট ওষুধের প্রয়োজন। অ্যাকুট পীড়ায় যদি কোন গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ নির্দেশ করে এবং তা উচ্চশক্তিতে প্রযুক্ত হয় তবে বিপদ হতে পারে। কেন না অ্যাকুট রোগের প্রবল প্রকাশের সঙ্গে সুপ্ত চিররোগের এই অকাল বিকাশের মিলনের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার প্রকোপে জীবনীশক্তি পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ক্রনিক ওষুধ নির্দেশিত হলেও তা ২০০ শক্তির উর্ধ্বে প্রয়োগ না করাই যুক্তিসঙ্গত।

২. অনারোগ্য রোগের (incurable disecase) আরোগ্য বিধান করার চেষ্টা বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা সে স্তর পার হয়ে গেছে। জীবনীশক্তি এখন আর গভীর ক্রিয়াশীল ধাতুগত ওষুধের ক্রিয়াজনিত প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারবে না। এ সকল ক্ষেত্রে সদৃশনীতি অনুযায়ী কোন লঘুক্রিয় ওষুধ নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করে উপশম দিতে হয়। এজন্য যক্ষা, ক্যানসার এবং বলহানিকর রোগে সর্বাপেক্ষা যন্ত্রনাদায়ক লক্ষণ রাজির সদৃশতম ওষুধই সর্বাপেক্ষা উপশম প্রদান করবে। জীবনের আশা থাকা পর্যন্ত এ পথ কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়।[১৮]

৩. একই ধরনের অচিররোগ যদি কোন রোগীতে বার বার দেখা যায় তবে বুঝতে হবে এর পেছনে কোন ক্রনিক মায়াজম ক্রিয়াশীল রয়েছে। তখন তার প্রতিকারার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সাধারণতঃ এ সকল ক্ষেত্রে প্রদত্ত ওষুধটির ক্রনিক পরিপূরক ওষুধটির প্রয়োজন হয় এবং তার উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরনের অচিররোগ চিররোগেরই প্রকাশ বলে ধরে নিতে হবে এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

একটি শিশু প্রায়ই জ্বর, সর্দি, টনসিল প্রদাহে ভোগে। যখনই জ্বর হয়, চোখমুখ লাল টকটকে হয়, গাত্রোত্তাপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে, শিশু প্রলাপ বকে, মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, থুথু দেয়, কামড়াতে চায়। বেলেডোনা ওষুধটি প্রয়োগে রোগ কিছুকালের মধ্যে সেরে যায়। আবার হয়। এমনিভাবে চলে। রোগীর পূর্ণবিবরণী লিপিবদ্ধ করলে খুব সম্ভবত দেখা যাবে এ রোগী ক্যালকেরিয়া কার্বের রোগী। তখন ক্যালকেরিয়া কার্ব ২০০ বা ১ হাজার শক্তিতে প্রয়োগ না করলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের আর কোন পথ নেই।

---

১৮ In Consumption and cancer and wasting sickness the remedy that is most similar to the painful groups of symptoms will ever give the most relief, and it is a forlorn hope that tempts its abandonment. Kent. Ibid. page - 276

৪. এলার্জী জাতীয় পীড়ায় সর্বদাই ওষুধের নিম্নশক্তি (θ,৩,৬) ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। আর্টিকা ইউরেন্স, এপিস, বোভিষ্টা, কোপাইভা, হাইড্রাসটিস, রাসটক্স ইত্যাদি ওষুধগুলোর এ সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রয়োজন হয়। দু আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে সেই ওষুধের উচ্চশক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

৭. বংশগত কঠিন রোগের উত্তরাধিকার বহন করার দরুণ যে সকল রোগীর জীবনীশক্তি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং রোগী নিয়ত রোগে ভুগছে সে সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করতে হয়। লক্ষ্য হবে অতি ধীরে ধীরে বংশগত মায়াজম থেকে রোগীকে মুক্ত করা। রোগী যত মায়াজমের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে থাকবে তত তার প্রতিরোধ শক্তি বাড়বে। তা না করে শুধু অ্যাকুট অবস্থার উপশমের চেষ্টা করলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে রোগীকে কিছুকাল কষ্টভোগ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

এ বিষয়ে এফ. ই. গ্ল্যাডউইনের (F. E Gladwin) অভিজ্ঞতা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমরা ওর মুখ থেকেই শুনি: ছোট মেয়েটির প্রতিরোধ শক্তির আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সে বংশগত যক্ষ্মা ও ক্যানসার রোগের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সহজেই তার গন্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠত। চোখের ভ্রূর রোমগুলো ছিল দীর্ঘ ও রেশমের মত। আর বিশেষ কিছু লক্ষণ ছিল না। তাকে টিউবার কুলিনাম দিলাম। কিছুকাল পর সে নিউমোনিয়া রোগে দারুণভাবে পীড়িত হয়ে পড়ল। তাকে এই অ্যাকুট অবস্থার জন্য ওষুধ দেওয়া হল। সে শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠল। কিছুকাল পরে তাকে আবার টিউবারকুলিনাম দেওয়া হল। আবার তার নিউমোনিয়া হল। নিউমোনিয়ার ওষুধ আবার দেওয়া হল। সে অচিরেই ভাল হয়ে উঠল। টিউবারকুলিনাম আর দেওয়া নিরাপদ বলে মনে হল না। সেই ছোট মেয়েটি এখন আঠারো বছরের এক স্বাস্থ্যবতী তরুণী। তার এক ছোট ভাই ছিল। সেও অত্যন্ত রোগা ছিল। তার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল। তারও ভ্রূর রোম লম্বা ও রেশমী ছিল। তার দিদির চিকিৎসার অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে তাকে আমি আর টিউবার কুলিনাম দিতে সাহস করিনি। আঠারো বছরে পা দিতে না দিতেই সে যক্ষ্মায় মারা গেল। [৩১]

---

৩১. Indian Journal of classical Homoeopathy Calcutta. Dec, March (2000-01) vol III Page - 57.

৫. রোগীর ধাতুপ্রকৃতি না জেনে ওষুধ প্রয়োগ করলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এটা বিপজ্জনক হতে পারে।[৪০]

৬. সন্দেহজনক ক্ষেত্রে সর্বদাই ওষুধের ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করে তার ফলাফল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

১. শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ে রোগের কি কি দিক বিবেচনা করতে হয়?

রোগের প্রকৃতি, শক্তি, গতি ও তীব্রতা, দেহে আক্রান্ত অংশের অবস্থান ও গুরুত্ব, রোগের স্তর এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি।

২. অচির রোগে সাধারণতঃ শক্তি ও মাত্রা কিরূপ হয়?

ওষুধের নিম্ন ও মধ্যশক্তি এবং অধিকমাত্রা।

৩. কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের রোগে কিরূপ শক্তিও মাত্রার প্রয়োজন হয়?

নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা।

৪. এলার্জী জাতীয় পীড়ায় শক্তি ও মাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত?

নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা।

৫. চিররোগে কিরূপ শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন হয়?

গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রতম মাত্রা।

৬. চিররোগের চিকিৎসাকালীন কোন অচিরপীড়া দেখা দিলে কিভাবে চিকিৎসা করতে হয়?

অচিররোগের চিকিৎসার মত।

৭. মানসিক রোগের তরুণ প্রকাশের সময় কোন গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের উচ্চশক্তির প্রয়োগ করতে নেই কেন?

তাতে মায়াজমের পূর্ণ বিকাশ হবে, রোগীর অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।

---

[৪০] Don't administer a medicine without knowing the constitution of the patient, because it is hazardous and dangerous to do it - Kent. Ibid. Page - 273.

৮. চাপাপড়া রোগে সাধারণতঃ ওষুধের কিরূপ শক্তির প্রয়োজন হয়?

উচ্চশক্তি

৯. রোগের নিদানগত অবস্থায় কিরূপ শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন হয়?

নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা।

১০. অনারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে কিরূপ শক্তি ও মাত্রার প্রয়োজন?

নিম্নশক্তি, কমমাত্রা।

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ ওষুধের প্রকৃতি

রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওষুধই আমাদের প্রধান হাতিয়ার। সকল হাতিয়ারের ক্রিয়াক্ষমতা একরূপ নয়। কারোর ক্ষমতা অগভীর, কারোর গভীর। কারোর সীমিত, কারোর ব্যাপক। কারোর দেহের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, কারোর আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী। একই ওষুধ আবার বিভিন্ন শক্তি ও মাত্রায় বিভিন্নরূপ কার্য করে। এজন্য এই হাতিয়ারগুলো কখন কোনটি কিভাবে কাজে লাগালে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হবে শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের প্রধান বিবেচ্য বিষয় এটিই। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করি একটি মেয়ের নিউমোনিয়া হয়েছে। নিউমোনিয়া একটি অচির প্রকৃতির পীড়া। এর গতি ধীর কিন্তু দৃঢ়। এর নিদানগত পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা রয়েছে। এই নিদানগত অবস্থার আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে। অতএব আমাদের এমন ওষুধ নির্বাচন করতে হবে যার ক্রিয়াধারা ও ক্রিয়াক্ষমতা রোগের অনুরূপ হবে। যদি এরূপ একটি ক্ষেত্রে ক্যালিকার্ব ওষুধটি সূচিত হয় তবে আমরা সে ওষুধটি কতশক্তি এবং কিরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করব? এটি একটি অত্যন্ত গভীরক্রিয়াশীল ওষুধ। কাজেই রোগ এবং ওষুধের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম থেকেই অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। আমরা প্রথমেই ওষুধটি উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করব না যাতে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আবার এত নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করব না যা রোগশক্তির উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারবে না।

অতএব এ ক্ষেত্রে খুব নিম্ন নয় খুব উচ্চ নয় এমনশক্তি, যেমন ৩০ শক্তি, দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারি। এবার একমাত্রা ওষুধেই এধরনের রোগ নির্মূল হয়ে যাবে তাও আমরা আশা করতে পারি না। অতএব আমাদের প্রত্যহ ২ মাত্রা করে

কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করে তার ফলাফল যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতএব প্রতিটিক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচণ যেমন যুক্তি বিচার করে অগ্রসর হতে হয় ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়েও তদ্রূপ যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়।

ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

ওষুধকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা হয় - লঘুক্রিয় ওষুধ (acute medicines) এবং গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ (deep acting medicines)

১. লঘুক্রিয় ওষুধ এবং শক্তি ও মাত্রা

১.১ আমাদের মেটেরিয়া মেডিকায় এমন কতগুলো ওষুধ আছে যেগুলো ক্রিয়া তত গভীর নয়। ক্রিয়াকালও দীর্ঘ নয়। এরা দ্রুত কাজ করে। এদের ক্রিয়াক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের ক্রিয়ার আওতার মধ্যে যেকোন রোগে এদের ক্রিয়া তাৎক্ষণিক (instant), বিস্ময়কর (striking) এবং অদ্ভুত (strange). এদের লঘুক্রিয় ওষুধ বলে। যেমন, অ্যাকোনাইট, অ্যালো, ইথুজা, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, কলোসিন্থ, ক্যান্থারিস, ড্রসেরা, ইপিকাক, জেলসিমিয়াম, লোবেলিয়া, ট্যারিবিন্থিনা ইত্যাদি। এগুলো আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার ছোট ছোট মণি মাণিক্য। এরা আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। কি অ্যাকুটপীড়া, কি ক্রনিক পীড়া সকলক্ষেত্রেই এদের দরকার পড়ে। এগুলো সাধারণতঃ নিম্নশক্তিতে (৬, ৩০) প্রযুক্ত হয় এবং কয়েকমাত্রার প্রয়োজন হয়। কখন ও ২০০ শক্তিরও প্রয়োজন হয়। এর অধিক শক্তিক্রমের সাধারণতঃ দরকার হয় না। রোগ যে স্তরে এবং যেভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে ওষুধের শক্তি ও মাত্রা ও তদনুযায়ী স্থির করতে হয়।

একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর বমি ও উদরাময় হয়েছে। দুধ খাওয়ার পরই সজোরে বমি হয়। ছানাকাটার মত চাপচাপ জলমিশ্রিত বমি। মনে হয় গোটা পাকস্থলিটা উল্টে পেটের সব কিছু উগড়ে বের করে দিচ্ছে। পায়খানাও বারবার এমনি ছানাকাটার মতন বা সবুজাভ। পেট ব্যথা। শিশু কাঁদে। বমির পর মুখে শরীরে ঘাম দেখা দেয়। প্রচণ্ড অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে।

এখানে শিশুর দুধে অসহনশীলতার (intolerance) দরুণই এরূপ কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি ইথুজা ওষুধটিও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে এবং এর ক্রিয়াও তাৎক্ষণিক। অতএব ইথুজা নিম্নশক্তিতে (৬) দিনে ৩ বার করে ২দিন দেওয়াতেই শিশুটি এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠে।

এজন্য কলিক ব্যথা, দাঁত ওঠার সময় উদরাময়, কোন পীড়ার সঙ্গে বমিবমিভাব, হুপিং কাশি ইত্যাদি পীড়ায় যথাক্রমে কলোসিন্থ, ক্যামোমিলা, ইপিকাক, ড্রসেরা বা অন্য কোন ওষুধ নির্দেশিত হলে তার নিম্নশক্তির (৬,১২,৩০) কয়েকমাত্রা প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য ফল দেখা যায়।

১.২ মানসিক কারণজনিত অচিরপীড়ায় যেমন ভয়, অস্থিরতা, উত্তেজনা, হতাশা, বিরক্তি ইত্যাদি দরুণ পীড়ায় এবং যে অচিরপীড়ায় মানসিক লক্ষণ প্রকট বেশী সেখানে অ্যাকুট ওষুধের মধ্য ও উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়।

এজন্য ভয় পাওয়ার দরুণ উপসর্গে অথবা ভয় উপসর্গসহ রোগে অ্যাকোনাইট, রাগের দরুণ রোগে এন্টিম ক্রুড, হতাশার দরুণরোগে ইগ্নেসিয়া, তরুণরোগে স্নায়ুর অবসন্নতা দরুণ দূর্বলতা, কম্পন ইত্যাদিতে জেলসিমিয়াম বা অন্য যে ওষুধই সূচিত হোক না কেন তা মধ্য ও উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

২.০ গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ - আমাদের মেটেরিয়া মেডিকায় এমন কতগুলো ওষুধ আছে যেগুলো দেহতন্ত্রে ক্রিয়া করে স্বাস্থ্যের অবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এদের ক্রিয়া গভীর এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে। এগুলোকে গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ বলে। এগুলো রোগীর ধাতুগত পরিবর্তন সংঘটন করতে সক্ষম। এজন্য এগুলোকে ধাতুগত ওষুধ (constitutional medicines) বলে। সাধারণতঃ এগুলো উচ্চশক্তি ও ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করে দীর্ঘকাল ধরে তাদের ক্রিয়াফল পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২.১ পলিক্রেস্ট ওষুধ (polychrest medicines) - গভীর-ক্রিয়াশীল ওষুধের মধ্যে এমন কিছু ওষুধ আছে যেগুলোর ক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক। এগুলো দেহতন্ত্রে বিভিন্নস্তরে কাজ করতে সক্ষম। এজন্য বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন অবস্থায় এগুলো প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অচিররোগ ও চিররোগ উভয়রোগের চিকিৎসায়

এদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। এগুলো সুপরীক্ষিত (well proved)। প্রতিরোধক (preventive), প্রতিকারক (antidote), পরিপূরক (complementary) ওষুধ হিসাবেও এদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। আর্সেনিকাম এল্বাম, হিপার সালফার, মার্কারি, নাক্সভমিকা, পালসেটিলা, নেট্রামমিউর, সিলিসিয়া, সালফার ইত্যাদি এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

শক্তি ও মাত্রা - এ ওষুধগুলো দেহস্তরে যে স্তরে কাজ করার জন্য প্রযুক্ত হবে তদনুযায়ী ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। দৈহিকস্তরে কাজ করতে হলে নিম্ন থেকে মধ্যশক্তি, সার্বদৈহিকস্তরে মধ্য থেকে উচ্চশক্তি এবং মনস্তরে উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন হয়। গাত্রত্বক, মলদ্বার, মূত্রদ্বার, পাকাশয়, শ্লেষ্মা আবরণী পর্দার (mucus membrane) পীড়ায় নিম্নও মধ্যশক্তি, জ্বর, বাতের ব্যাথা ইত্যাদিতে মধ্য থেকে উচ্চশক্তি এবং মানসিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দেখা দিলে উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন হয়। একারণে পাকাশয়িক গোলযোগের দরুণ পীড়ায় নাক্সভমিকা সূচিত হলে নিম্নশক্তি (θ, ৬, ৩০), জ্বরে মধ্যশক্তি (২০০) এবং পাকাশয়িক গোলযোগসহ বিরক্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট, খুঁতখুঁতে প্রকৃতির রোগীতে নাক্সের উচ্চশক্তির (১হাজার) প্রয়োজন হয়।

একই কারণে আমাশয় রোগে মার্কারি সূচিত হলে নিম্নশক্তি (১২, ৩০) আমাশয় সহ জ্বরে, যেখানে প্রচুর জলপিপাসা, প্রচুর ঘাম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে আবার জ্বর হয় সেখানে মধ্যশক্তি (২০০) এবং সিফিলিটিক ধাতুর রোগীর সাদাস্রাব, কান পাকা, বাত বা অন্যকোন রোগে মার্কারি সূচিত হলে ১ হাজার বা তদূর্ধ্ব শক্তির প্রয়োজন হয়।

৩. ওষুধের ক্রিয়া প্রকৃতি — যে সকল ভেষজ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় নিষ্ক্রিয় (inert) অর্থাৎ কোন ভেষজগুণ প্রকাশ করে না সেগুলো ৩০ থেকে উচ্চশক্তি। যেমন কার্বোভেজ, লাইকোপডিয়াম, নেট্রামমিউর, সিলিসিয়া ইত্যাদি।

৪. যে সকল ভেষজ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দেহতন্ত্রে ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা (functional disorder) সৃষ্টি করে সেগুলো নিম্নশক্তিতে প্রযুক্ত হয়। যেমন, ইথুজা, সিকিউটা, ইপিকাক, লোবেলিয়া, ট্যাবেকাম ইত্যাদি। একটি শিশুর নাক

দিয়ে রক্ত পরছে। রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল, তাতে ফেনাভাব। সঙ্গে প্রচণ্ড বমিবমিভাব, ওয়াক তুলছে। কিন্তু বমি বিশেষ হচ্ছে না। জিভ পরিষ্কার। পিপাসা বিশেষ নেই। এক্ষেত্রে ইপিকাক্ই আমাদের ওষুধ। ইপিকাক ১২ শক্তিতে চারঘন্টা অন্তর ৩ বার প্রয়োগ করাতেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এক ভদ্রলোক দীর্ঘকাল মদ্যপানে আসক্ত থাকায় লিভারের দারুণ ক্ষতি হয়। এখন ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন। খিদে ভাল, কিন্তু কিছু খেলেই এসিড হয়, গ্যাসে পেট ফুলে যায়, পেট ব্যথা হয়। প্রচণ্ড গা বমিবমি করে। টক বমি করে। গলা বুক জ্বলে যায়। দাঁতও টকে যায়। মুখে প্রচুর লালা হয়। বুকে ব্যথা হয়। বুক চেপে ধরে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সামান্য নড়াচড়া করলেই দমবন্ধভাব হয়। সবসময় একটা খুশখুশে কাশি। আগে খুব ধূমপান করতেন। এখন সিগারেটের গন্ধেতেই কাশি, দমবন্ধভাব ও বমির উদ্রেক হয়। অত্যন্ত দুর্বলতা।

আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাটাই আমাদের নির্বাচিত ওষুধ। এটি আমাদের দেশের তামাকপাতা থেকে প্রস্তুত। এবার এটিকে কতশক্তিতে কিভাবে প্রয়োগ করব? রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে এ ওষুধের মূল আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ২ বার ৭দিন খাওয়ায় তার অস্বস্তিকর কষ্টগুলো অনেকটা কমে যায়। পরে এ ওষুধের ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তিক্রমে প্রয়োগ করায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে। তার ধূমপানের ও মদ্যপানের আসক্তি ও কমে যায়।

৫. কতগুলো ভেষজ তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দেহতন্ত্রে ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ করে। যেমন, আর্সেনিকাম এল্বাম, ল্যাকেসিস, মার্কারি, কোনায়াম ইত্যাদি। এগুলো সাধারণতঃ নিম্নশক্তিতে (৩০ শক্তির নিচে) বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা

আর্সেনিকাম এল্বাম নিম্নশক্তিতে (2x, 3x) দীর্ঘকাল ব্যবহার করলে দেহে, বিশেষ করে চর্মের উপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার মারাত্মক কুফল দেখা যায়। সম্প্রতি একজন চিকিৎসক আর্সেনিকের এরূপ প্রয়োগ করায় এবং তারজন্য

রোগীর আর্সেনিক দূষণের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় সেই চিকিৎসকের আদালতে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হয়। ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্বাচনে সকল চিকিৎসকের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৬. এমন কতগুলো ওষুধ আছে, যেমন বেলেডোনা, সালফার, আর্সেনিকাম এল্বাম ইত্যাদি যেগুলো সুস্থদেহে পরীক্ষার সময় তাদের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী বলে লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু সেগুলো অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে দ্রুত এবং স্বল্পকাল স্থায়ী ক্রিয়া করে। রোগ যত তীব্র হয় ওষুধের ক্রিয়া তত দ্রুত এবং স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। এসকল ক্ষেত্রে ওষুধ নিম্নশক্তিতে (৩০) বেশ কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু চিররোগের বেলায় একই ওষুধ উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করে তাকে ক্রিয়া করার মত সময় দিতে হয়।

৭. যে সমস্ত ওষুধ সুপরীক্ষিত হয়নি (not well proved) কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমানিত হয়েছে সেগুলো সর্বদাই নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করা হয়। যেমন এলার্জিজনিত হাঁচিতে (acute rhinites) লেমনা মাইনর, কিংবা মণিবন্ধের বাতেএকটিয়া স্পিকেটা, মাড়িও হাড়ের ক্ষয়ে হেক্লালাভা ইত্যাদি নিম্নশক্তিতে (৩,৬) কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।

৮. কতগুলো ওষুধ আছে যেগুলো কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক উপশমই দেয়না, দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষটিকে দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে। এগুলো সাধারণতঃ মূল আরক বা অন্য কোন নিম্নশক্তিতে অধিকমাত্রার বেশ কিছুকাল ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। যেমন রক্তস্রাবজনিত দুর্বলতা ও অজীর্ণতায় চায়না, অর্শপীড়ায় কলিনসোনিয়া, হ্যামামেলিস, ইস্কিউলাস হিপ ইত্যাদি, হৃৎযন্ত্রের দুর্বলতায় ক্রেটিগ্রাস, চায়না, অর্জুন ইত্যাদি, যকৃতের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যে চেলিডোনিয়াম, কার্ডুয়াস, চিয়োনেন্থাস ইত্যাদি, প্লীহার রোগে চায়না, সিয়ানোথাস ইত্যাদি, কিডনীর পীড়ায় বার্বেরিস, ক্যান্থারিস, সলিডাগো ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ]

শক্তি ও মাত্রা নিরূপণ
ওষুধের প্রকৃতি
(পূর্ব অধ্যায়ের পর)

বিভিন্নশ্রেণীর ওষুধ এবং শক্তি ও মাত্রা

৭. নোসোড্স (nosodes) - রোগজ ওষুধগুলো মানুষের রোগাক্রান্ত কোষকলা থেকে তৈরী করা হয়। এই কোষকলাগুলো রোগশক্তি ও জীবনীশক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার পরিণাম ফল। এরা যেহেতু মানুষেরই অংশ এজন্য এদের থেকে তৈরী ওষুধগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। সোরিণাম, মেডোরিণাম, সিফিলিনাম, টিউবার কুলিনাম ইত্যাদি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এরা আমাদের শক্তিশালী হাতিয়ার। এগুলো আরোগ্যকারী ওষুধ এবং ক্রনিক মায়াজমের প্রতিকারকারী ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। এগুলো নিম্নশক্তিতে ও বৃহৎমাত্রায় ঘনঘন প্রয়োগ করতে নেই। এদের মধ্য ও উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয় এবং একমাত্রা প্রয়োগ করে তার ক্রিয়াফল দীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এগুলো সাধারণতঃ ২০০ শক্তির নিচে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণতঃ ১ হাজার শক্তি থেকেই শুরু করা হয়।

৮. সার্কোস (sarcodes) - সার্কোডস শ্রেণীর ওষুধগুলো সুস্থ গ্রন্থিরস থেকে তৈরী হয়। যেমন থায়রয়েডিনাম, এড্রিন্যালিন, ইউরিক এ্যাসিড, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ইত্যাদি। এগুলো সাধারণতঃ নিম্নশক্তিতে (৩x, ৬, ৩০) এবং কিছুকাল ধরে প্রয়োগ করতে হয়। তবে কয়েকটি ওষুধ যেমন থায়রয়েডিনাম মধ্য ও উচ্চশক্তিতে ও প্রয়োগ করা হয়।

৯. শক্তিজ ওষুধ বা ইমপন্ডারেবলিয়া (imponderablia) - এই শ্রেণীর ওষুধগুলো বিভিন্ন শক্তি থেকে তৈরী হয়। যেমন ইলেক্ট্রিসাইটিস (electricitis), এক্সরে (X-ray), রেডিয়াম, ম্যাগনেটিক নর্থপোল, ম্যাগনেটিক সাউথপোল

ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত নিম্ন ও মধ্যশক্তিতে (৩০, ২০০) এবং কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

১০. দেশীয় ওষুধ - দেশীয় ওষুধগুলো গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত করা হয়। এগুলো খুবই কার্যকরী ওষুধ। তবে এরা সাধারণতঃ গভীর ক্রিয়াশীল নয়। এগুলোকে নিম্নশক্তিতে অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। যেমন, অর্জুন, ঈগলফোলিয়া, ব্লাটাওরিয়েন্টা, সিজিজিয়াম জাম্বোলিনাম ইত্যাদি।

১১. প্রতিষেধক ওষুধ (preventive medicines) - রোগ হলে আরোগ্য করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হোমিওপ্যাথিতে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে অত্যন্ত কার্যকরী কতগুলো ওষুধ আছে। যেমন, হামে মর্বিলিনাম, পালসেটিলা; জলবসন্তে ম্যালেন্ড্রিনাম, ভেরিওলিনাম; মাম্পসে ট্রাইফোলিয়াম রিপেন্স, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম, টাইফয়েডে টাইফয়েডিনাম, ডিপথেরিয়ায় ডিপথেরিনাম, টনসিলাইটিসে স্ট্রেপটোকক্সিন, পোলিওতে ল্যাথিরাস স্যাটাইভা, চোখ ওঠায় ইউফ্রেসিয়া, এনসেফেলাইটিসে বেলেডোনা, ম্যালেরিয়ায় চায়না, ম্যালেরিয়া অফিসিয়ালিস; কলেরায় কুপ্রাম মেট, হুপিংকাশিতে পার্টুসিন ইত্যাদি। এসকল রোগে এবং অন্যান্য রোগে আরও অনেক ওষুধ আছে। এগুলো সাধারণতঃ ২০০ শক্তিতে সপ্তাহে ১ বার করে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ ব্যবহার করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১ হাজার শক্তির প্রয়োজন হয়। কোন বাড়িতে এ রোগের সংক্রমণ ঘটলে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

১২. জেনাস এপিডেমিকাস (genus epidemicus) - কোন রোগের মহামারীর সময় রোগের যে সাধারণ প্রকৃতি অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তার সদৃশ ওষুধটিকে জেনাস এপিডেমিকাস বলে। তখন সে ওষুধটি প্রতিষেধক ও প্রতিকারক এই দুই হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিতে নির্বাচিত ওষুধটি নিম্ন শক্তিতে ঘনঘন এবং অন্যান্য ব্যক্তিতে মধ্যশক্তিতে উপরের বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হয়।

১৩. ওষুধের বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্নক্রিয়া - কতগুলো ওষুধ আছে যেগুলো বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে। যেমন,

১৩.১ হিপার সালফার, মার্কুরিয়াস, সিলিসিয়া নিম্নশক্তিতে পূঁজ উৎপন্ন করে। আবার এই ওষুধই উচ্চশক্তিতে পূঁজ নিবারণ করে। এজন্য ফোঁড়ায় পূঁজ উৎপন্ন হলে এবং ফোঁড়ায় পূঁজ নির্গমনের মুখ তৈরী করতে হলে এবং যদি ফোঁড়ায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যথা থাকে তবে হিপার সালফার নির্দেশিত হলে তার নিম্নশক্তিতে (৬) কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। তাতেই ফোঁড়া ফেটে গিয়ে পূঁজ বের হয়ে আসে। সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য কখনও ৩০শক্তির ২/৩ মাত্রার প্রয়োজন হতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে উচ্চশক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করলে ব্যথার তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে।

যদি ফোঁড়ায় পূঁজ উৎপন্ন না হয়ে থাকে কিংবা এমন জায়গায় হয়েছে যে ফোঁড়া বসিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় তবে ওষুধের মধ্যশক্তি (২০০) ২/১ মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়।

পূঁজ হয়েছে কিনা এবিষয়ে সন্দেহ থাকলে ওষুধ ৩০শক্তিতে প্রয়োগ করা বিধেয়।

গলায় মাছের কাঁটা বা পায়ে কাঁটা ফুটলেও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যদি গলায় বা পায়ে অত্যন্ত ব্যথা থাকে তবে হিপার নিম্নশক্তি(৬) ঘনঘন প্রয়োগ করলেই কাঁটা বের হয়ে আসে। ব্যথা বেদনা বিশেষ না থাকলে সিলিসিয়া ৬ দেওয়া হয়। যদি কাঁটা ফোটার অনেকদিন পরেও ঐ জায়গায় একটা খচখচ ভাব থাকে অথচ কাঁটা রয়ে গেছে কিনা বোঝা যায় না তখন সিলিসিয়ার ১০০০ একমাত্রাই এর প্রতিকার করবে।

১৩.২ আর্সেনিকাম এল্বাম পাকস্থলি, অন্ত্র ও কিডনীর পীড়ায় নিম্নশক্তি (৩০) এবং নিউরালজিয়া সহ স্নায়ুর পীড়া এবং চর্মপীড়ায় মধ্যশক্তিতে (২০০) প্রয়োগ করা হয়। রোগের স্তর যখন অগভীর এবং আশু উপশম প্রদান প্রয়োজন সেখানে নিম্নশক্তি ও অধিকমাত্রায় ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য খাদ্যে বিষক্রিয়াদরুণ রোগে কিংবা কলেরা রোগে আর্সেনিক সূচিত হলে এ ওষুধটি নিম্নশক্তিতে (৩০) ঘন ঘন কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। আবার ক্রনিক পীড়ায় এ ওষুধই উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রমাত্রায় দীর্ঘ সময় অন্তর প্রয়োগ করতে হয়।

১৩.৩ স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য ব্রায়োনিয়া নির্দেশিত হলে ২০০ শক্তি ক্ষুদ্রমাত্রা এবং স্তন্য হ্রাসের নিমিত্ত নিম্নশক্তি (৩,৬) কয়েক মাত্রায় প্রয়োজন হয়।

১২.৩ আঘাত লাগার দরুণ তরুণ পীড়ায় আর্ণিকা ৩০ বা ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আঘাত জনিত কারণে পরবর্তীকালে কোন পীড়া দেখা গেলে ১ হাজার বা তার ঊর্ধ্ব শক্তির প্রয়োজন হয়।

১৩.৪ যৌনক্রিয়ার আধিক্যহেতু দূর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, বার বার প্রস্রাবের রোগ, স্নায়ু দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে এবং স্টেফিসেগ্রিয়া নির্দেশিত হলে তার ৩০ শক্তি এবং ক্রোধ, অপমান, ক্ষোভ ইত্যাদি দমনজনিত পীড়ায় ১ হাজার বা তদূর্ধ্ব শক্তির প্রয়োজন হয়।

১৩.৫ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নাক্সভমিকা, ওপিয়াম, প্লাম্বাম নির্দেশিত হলে নিম্নশক্তি, উদরাময়ে মধ্যশক্তি এবং মানসিক লক্ষণযুক্ত রোগে উচ্চশক্তি।

১৩.৬ রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় ক্যাম্ফার সূচিত হলে এর নিম্নশক্তি (θ,2x) কয়েকমাত্রা ঘন ঘন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আবার অন্য কোন ওষুধের ক্রিয়ার প্রতিকার (antidote) এর ২০০ শক্তির ২/১ মাত্রার প্রয়োজন হয়।

১৩.৭ পডোফাইলাম ওষুধটিরোগ ও রোগের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তিতে প্রয়োগ করা হয়। যকৃতের তরুণ পীড়ায় মধ্যশক্তি (২০০) এবং পুরাতন অবস্থায় নিম্নশক্তি (৬,৩০); পিত্ত প্রণালীর অবরোধের জন্য যদি পিত্তস্রাব রোধ, পিত্ত পাথরি প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় তবে দ্রুত উপশমের জন্য মূল আরক ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। যকৃতের বিবর্ধন সহ কোষ্ঠবদ্ধতা হলে নিম্নশক্তি (৩,৬) এবং উদরাময় হলে নিম্ন ও মধ্যশক্তিতে (৩০,২০০) প্রয়োগ করতে হয়। সবিরাম জ্বরে মধ্য ও উচ্চশক্তির প্রয়োজন হয়। — ডাঃ কে. সি. ভঞ্জ।

১৩.৮ সালফার ওষুধ বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন অবস্থায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই অবস্থা অনুযায়ী শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। তরুণ চর্মপীড়ায় যেখানে প্রচণ্ড চুলকানি থাকে সেখানে নিম্নশক্তি (১২) অধিকমাত্রা, জ্বর ইত্যাদি প্রাদাহিক পীড়ায ৩০, ২০০ শক্তি, ক্রনিক পীড়ায় উচ্চশক্তি এবং অ্যাকুট পীড়ার চিকিৎসার শেষে বা অন্তবর্তী ওষুধ হিসাবে প্রয়োগের প্রয়োজন হলে সাধারণতঃ ২০০ শক্তির ১ মাত্রার প্রয়োজন হয়।

এসকল আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে ওষুধের শক্তি ও মাত্রা

নির্ধারণ কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। রোগীর অবস্থা, রোগের প্রকৃতি ও অবস্থা এবং ওষুধের প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। প্রতিটি রোগীর চিকিৎসার সময় রোগীর সামগ্রিক অবস্থা, তার পূর্ব চিকিৎসা এবং যে ওষুধটি নির্ধারিত হয়েছে তার ক্রিয়া ক্ষমতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোন বিশেষ শক্তিতে কোন ওষুধের বা তার শক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলে তাও অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এককথায় ওষুধের নির্বাচন, তার শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ এবং প্রয়োগ বিদ্যাটি গভীর জ্ঞান ও অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্ত করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

১. ওষুধকে প্রধানতঃ কত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়?

দুশ্রেণীতে — লঘুক্রিয় ও গভীরক্রিয়। লঘুক্রিয় ওষুধগুলোর ক্রিয়া দ্রুত কিন্তু অগভীর। গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধগুলোর ক্রিয়া ধীর কিন্তু গভীর।

২. পলিক্রেস্ট ওষুধগুলো কোন শক্তিতে ব্যবহৃত হয়?

অ্যাকুটপীড়ায় নিম্ন ও মধ্যশক্তি, ক্রনিক পীড়ায় উচ্চশক্তি।

৩. দেশীয় ওষুধ কোন শক্তিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়?

নিম্নশক্তিতে।

৪. নোসোড্‌স কোন শক্তিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়?

উচ্চশক্তিতে।

৫. একই ওষুধ বিভিন্ন রোগে বা একই রোগের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শক্তিতে প্রয়োগ করা হয় কেন?

রোগীর সে অবস্থায় তার প্রবণতা পরিতৃপ্তির জন্য।

মাত্রাবিজ্ঞান

হোমিওপ্যাথির প্রধান তিনটি উপাদান হলো নীতি, ওষুধ এবং মাত্রা (the principle, the remedy and the dose). চিকিৎসাকার্য্যে এ তিনটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এক নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত। কোন পীড়ার ক্ষেত্রে সদৃশনীতি অনুযায়ী সঠিক ওষুধ নির্বাচনের উপরই কেবল ওষুধের উপযোগিতা নির্ভর করেনা, সেইসঙ্গে ওষুধের উপযুক্ত আয়তন বা আরও নির্দ্দিষ্ট করে বললে মাত্রার ক্ষুদ্রতার উপর তা নির্ভর করে। সদৃশনীতি অনুযায়ী ওষুধ ও যদি অত্যধিক মাত্রায় প্রদত্ত হয় তা হলে কেবলমাত্র এই পরিমাণ আধিক্য হেতু তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।- অনুচ্ছেদ - ২৭৫-২৭৬। পক্ষান্তরে ওষুধ নির্বাচন যদি যথার্থ সদৃশভাবে করা হয় এবং তার মাত্রাকে অতিক্ষুদ্র করে নিরুপদ্রব নিরাময়ের উপযুক্ত পর্যায়ে হ্রাস করা হয় তা হলে ততবেশী পরিমাণে হিতকর হবে। অনুচ্ছেদ-২৭৭। সদৃশমতে নির্বাচিত ওষুধটি কতটা কিভাবে প্রয়োগ করলে রোগীর কোন অনিষ্ট সাধন না করে সর্বাপেক্ষা সুফল প্রদান করবে মাত্রা বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় এটিই।

মাত্রাবিজ্ঞান (posology)

Posology কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ posos থেকে। Posos মানে হল কতটা (how much), প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধটির যতটা পরিমাণ রোগীকে একবারে গ্রহণ করতে দেওয়া হয় ততটা একমাত্রা (dose)। মাত্রা বলতে পরিমাণ (quantity) বুঝায়। ইংরাজী dose কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ওষুধের পরিমাণ যা রোগীকে একবারে গ্রহণ করতে দেওয়া হয় (the quantity of medicine that is given to be taken at one time, a portion)। শক্তির (Potency) অর্থ হল power, influence, authority - Chamber's Dictionary) অতএব শক্তি ও মাত্রা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ যুক্ত। হ্যানিম্যান 'dose' বলতে বুঝিয়েছেন, ওষুধের

যে পরিমাণ প্রয়োগ করলে রোগীতে বর্তমান রোগলক্ষণ সমূহের সামান্য বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু নতুন কোন লক্ষণের সৃষ্টি হয় না তাই মাত্রা। অন্যভাবে বলা যায় ওষুধের যে পরিমাণ রোগীতে মৃদু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাই একমাত্রা।

মাত্রা বেশী হলে ওষুধের পরিমাণ বেশী থাকে এবং মাত্রা কম হলে ওষুধের পরিমাণ ও তদনুযায়ী কম হয়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যেহেতু মাধ্যম (medium, vehicle) ব্যবহার করা হয় এজন্য মাধ্যমের কমবেশীতে ওষুধের পরিমাণের পার্থক্য হয় এবং তারফলে ওষুধের ক্রিয়ায় ও পার্থক্য ঘটে।

ক্ষুদ্রমাত্রা বলতে কি বুঝায়

হোমিওপ্যাথিতে ক্ষুদ্রমাত্রা (small dose), ক্ষুদ্রতরমাত্রা (smaller dose), ক্ষুদ্রতমমাত্রা (minimum dose), ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর মাত্রা (infinitesmal dose) ইত্যাদি কথা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এদের প্রকৃত অর্থদ্যোতনা কি? সাধারণতঃ ওষুধের মূল আরক যতটা পরিমাণ রোগীতে একবারে প্রয়োগ করা হয় নিম্নশক্তিতে তার চেয়ে কম, মধ্যশক্তিতে আরও কম এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তিতে ক্ষুদ্রতম থেকে আরও ক্ষুদ্রতর পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়। সর্বক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য যেহেতু রোগীতে মৃদু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সেজন্য যতটা পরিমাণই ওষুধ দেওয়া হোকনা কেন এবং সে পরিমাণকে যাই বলা হোক না কেন মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই রোগীর সে অবস্থায় ক্ষুদ্রতম (minimum)হতে হবে। তা নইলে রোগীতে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ওষুধের পরিমাণ কেমন করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র করা হল তার একটা ইতিহাস আছে।

মাত্রার ক্রমবিবর্তন

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর প্রথম প্রায় কুড়ি বছর হ্যানিম্যান ওষুধ ৫/১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করতেন। এতে আরোগ্য লাভের পূর্বে রোগের খুব বৃদ্ধি ঘটতো। এজন্য তিনি ওষুধের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাতে থাকেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পোস্তদানার মত ক্ষুদ্র একটি অণুবটিকা একমাত্রা, অসহিষ্ণু রোগীর ক্ষেত্রে তার একবার ঘ্রাণ একমাত্রা। ক্ষেত্রবিশেষে ১টি, ২টি বা বড় জোর ৩টি অণুবটিকা একমাত্রা বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্যানিম্যান শততমিক শক্তির ওষুধের পোস্তদানার মত একটি অণুবটিকা জলে দ্রব করে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে এক একটি মাত্রা তৈরী করতে এবং প্রত্যেকটি মাত্রাকে ব্যবহার করার পূর্বে ঝাঁকি দিয়ে ঈষৎ শক্তি পরিবর্তন করে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে বলেছেন।১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ আবিষ্কার করেন এবং মাত্রাকে আরও ক্ষুদ্র করেন। ১০০টি অণুবটিকায় একগ্রেণ ওজন হয় এরূপ অণুবটিকার একটিই ক্ষুদ্রতম মাত্রা। ঐরূপ একটি অণুবটিকা শুষ্ক অবস্থা জিভের উপর দিলে ক্ষুদ্রতম মাত্রা হয় এবং তার ক্রিয়া মৃদুতম হয়।[৪১]

আবার ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র অণুবটিকা (কদাচিৎ একটির বেশী অণুবটিকা) একটি গ্লাসে ৭/৮ টেবিল চামচ জলে দ্রব করে তা থেকে এক টেবিল চামচ নিয়ে আরেকটি গ্লাসে আবার ৭/৮ টেবিল চামচ জলে দ্রব করে তা থেকে এক চামচ ওষুধ রোগীকে দিলে তা-ই ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর মাত্রা। রোগী যদি অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রবণ হয় তবে পূর্বোক্ত দ্রব থেকে এক চামচ নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি গ্লাসে মিশিয়ে তা থেকে এক চামচ প্রদান করলে একমাত্রা হয়। অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ রোগীদের ক্ষেত্রে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ গ্লাস প্রয়োজন হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় রোগীর প্রবণতা অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করতে হয়। কিন্তু এত ক্ষুদ্রমাত্রায় ওষুধে কোন কাজ হওয়া কি সম্ভব? হ্যানিম্যান বলছেন, সকল অভিজ্ঞতা থেকে এ জানা যায় যে যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাত্রা এত ক্ষুদ্র করা যায় না যা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বোধগম্য উপশম প্রকাশ করতে পারে না।[৪২]

---

৪১. A small pellet. laid dry on the tongue...proves itself the smallest and weakest dose. Aphorism 272.

৪২. As all experience shows that the dose of the especially suited homoeopathic medicine can scarcely be prepared too small to effect perceptible relief. Appr. 249 Footnote 135 and Appr 275-278)

ক্ষুদ্রতম মাত্রা ব্যবহারের কারণ

আমাদের উদ্দেশ্য রোগশক্তির আক্রমণে রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থার যে পরি- বর্তন হয়েছে ওষুধ প্রয়োগে তাকে আবার পরিবর্তন করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। এজন্য কতটা ক্রিয়াশক্তির প্রয়োজন? ফরাসী বিজ্ঞানী মোপার্সিয়াসের সূত্র হল, প্রকৃতি জগতে কোন পরিবর্তন সাধন করতে হলে যে ক্রিয়াশক্তির প্রয়োজন তার পরিমাণ সর্বদাই ক্ষুদ্রতম (The quantity of action necessary to effect any change in nature is the least possible). ফিঙ্কে বলেন আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করা হয় জীবন ক্রিয়ায় একটা পরিবর্তন আনার জন্য। কাজেই ওষুধশক্তির পরিমাণ অবশ্যই যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র হতে হবে (the decisive amount is alwasys a minimum, an infinitesimal)। স্টুয়ার্ট ক্লোজ বলেন, মাত্রানীতিটি নিউটনের গতি বিষয় নীতিটির চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। ঐ নীতিটি হল, প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে (To every action there is an equal and opposite reaction.)। আমরা জানি ইপিকাক বৃহৎমাত্রায় বমি ও বমিবমিভাব উৎপাদন করে। আবার ইপিকাকের ক্ষুদ্রমাত্রা এ অবস্থার প্রতিকার করে। ওপিয়াম বৃহৎমাত্রা গভীর নিদ্রার উদ্রেক করে এবং ক্ষুদ্রমাত্রায় তা প্রতিকার করে। ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়া ও গৌণ ক্রিয়া হল এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সদৃশমতে প্রযুক্ত হয় বলে স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন লক্ষণ উৎপাদন করে যেরূপ লক্ষণ রোগীতে বর্তমান রয়েছে। দুভাবে উৎপন্ন একই ধরনের লক্ষণ তখন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ফলে রোগের বৃদ্ধি ঘটে। এ অবস্থার দ্রুত অবসান দরকার। ওষুধ ক্ষুদ্রমাত্রায় দেওয়া হয় বলে এর ক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়। তখন তার বিপরীত ক্রিয়া শুরু হয়। এ ক্রিয়া পূর্বোক্ত ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত। ফলে অবস্থার আবার একইরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং লক্ষণসমূহের অবসান ঘটে। ওষুধের পরিমাণ বেশী হলে পূর্বতন লক্ষণগুলো বাড়বে। নতুন কিছু লক্ষণ দেখা দেবে এবং তা দীর্ঘকাল থাকবে। রোগীর কষ্ট বাড়বে, রোগের জটিলতাও বাড়বে। ওষুধের মাত্রা তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র হতে হবে। এই ক্ষুদ্রতার পরিমাণ কত?

ওষুধের ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা তিন প্রকারের হতে পারে - শারীরবৃত্তীয় (physiological), আরোগ্যদায়ক (curative or therapeutic) এবং প্যাথজেনেটিক (pathogenetic).

'ফিজিওলজিক্যাল' মাত্রা কথাটি সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তিকর। এতে মনে হতে পারে এটা একটা স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর প্রক্রিয়া। ফিজিওলজিক্যা ল মাত্রা এবং যে উদ্দেশ্যে তা প্রযুক্ত হয় তা স্পষ্টতই ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়া এবং তা সরাসরি লক্ষণ উৎপাদন করার জন্য। ফিজিওলজিক্যাল মাত্রা বলতে এমন মাত্রা বুঝায় যা এমন পরিমাণে এবং এমন শক্তিতে দেওয়া হয় যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত বিশেষ কিছু ক্রিয়া বা লক্ষণ উৎপন্ন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এমাত্রা হলো এমন পরিমাণ যা সর্বাধিক এমন পরিমানে ব্যবহার করা যায় যাতে কোন বিপদ ঘটতে না পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলেডোনা বা অ্যাট্রোপিন অক্ষি তারকার সম্প্রসারণ ঘটাতে বা শ্লেষ্মা পর্দায় (mucus membrane) এ শুষ্কতা আনয়ন করতে বা চর্মে অধিক রক্ত প্রবাহ সঞ্চার করতে (flushing) প্রয়োগ করা হয়, ওষুধের অন্য কোন লক্ষণ তাতে উৎপন্ন হল কিনা সেটা বিবেচনা করা হয়না। উদ্দেশ্য হল, ওষুধের একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াফল উৎপন্ন করা। এতে শুধু রোগীর বয়স বিবেচনা করা হয়। সমস্ত রোগীকে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক এই দু ভাগে ভাগ করা হয়। যদি কোন রোগীর ওষুধের এই পূর্ব-নির্ধারিত মাত্রা গ্রহণে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তবে তাকে অন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

ওষুধের ফিজিওলজিক্যাল ক্রিয়া কখনও আরোগ্যকর ক্রিয়া নয়। এ ঠিব তার বিপরীত এবং হোমিওপ্যাথিতে এমাত্রা কখনও ব্যবহৃত হয়না। হোমিওপ্যাথিতে এ কথাটির ব্যবহার বিভ্রান্তিকর। একে বরং প্যাথজেনেটিক ক্রিয়া বলাই যুক্তিসঙ্গত।

প্যাথজেনেটিক কথাটি এসেছে গ্রীকশব্দ pathos মানে suffering, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং genesis মানে origin, producing suffering থেকে।

প্যাথজেনেটিক মানে হল যাতে কষ্টের সৃষ্টি হয়। লক্ষণ হল রোগের ভাষা। এজন্য ওষুধের যে মাত্রা সুস্থ দেহে রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে তাকে প্যাথজেনেটিক মাত্রা বলে, আর ঐ সব লক্ষণকে প্যাথজেনেটিক লক্ষণ বলে। Therapeutic কথাটির মানে হল আরোগ্যদায়ক। প্যাথজেনেটিক ক্রিয়া কখনও আরোগ্যকর ক্রিয়া হতে পারে না। ওষুধের ক্রিয়া প্যাথজেনেটিক (toxic) না আরোগ্যকর তা নির্ভর করে ওষুধের শক্তি ও মাত্রার উপরে। এবং নিঃসন্দেহে সে মাত্রা অবশ্যই ক্ষুদ্র হবে।[৪০]

---

৪০ Stuart Close - Ibid-page-185

স্থূলমাত্রার কুফল

হ্যানিম্যান স্থূল মাত্রার কুফল সম্বন্ধে অর্গাননের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এবং ক্রনিক ডিজিজেস গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ নিয়ে আমরা পরিশিষ্ট-২এ আলোচনা করব।

হোমিওপ্যাথিতে স্থূল মাত্রায় অনেকসময় ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা কখনও ফিজিওলজিক্যাল বা প্যাথজেনেটিক মাত্রা নয়। এ মাত্রা তার চেয়ে অনেক কম (subphysiological or sub-pathogenetic)। আরোগ্যকর মাত্রা তাকেই বলা হবে যা প্রাথমিক ক্রিয়ায় বর্তমান রোগ লক্ষণের সামান্য বৃদ্ধি ঘটাবে কিন্তু নতুন কোন লক্ষণ উৎপন্ন করবে না এবং যা গৌণক্রিয়ায় এসকল লক্ষণের অবসান ঘটাবে। এতে রোগীর শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। তার কষ্টের দ্রুত উপশম ঘটে এবং দ্রুত নির্মল আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়। এজন্য বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে সদৃশ ওষুধ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়, ওষুধের পরিমাণের উপরও তার উপযোগিতা নির্ভর করে। - অনুচ্ছেদ ২৭৫ । কিন্তু এর পরিমাণ কত? মাত্রা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি রোগী আলাদা, তাদের প্রবণতা আলাদা, রোগে তাদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন হয়, প্রতিটি ওষুধেরও ক্রিয়াক্ষমতা আলাদা, একই ওষুধের বিভিন্নশক্তির ও ক্রিয়ার প্রকৃতি আলাদা। এজন্য প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনমাত্রা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। - অনুচ্ছেদ ২৭৮ - । কেবলমাত্র কয়েকটিসাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাত্রা নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম

১. প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ নির্ভর করে রোগীর প্রবণতা, রোগের প্রকৃতিও ওষুধের প্রকৃতির উপর।

২. প্রবণতা যত বেশী শক্তি তত বেশী, মাত্রা তত কম। প্রবণতা যত কম, মাত্রা তত বেশী।

৩. ওষুধের শক্তির ক্ষেত্রে যেমন ৩০ শক্তিকে ভিত্তিশক্তি ধরে তার উর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রম স্থির করতে হয় মাত্রার ক্ষেত্রেও তেমনি নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ নিয়মটি হল:

৩.১ পোস্তদানার মত একটি অণুবটিকা (১০নং অণুবটিকা) হল ক্ষুদ্রতম একমাত্রা। রোগীর প্রবণতা কম থাকলে ২টি বা ৩টি অণুবটিকা দেওয়া যেতে পারে।

৩.২ ৩টির বেশী অণুবটিকা বা ফোঁটামাত্রা বৃহৎমাত্রা।

৩.৩ অত্যন্ত অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ১টি বা ২টি অণুবটিকা জলে গুলে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে তার এক ভাগ দিতে হয়।

৩.৪ তরল ওষুধের ক্ষেত্রে এক আউন্স জলে একফোঁটা ওষুধ দিয়ে ৪ থেকে ৬ ভাগ করে দিতে হয়। প্রবণতা খুবই কম থাকলে একফোঁটা মাত্রা দেওয়া যেতে পারে।

৩.৫ ওষুধের শক্তি কম হলে মাত্রার পরিমাণ অধিক করতে হয়। শক্তি যত উচ্চ মাত্রার পরিমাণ তত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করতে হয়। এক হাজার এবং তার উচ্চতর শক্তির ওষুধগুলোর ব্যবহারে ফোঁটা-মাত্রা অত্যন্ত বৃহৎমাত্রা। এসকলক্ষেত্রে একটি ১০নং অণুবটিকা নিয়ে এক আউন্স জলে মিশিয়ে তাকে দুভাগে ভাগ করে দু মাত্রা তৈরী করা হয়।

৩.৬ মূল আরকের ৩ ফোঁটা থেকে ৫ ফোঁটা একমাত্রা। তবে কতগুলো ওষুধের বিশেষক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ ফোঁটা একমাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন জন্ডিসরোগে চেলিডোনিয়াম বা কার্ডুয়াসের মূল আরক, অনিদ্রায় প্যাসিফ্লোরার মূল আরক ডায়াবেটিসে সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলিনামের মূল আরকের ১০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উচ্চরক্তচাপে রাউলফিয়া ওষুধটির মূল আরক ২০ ফোঁটা পর্যন্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এধরনের ওষুধ অনেক আছে। এ ওষুধগুলো দেহের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে অত্যন্ত কার্যকরী এবং এ যন্ত্রগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হলে দ্রুত তা নিরাময় করতে পারে। এসকলক্ষেত্রে বৃহৎমাত্রাই ক্ষুদ্রতমমাত্রা। তবে সকলক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া শুরু হলে ক্রমশ উচ্চতরশক্তিতে যেতে হয় এবং মাত্রা ক্ষুদ্রতর করতে হয়।

৩.৭ দেশীয় ওষুধ নিম্নশক্তিতে ক্ষুদ্রমাত্রায় (১ ফোঁটা থেকে ৩ ফোঁটা মাত্রায়) দেওয়া হয়।

৩.৮ পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয় পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

উপরের এ আলোচনা থেকে এ বিষয় পরিষ্কার হবে যে মাত্রা নির্ণয় প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে রোগী নির্ভর। রোগীর তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করে ওষুধের কখনও বৃহৎমাত্রা, কখনও ক্ষুদ্রমাত্রা, কখনও ক্ষুদ্রতম মাত্রা কখনও আরও ক্ষুদ্রতর মাত্রার প্রয়োজন হয়। রোগের অনাবশ্যক বৃদ্ধি না ঘটিয়ে যা আরোগ্য ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে তা-ই মাত্রা। সেক্ষেত্রে তা-ই ক্ষুদ্রতম মাত্রা।

সারাংশ

১. মাত্রা বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় কি?

মাত্রাবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হল ওষুধের কতটা পরিমাণ রোগীতে একবারে প্রয়োগ করলে আরোগ্যক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে।

২. মাত্রা বলতে কি বুঝায়?

মাত্রা হল ওষুধের ততটা পরিমাণ যা রোগীতে একেকবারে প্রয়োগ করলে রোগীর বর্তমান লক্ষণ সমূহের সাময়িক সামান্য বৃদ্ধি ঘটে অথচ নতুন কোন লক্ষণ উৎপন্ন না হয়।

৩. ক্ষুদ্রতম মাত্রা বলতে কি বুঝায়?

১০ নং অণুবটিকার একটিই ক্ষুদ্রতমমাত্রা।

৪. কখন বৃহৎমাত্রা প্রয়োগ করা উচিত?

রোগীর প্রবণতা যখন কম থাকে, বা যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তখন।

৫. বৃহৎমাত্রা, ক্ষুদ্রমাত্রা, ক্ষুদ্রতরমাত্রা, ক্ষুদ্রতমমাত্রা ইত্যাদি কথার তাৎপর্য কি?

রোগীর প্রবণতার পরিতৃপ্তি বিধান করাই ওষুধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। প্রবণতা স্তর অনুযায়ী ওষুধের নিম্ন থেকে উচ্চতম শক্তির প্রয়োজন হয়। তেমনি মাত্রার বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম মাত্রার প্রয়োজন হয়। তবে যে মাত্রাই ব্যবহারের প্রয়োজন হোক না কেন সে মাত্রা সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম মাত্রা। কেননা সে মাত্রায় মৃদু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, বর্তমান লক্ষণের সামান্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নতুন কোন লক্ষণের সৃষ্টি হয় না।

ওষুধ প্রয়োগবিজ্ঞান

চিকিৎসকের প্রথম কাজ রোগীকে পরীক্ষা করে একটি উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করা। দ্বিতীয় কাজ হল সেই ওষুধের উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণ করা এবং তৃতীয় কাজ হল নির্বাচিত ওষুধটিকে এমন পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যাতে সর্বোত্তম ফল লাভ সম্ভব হয়। এই প্রয়োগ প্রক্রিয়াই প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়। ওষুধ শক্তিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় বলে কোন মাধ্যমের সাহায্যে ওষুধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ জল বা সুরাসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওষুধ অণুবটিকা (globule), চূর্ণ বা জলে মিশ্রিত করে সেবন করার জন্য দেওয়া হয়। এভাবে প্রদত্ত ওষুধের প্রভাব জিহ্বা, মুখ বা অন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্নায়ুর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহের মত সমগ্র দেহতন্ত্রে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ওষুধ প্রয়োগরীতি

ওষুধ সাধারণতঃ পাঁচভাবে রোগীতে প্রয়োগ করা হয়: জিভ ও মুখ দিয়ে সেবনের মাধ্যমে, নাক বা মুখ দিয়ে ঘ্রাণের সাহায্যে শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে, ত্বক আচ্ছাদিত অঙ্গে মর্দনের সঙ্গে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করে, বাহ্যিক প্রয়োগের মাধ্যমে এবং মাতা বা ধাত্রীর স্তন দুগ্ধের মাধ্যমে। - অনুচ্ছেদ ২৮৪ এবং পাদটীকা ১৩৪।

সেবনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ

১.১ অনুগ্র তরুণরোগের ক্ষেত্রে যেখানে একটিমাত্রা ওষুধ দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে হয় সেখানে ওষুধের একটি অণুবটিকা শুষ্ক অবস্থায় জিভে দেওয়া যেতে পারে এবং তা-ই ক্ষুদ্রতম মাত্রা। এরূপ ক্ষেত্রে ওষুধটি অল্প কয়েকটি স্নায়ুকে স্পর্শ করে এবং তার ফলে ক্রিয়া অত্যন্ত মৃদু হয়। অনুচ্ছেদ ২৭২

জলের সঙ্গে মিশ্রিত করেও ওষুধ সেবনের কারণ

১.২ প্রায় সকলক্ষেত্রেই একাধিক মাত্রার প্রয়োজন হয়। এসকলক্ষেত্রে একটি অণুবটিকা কিছু দুগ্ধ শর্করার সঙ্গে মিশিয়ে জলে দ্রব করে কয়েকভাগে ভাগ করে তার একভাগ একমাত্রা হিসাবে দেওয়া হয়। ওষুধ প্রয়োগ করার পূর্বে প্রত্যেকবার ঝাঁকি দিয়ে নিতে হয়। ওষুধ কতমাত্রা প্রয়োগ করা হবে সেই অনুযায়ী অণুবটিকার সংখ্যা কয়েকটি বাড়ানো হয়। যেমন ওষুধটি যদি দিনে ২ বার করে ৫ দিন ব্যবহার করতে হয় তাহলে একটি দু আউন্স শিশিতে দুই-তৃতীয়াংশ পরিস্রুত জলে পূর্ণ করে তাতে ওষুধের ৩/৪ টি অণুবটিকা (রোগীর প্রবণতা অনুযায়ী অণুবটিকার সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে হয়) মিশিয়ে দশটি দাগ কেটে একেকবারে এক দাগ করে সেবন করতে দিতে হয়। ওষুধ সেবন করার আগে শিশিটি ৮/১০বার জোরে ঝাঁকি দিয়ে নিতে হবে। এভাবে ওষুধ গ্রহণ করলে প্রত্যেকটি মাত্রা অনেকগুলো স্নায়ুকে স্পর্শ করবে এবং তা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী হবে। - অনুচ্ছেদ - ২৭২

২. আমাদের জীবনীশক্তি কখন ও একই শক্তির ওষুধ বিনাবাধায় গ্রহণ করে না। একই শক্তির ওষুধ দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে সেশক্তি যে স্থানে কাজ করার কথা সেস্থানে পূর্বোক্তমাত্রা ইতিপূর্বেই কাজ করেছে। কাজেই দ্বিতীয়মাত্রা কাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না। এজন্য ওষুধ গ্রহণের পূর্বে ওষুধসমেত শিশিটি সজোরে ৮/১০ বার ঝাঁকি দিয়ে কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি করে প্রয়োগ করতে হয়। - অনুচ্ছেদ - ২৪৭। এই পদ্ধতিকে ওষুধের প্রতিমাত্রায় শক্তি পরিবর্তন করে (deviated or altered potency) প্রয়োগ পদ্ধতি বলে।

২. ঘ্রাণের মাধ্যমে ওষুধ গ্রহণ

নাসিকা ও মুখ দ্বারা তরল ওষুধের ঘ্রাণ গ্রহণ করেও ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসকলক্ষেত্রে একড্রাম শিশিতে (৫মি.লি.) একটি অণুবটিকা নিয়ে তাতে জল মিশ্রিত সুরাসারে তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ করে দ্রব করতে হয়। পরে পর্যায়ক্রমে দু নাসারন্ধ্রের সামনে ধরে এক মিনিট করে ঘ্রাণ নিতে হয়। প্রতিবার ঘ্রাণ নেওয়ার

পূর্বে শিশিটি ৮/১০বার ঝাঁকি দিতে হয়। অ্যাকুট রোগের ক্ষেত্রে এরূপ ঘ্রাণ নেয়া কয়েক মিনিট ধরে নেওয়া যায়। ক্রনিক পীড়ার ক্ষেত্রে এরূপ ঘ্রাণ দু, তিন বা চারদিন অন্তর নিতে হবে। শততমিক শক্তির ওষুধ মুখ দ্বারা গ্রহণে যেভাবে পুনঃবার গ্রহণ করতে হয় (repeat) এক্ষেত্রেও সেরূপ করতে হয়। - অনুচ্ছেদ - ২৪৮

যে সকল রোগী অতিমাত্রায় অনুভূতিশীল কিংবা সংজ্ঞালোপের রোগী অথবা তড়কার রোগীর ক্ষেত্রে অথবা যে সকলক্ষেত্রে মুখ দ্বারা ওষুধ সেবন করানো সম্ভব নয় তাদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

৩. গাত্রত্বকে মর্দনদ্বারা প্রয়োগ

গাত্র ত্বক আচ্ছাদিত দেহের সমস্ত অংশে পিঠে, বুকে, বাহুতে, হাতে, পায়ে, তরল ওষুধ মালিশ করা যেতে পারে। তবে সেসঙ্গে সে ওষুধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করলে আরোগ্য ক্রিয়া দ্রুততর হয়। এ সম্বন্ধে একটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গাত্রত্বকের যে অংশে ব্যথা, আক্ষেপ কিংবা উদ্ভেদ রয়েছে অর্থাৎ অসুস্থ বা অস্বাস্থ্যকর অংশে ওষুধ মর্দন অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। অনুচ্ছেদ-২৮৫

৪. বাহ্যিক প্রয়োগ

৪.১ ওষুধের বাহ্যিক প্রয়োগ সাধারণতঃ ক্ষতিকর। কেননা তাতে রোগের প্রকাশকে অবলুপ্ত করা হয়, রোগ চাপা পড়ে। তবে বাহ্যিক প্রয়োগের একটি ব্যতিক্রম আছে। ডুমুরাকৃতি অর্বুদ বা আঁচিল যদি পূর্বে কোনরূপ চিকিৎসা না হয়ে থাকে তবে আভ্যন্তরিক ওষুধ সেবনের সঙ্গে সেই ওষুধের বাহ্যিক প্রয়োগ করলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়। অনুচ্ছেদ - ২৮২ পাদটীকা ১৬৩

৪.২ আঘাত, পতন, দংশন বা দগ্ধ হওয়ার দরুণ যদি কোন স্থান কেটে যায়, পিষে যায়, ফুলে যায়, পুড়ে যায়, শিরা ধমনী স্নায়ু বিক্ষত হয় তবে আভ্যন্তরিক ওষুধ সেবনের সঙ্গে সে ওষুধের বাহ্যিক প্রয়োগ করলে দ্রুত উপশম ঘটে এবং আরোগ্যক্রিয়া দ্রুততর হয়। এখানে প্রাকৃতিক কোন রোগ নেই। কাজেই রোগ চাপা পড়ার সম্ভাবনাও নেই। এজন্য আঘাতে আর্নিকা, রুটা, সিম্ফাইটাম; রক্তপাতে

ক্যালেন্ডুলা; পোড়াক্ষতে ক্যান্থারিস; স্নায়ুর আঘাতে হাইপেরিকাম, লিডাম ইত্যাদি ওষুধ আভ্যন্তরিক সেবনের সঙ্গে তাদের মূল আরক প্রয়োগ করলে দ্রুত উপশম হয়। আহত অঙ্গটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে আঘাতের দরুণ কোনস্থান কেটে গেলে আর্নিকা বাহ্যিক প্রয়োগ করতে নেই। তাতে সেপটিক হওয়ার সম্ভাবনা।

৫. মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে প্রয়োগ

মাতৃ বা ধাত্রীর দুগ্ধের মাধ্যমে শিশুদের ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবে ওষুধ প্রয়োগ করলে স্তন দুগ্ধের মাধ্যমে শিশু সহজেই ওষুধ গ্রহণ করতে পারে। মাতা যদি কোন ক্রনিক রোগের রোগিনী হন তবে এভাবে তিনি মায়াজম মুক্ত হতে পারেন। গর্ভাবস্থায় মাতাকে ক্রনিক মায়াজম নাশক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করলে সুস্থ সবল শিশু ভূমিষ্ঠ হতে দেখা গেছে। এভাবে সোরাতত্ত্বের সারবত্তা নতুন করে প্রমাণিত হয়। অনুচ্ছেদ ২৮৪, পাদটীকা ১৬৪। তবে এসকল ক্ষেত্রে মাতা ও শিশু উভয়কেই ওষুধ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে বার্ণেটের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।

বার্ণেট একবার এক শিশুরোগী দেখার জন্য আহূত হন। দশ সপ্তাহের এই শিশুটি ভয়ানক রকম মুমূর্ষ। মুখের চেহারা বদলে গেছে। সমস্ত শরীর হিম শীতল ও বিবর্ণ। অন্য বিশেষ কিছু লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছিল না। অনুসন্ধানে জানা যায় দিন তিনেক আগে শিশুটির জন্য নতুন একজন ধাত্রী রাখা হয়েছে। ধাত্রীটি বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী বলে মনে হচ্ছিল। সে নিজেও বলে তার কোন রোগ নেই। তবে কদিন হল, তার ডানহাতে একটু ব্যথা হয়েছে। আসলে, এখানে কাজে যোগ দেওয়ার আগের দিনে সে হাসপাতালে গিয়ে নতুন করে টিকা নিয়ে এসেছে। টিকাটি পেকে ওঠায় হাতে ব্যথা হয়েছে।

এতে বার্ণেট এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, টিকার বিষ ধাত্রীর স্তন্যের মাধ্যমে শিশুতে সংক্রামিত হয়েছে। তিনি থুজা ৬ শিশু ও ধাত্রী দুজনকেই দেন। খুব তাড়াতাড়ি শিশুর উন্নতি দেখা যায়। পরের দিনই সে প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠে। ধাত্রীটির টিকাও এর মধ্যে শুকিয়ে যায়।

ওষুধ প্রয়োগের সময়

ওষুধ গ্রহণের সাধারণ সময় হল খাদ্য গ্রহণের এক ঘন্টা বা অর্ধ ঘন্টা আগে। সাধারণতঃ প্রথম মাত্রা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার অব্যবহিত পরে খালি পেটে এবং দ্বিতীয় মাত্রা রাত্রে শোওয়ার পূর্বে। যদি দিনে চারবার ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে সকালে খালিপেটে, দুপুরে খাওয়ার একঘন্টা পূর্বে বা পরে, সন্ধ্যাবেলা এবং রাত্রে শোওয়ার অব্যবহিত পূর্বে।[৪৪] স্নায়ুতন্ত্র যখন সতেজ ও টেনশন মুক্ত থাকে সেসময় ওষুধ সেবন করা বিধেয়। দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করার সময় বা অব্যবহিত পরে, উত্তেজিত অবস্থায় বা আহারের ঠিক পরেই ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। ওষুধ খাওয়ার পর কিছুক্ষণ শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে হয়। তাতে ওষুধ বিনা বাধায় অনুকূল পরিবেশে কাজ করতে সমর্থ হয়।

ব্যতিক্রম

১. রোগের বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ ওষুধ প্রয়োগ করা হয় না, তাতে রোগের বৃদ্ধি ঘটে।

২. যে সকল ওষুধের বৃদ্ধির নির্দিষ্ট সময় আছে সেসকল ওষুধ সে সময়ে দিতে নেই। যেমন মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে আর্সেনিকাম এল্বাম, বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত লাইকোপোডিয়াম, সকাল ৮টা থেকে ১১টা নেট্রাম মিউর, রাত্রে মার্কারি ও সিফিলিনাম, শোয়ার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ল্যাকেসিস ইত্যাদি।

৩. বিরামশীল ব্যধিতে বিরামকালে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়।

৪. আর্সেনিকাম এল্বাম ও ফেরাম ফস ওষুধটি নিম্নশক্তিতে প্রদান করতে হলে খাদ্য গ্রহণের অব্যবহিত পরে দিতে হয়।[৪৫]

---

৪৪. J.H Clarke. The Prescriber. Jain Publishing Co. Page 61.

৪৫. J.H Clarke. Ibid Page 61.

৫. পেটে আলসার রোগীতে ওষুধের মাদার টিঞ্চার প্রয়োগ করতে হলে খাওয়ার পরে দেওয়াই বিধেয়।

৬. পটাসিয়ামের কোন ওষুধ জ্বরাবস্থায় দিতে নেই।[৪৬]

অচিররোগের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ প্রণালী ঃ

অচির প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ওষুধের ২থেকে ৪ মাত্রা প্রত্যহ প্রয়োগ করা হয়। অতি জরুরী ক্ষেত্রে এক মাত্রা কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। একটি এক আউন্স শিশির দুই-তৃতীয়াংশ পরিস্রুত জলে পূর্ণ পরে যতমাত্রা ওষুধ প্রয়োজন তদনুযায়ী অণুবটিকা নিতে হবে। সাধারণতঃ একটি অণুবটিকা একমাত্রা হিসাব ধরা হয়। রোগীর প্রবণতা অনুযায়ী এই অণুবটিকার সংখ্যা কম বা বেশী হতে পারে। বেশী মাত্রা হলে অণুবটিকার সংখ্যা ক্রমশ কম করতে হয়। যেমন আটমাত্রা ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে ৫/৬টি অণুবটিকা নিলেই যথেষ্ট। তরল ওষুধ হলে একফোঁটা ওষুধে ৭/৮ মাত্রা হয়। বিচূর্ণ হলে এক গ্রেণ (প্লাস্টিকের ছোট চামচের একচামচ) একমাত্রা ধরা হয়। জলে দ্রব ওষুধের সঙ্গে ৫ ফোঁটা স্পিরিট মিশিয়ে দাগ কেটে রোগীকে দেওয়া হয়। ওষুধ গ্রহণের পূর্বে ১০ বার শিশিটি সজোরে ঝাঁকি দিয়ে নিতে হবে। আরও অধিক মাত্রা ওষুধের প্রয়োজন হলে ২ আউন্স বা ৪ আউন্সের শিশি ব্যবহার করতে হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীকে নির্দেশ দিতে হয় ওষুধে ক্রিয়া শুরু হলে ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে এবং তারপরও রোগের সে লক্ষণ থাকলে ওষুধ দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে গ্রহণ করতে হবে। রোগীকে প্রত্যহ এমনকি সপ্তাহে একবার দেখাও অনেকসময় সম্ভব হয় না। এজন্য কয়েকমাত্রা ওষুধ বেশী দিয়ে এধরনের নির্দেশ দিতে হয়। একইকারণে প্রয়োজনবোধে ওষুধ স্বল্পতর সময়ের ব্যবধানে গ্রহণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়।

৪৬. T.F. Allen. Never use any salts of Potash where there is fever. Quoted by W. Boericke in his Homoeopathic Materia Medica. M. Bhattacharyya & Co. Third Edition. Page 366.

চিররোগের ক্ষেত্রে ওষুধ গ্রহণ প্রণালী

চিররোগের ক্ষেত্রে একমাত্রা ওষুধ প্রয়োগ করে তাদের ক্রিয়াফলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কেন্টের পরামর্শ হল, অপেক্ষাকর এবং পর্যবেক্ষণ কর (wait and watch)। নির্বাচিত ওষুধটি একমাত্রা ব্যবহার করা হবে না দু বা তিন মাত্রা ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন উচ্চশক্তির ওষুধ একমাত্রাই যথেষ্ট। অনেকে আবার ঐ একমাত্রা ওষুধকে জলে মিশ্রিত করে ২/৩ ভাগে বিভক্ত করে (সাধারণতঃ ২ ভাগে) ১২ঘন্টা/৮ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করা অধিক কার্যকরী বলে মনে করেন। কেন্ট এ ভাবে প্রতিশক্তির ওষুধ দু মাত্রা প্রয়োগ করে ক্রমে উচ্চতর শক্তিতে প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনটি প্রধান রোগবীজ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যখন তাদের লক্ষণ পূর্ণভাবে চর্মের উপর প্রকাশমান থাকে তখন প্রথম থেকেই নির্বাচিত ওষুধের উচ্চতর শক্তির অধিকমাত্রার প্রয়োজন হয়।[৪৭]

রোগের বৃদ্ধির কালে ওষুধ প্রয়োগ সর্বদাই বন্ধ রাখতে হয় এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হয়।

চিররোগের চিকিৎসায় একমাত্রা ওষুধ দিয়ে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়। এসময় কোন ওষুধ না দিলে রোগীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং অন্য ওষুধ গ্রহণে প্রণোদিত হতে পারে। প্রদত্ত ওষুধের ক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওষুধবিহীন ওষুধ অর্থাৎ প্লাসিবো (Placebo to please) নিয়ম করে সেবন করতে দিতে হবে। চিকিৎসাকার্য্যে প্লাসিবোর ব্যবহার এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৪৭. The three great miasms require from the very beginning large doses of the specific remedies of ever higher degrees of dynamization. Aph. 282 Footnote 163

সারমর্ম

১. ওষুধ কি কি ভাবে প্রয়োগ করা চলে ?

মুখ, জিভ ও পাকাশয়ের সাহায্যে সেবনের মাধ্যমে, নাসিকার সাহায্যে ঘ্রাণের মাধ্যমে, গাত্রত্বকে মর্দনের মাধ্যমে, বাহ্যিক প্রয়োগে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে স্তন্যের মাধ্যমে।

২. ওষুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগের কারণ কি ?

ওষুধ অধিকসংখ্যক স্নায়ুকে স্পর্শ করে বলে অধিকতর কার্যকরী হয় এবং ক্রমোন্নত শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব হয়।

৩. অচির প্রকৃতির পীড়ায় ওষুধ প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম কি ?

সাধারণতঃ প্রত্যহ কয়েকমাত্রা করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োজনে ওষুধ ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়।

৪. চিররোগের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম কি ?

চিররোগের ক্ষেত্রে একমাত্রা ওষুধ প্রয়োগ করে তার ক্রিয়াফলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

৫. কখন বাহ্যিক প্রয়োগ বিধেয় ?

আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এবং ডুমুরাকৃতি আঁচিল বা অর্বুদের ক্ষেত্রে।

৬. প্লাসিবো কখন এবং কেন দেওয়া হয় ?

সাধারণতঃ চিররোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ওষুধটিকে নির্বিঘ্নে কাজ করার সুযোগ করে দিতে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের শক্তি ও মাত্রা

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র

কোন রোগীর ক্ষেত্রে তার লক্ষণাবলী সযত্নে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আমরা সদৃশনীতি অনুযায়ী একটি ওষুধ নির্বাচন করি এবং উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় তা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করি। ওষুধে বাঞ্ছিত ক্রিয়া করলে এটি প্রথম ব্যবস্থাপত্র। আমরা, ক্রমান্বয়ে অনেক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু যে ওষুধটিতে রোগীতে প্রথম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার অবস্থার ও লক্ষণের পরিবর্তনসাধন করে সেটি হল প্রথম ব্যবস্থাপত্র। এর পরবর্তী যাবতীয় ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র। হোমিওপ্যাথিতে তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যবস্থাপত্র বলে কিছু নেই। কেননা পরবর্তী যাবতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রকে অনুসরণ করে তার ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার জন্যই করা হয়। এজন্য দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বশর্ত হল (১) প্রদত্ত ওষুধটিতে ক্রিয়া করার মত যথেষ্ট সময় দিতে হবে এবং (২) পরিবর্তিত অবস্থায় প্রকৃত ব্যঞ্জনা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ, শক্তি ও মাত্রা

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র। কাজেই প্রথম ব্যবস্থাপত্রের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের যাবতীয় নিয়ম এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সকলক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার প্রবণতার পরিতৃপ্তি বিধানের জন্য উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রা নির্ণয় করতে হবে। কাজেই এ বিষয়ে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবুও দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে যেসকল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয় সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা হল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে সাধারণতঃ তিনপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় — প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, প্রদত্ত ওষুধের পুনঃপ্রয়োগ ব্যবস্থা এবং নতুন ওষুধের ব্যবস্থা।

১. প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

১.১ ওষুধ প্রয়োগে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি - ওষুধ সুনির্বাচিত হয়েছে অথচ রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটেছে। অনেক সময় এ বৃদ্ধি এত তীব্র হয় যে দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তিনটি কারণে এরূপ অবস্থা ঘটতে পারে — ওষুধটি খুব নিম্ন বা খুব উচ্চ শক্তিতে প্রযুক্ত হয়েছে, অথবা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে, কিংবা ঐ ওষুধের প্রতি রোগীর অত্যধিক প্রবণতা রয়েছে।

সাধারণ নিয়ম হল বৃদ্ধির সময় ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয়। অনেক সময় এ বৃদ্ধি আপনা থেকেই চলে যায়। তখন প্রথম ক্ষেত্রে ওষুধটি উপযুক্ত শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাত্রা ক্ষুদ্রতর করতে হবে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে সেই ওষুধটি অথবা অন্য একটি উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করে নিম্নশক্তিতে দীর্ঘ সময় অন্তর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

১.২ ওষুধ প্রয়োগের পর যদি রোগীতে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা রোগীতে পূর্বে কখনও দেখা যায়নি এবং রোগীর অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে থাকে তবে অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ওষুধ (antidote) প্রয়োগ করতে হয়। অনুচ্ছেদ — ২৪৯-২৫০। সাধারণতঃ প্রতিকারমূলক ওষুধটির ২০০ শক্তির ১ মাত্রা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। কখনও একাধিক মাত্রার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় কোন ওষুধের উচ্চশক্তি সেই ওষুধের নিম্নশক্তির ক্রিয়ার কুফলের প্রতিকার করতে পারে। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকায় বিভিন্ন ওষুধের অপপ্রয়োগজনিত কুফলের প্রতিকার করতে পারে এমন প্রচুর ওষুধ আছে। যেমন, অ্যাকোনাইট, কলচিকাম, মার্কারি, নেট্রামমিউর, সালফার ইত্যাদি ওষুধের ক্রিয়ার প্রতিকারার্থে যথাক্রমে সালফার, লিডাম, হিপার সালফার, নাক্সভমিকা, পালসেটিলা ইত্যাদি ওষুধ খুবই কার্যকারী হয়। স্টুয়ার্টক্লোজ-এর একটি রোগী বিবরণী দিয়ে বিষয়টি বোঝান হল।

স্টুয়ার্ট ক্লোজ বলছেন, রোগী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বার্ধক্যজনিত নানারকম ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য (senile dementia) তার দেখা দিয়েছিল। চিন্তা শক্তির দুর্বলতা, স্মৃতি ভ্রংশ, অসাড়ে মলমূত্র নিঃসরণ, ক্রমাগত অনিদ্রায় ভুগছিলেন। নিজের অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আচার আচরণে তিনি নম্র ছিলেন এবং পরিবারের অন্য লোকেদের অসুবিধা হতে পারে এমন কিছু তিনি করতেন না। তাঁর লক্ষণ অনুযায়ী একটি ওষুধ নির্বাচন করে সেটি ২০০ শক্তির কয়েকটি মাত্রা দিয়ে দিনে ২ বার করে খেতে পরামর্শ দিলাম।

তিনদিন পরে জরুরী ডাক পেয়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, চোখের মণি বিস্ফারিত, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এবং তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন। তিনি আমাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে রূঢ়ভাবে বললেন, আপনি অন্য রোগীর ওষুধ আমাকে দিয়েছেন যা খেয়ে আমার পেট ফুলে ফেটে যাচ্ছে। তিনি তার পরিধেয় সব জামাকাপড় খুলে ফেললেন, কিছুতেই তা আর পরতে রাজী হলেন না। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় ঘরে মহিলাদের সামনে পায়চারি করতে লাগলেন। এতে তিনি কোনরূপ লজ্জাবোধ করলেন না এবং সে অবস্থায় বাইরে বেড়িয়ে যেতে চাইলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণগুলোর ব্যঞ্জনা বুঝতে পারলাম। আপনারাও নিশ্চয়ই পেরেছেন। ওষুধটি ছিল হায়োসায়ামাস। অনুসন্ধানে জানা গেল ওষুধটি নির্দেশমত না খেয়ে তিনি ভুল করে দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর খেয়েছেন। তার ফলশ্রুতিতে তিনি হায়োসামাস ২০০ শক্তিতে প্রুভিং করছিলেন। বেলেডোনা ২০০ শক্তির একমাত্রাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এইসব অসুবিধাগুলো দূর করে দেয় এবং তিনি তাঁর পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান।[৪৮]

৪৮. Stuart Close - Ibid-page-136

২. পুনঃপ্রয়োগ (Repetition)

২.১ যতক্ষণ পর্যন্ত ওষুধটি ক্রিয়া করছে বলে মনে হয় এবং রোগীর ভাললাগা বোধ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ পুনঃপ্রয়োগ করা হয় না।

২.২ ওষুধে কাজ করেছে কিন্তু কিছুকাল পরে মূল লক্ষণগুলো আবার ফিরে আসে। লক্ষণগুলো তীব্রতার দিকে সামান্য বাড়তে বা কমতে পারে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত ওষুধটি পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। কেন্টের উপদেশ হল, প্রতিটি ওষুধকে একই শক্তিতে দুবার পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে, তারপর ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শক্তিতে যেতে হবে। যেমন ৩০, ২০০, ১হাজার, ১০হাজার, ৫০হাজার, লক্ষশক্তি ইত্যাদি। মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত ওষুধ থেকে যতটা সম্ভব উপকার আহরণ করা।

৩. নতুন ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্র

৩.১ পরিপূরক ওষুধের ক্ষেত্র — প্রদত্ত ওষুধের ক্রিয়ার ফলে কিছু লক্ষণ অন্তর্হিত হয়েছে, কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তখন অবশিষ্ট লক্ষণের ভিত্তিতে নতুন করে একটি ওষুধ নির্বাচন করতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে নতুন ওষুধটি পূর্বতন ওষুধের সমগোত্রীয় হয় এবং তার ক্রিয়া পরিপূরণ করে। এ ধরণের ওষুধকে পরিপূরক ওষুধ (complementary medicine) বলে। যেমন বেলেডোনা ক্যালকেরিয়া; নাক্সভমিকা সিপিয়া; সালফার ক্যালকেরিয়া ইত্যাদি। নতুন ওষুধটির শক্তি রোগীর তখনকার অবস্থা অনুযায়ী নির্ণয় করতে হয়। সাধারণতঃ এসকল ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি বা ১০০০ শক্তি থেকে শুরু করা হয়। কোন রোগীতে নাক্সভমিকা ২০০ শক্তি প্রয়োগে অধিকাংশ লক্ষণ চলে গিয়ে সালফারের লক্ষণ দেখা গেল। তখন প্রথমে সালফার ২০০ ১ মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরে সালফার ১ হাজার শক্তির একমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে। কোন শিশুতে বেলেডোনা প্রয়োগে তার যাবতীয় কষ্টের উপশম হয়ে যায়। কিছুকাল পর আবার একই লক্ষণ দেখা দেয়। পরপর এ অবস্থা চললে বুঝতে হবে শিশুতে কোন চিররোগের বিষ ক্রিয়াশীল রয়েছে। তখন সে অবস্থার প্রতিকারার্থে ক্যালকেরিয়া বা অন্য যে ওষুধই নির্বাচিত হোক না কেন তা উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তিতে (১ হাজার শক্তি থেকে) প্রয়োগ করতে হবে।

৩.২ জটিল চিররোগের ক্ষেত্রে একাধিক মায়াজমের সংমিশ্রণ থাকে। তখন ক্রমান্বয়ে যে মায়াজমের লক্ষণ ফুটে ওঠে সেই অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন করে উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

৩.৩ অন্তর্বর্তী ওষুধ (intercurrent remedy) — সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগেও রোগীতে অনেক সময় বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না, কিংবা আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। জীবনীশক্তির দুর্বলতার জন্য কিংবা অন্যকোন প্রতিবন্ধকতার জন্য এরূপ হয়ে থাকে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য এবং জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্য যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাকে অন্তবর্তী ওষুধ বলা হয়। জীবনী শক্তির দুর্বলতার প্রতিকারার্থে সাধারণতঃ কার্বোভেজ, চায়না, লরোসিরেসাস, ওপিয়াম ইত্যাদি ওষুধ এবং মায়াজমের বাধাদূর করার জন্য সালফার, থুজা এবং নোসোডস শ্রেণীর ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ওষুধগুলো নিম্নশক্তিতে (৬,৩০) প্রত্যহ ২বার করে কয়েকদিন প্রয়োগ করা হয়। প্রতিক্রিয়া শুরু হলেই প্রয়োগকাল দীর্ঘ করতে হয় কিংবা প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয়। পরে নির্বাচিত ওষুধটি আবার ক্রমশ নিম্নথেকে উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওষুধগুলো সাধারণতঃ উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্র মাত্রায় একবার প্রয়োগ করে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান হল।

এক মহিলার বিয়ের কিছুকাল পর থেকেই স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। দুর্বলতা, অক্ষুধা, উদাসীনতা, প্রচুর শ্বেত প্রদরস্রাবসহ বিভিন্ন উপসর্গে সে জর্জরিত হয়ে পরল। তার লক্ষ্মণসমূহ সিপিয়া থাকায় তাকে সিপিয়া বিভিন্ন শক্তিতে দেওয়া হল। সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল এবং অন্তঃসত্তা হল। কিন্তু তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হয়ে গেল। সে একেবারে শয্যাশায়ী হল। অনুসন্ধানে জানা গেল তার স্বামীর গণোরিয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকটি ইনজেকশন নেওয়ার পর ভাল হয়ে যায় এভং ডাক্তারের সম্মতি নিয়েই বিয়ে করে। তথাপি এরূপ বিপত্তি ঘটে গেল। এখানে স্বামীর গণোরিয়া চাপা দেওয়া হয়েছিল বলে যে স্তরে গণোরিয়া ছিল সেই দ্বিতীয় স্তরেই গণোরিয়া স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়েছে। কাজেই এই দোষের প্রতিকারার্থে প্রথমেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মেডোরিনাম ১ হাজার শক্তির ১ মাত্রা স্বামী ও

স্ত্রীতে প্রয়োগ করায় স্ত্রী ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে সিপিয়া উচ্চশক্তি তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে।

কেন্টের অনুগামীগণের অনেকে মনে করেন অন্তবর্তী ওষুধ বলে কিছু নেই। যখন দেখা যায় একটি ওষুধ বিভিন্ন শক্তিতে প্রয়োগ করেও বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না তখন প্রতিক্রিয়া আনার জন্য নতুন একটি ওষুধের প্রয়োজন হয়। এগুলো ঠিক অন্তবর্তী ওষুধ না বলে সেই মুহূর্তে সিমিলিমাম বলাই সঙ্গত।[৪১]

সারমর্ম

১. দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র কাকে বলে?

প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পরে যাবতীয় ব্যবস্থাপত্রকে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র বলে।

২. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয়ের নিয়ম কি?

প্রথম ব্যবস্থাপত্রের যাবতীয় নিয়ম দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?

প্রতিকারমূলক, প্রদত্ত ওষুধের পুনঃপ্রয়োগ, নতুন ওষুধ নির্বাচন।

৪. প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কি কি পন্থা অনুসরণ করা হয়?

প্রদত্ত ওষুধের ক্রিয়ার কুফল নষ্ট করার জন্য সেই ওষুধেরই উচ্চশক্তি অথবা প্রতিকারক অন্য ওষুধ প্রয়োগ।

---

৪১. Many pure Kentians hold that there is, or should be no such thing as intercurrent remedy, and that when, after a series of potencies of a remedy, a new remedy is called for to stirup or develop the case, this is not an intercurrent remedy but at that oment, the simillimum. Elizabeth Wright A Brief Study Course in Homoeopathy. Jain Publishing Co. 1983. Page 49.

৫. নতুন ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্র কি কি?

পরিপূরক ক্ষেত্র, প্রতিকারক ক্ষেত্র, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ক্ষেত্র।

৬. অন্তর্বতী ওষুধ কাকে বলে?

প্রদত্ত ওষুধে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া না হলে প্রতিক্রিয়া আনার জন্য অথবা মায়াজমের বাধা অপসারণের জন্য যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাকে অন্তর্বতী ওষুধ বলে।

৭. অন্তর্বতী ওষুধের শক্তি ও মাত্রা কিরূপ হবে?

জীবনীশক্তির দুর্বলতার জন্য প্রদত্ত অন্তর্বতী ওষুধ নিম্নশক্তিতে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। মায়াজমের বাধা অপসারণের জন্য প্রদত্ত অন্তর্বতী ওষুধে উচ্চশক্তিতে ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির পদ্ধতিকে হ্যানিম্যান নবতম পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। এ পদ্ধতি পুরনো পদ্ধতির সংস্কার নয়, এ দৃষ্টিভঙ্গির ও কর্ম পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। এ পরিবর্তন গুণগত। অতএব এ পদ্ধতির ওষুধ প্রয়োগকালে এ পদ্ধতির যে সকল নিয়মনীতি আছে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। শততমিক শক্তির ওষুধের নিয়মাবলী এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় — একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

ওষুধ প্রয়োগ প্রণালী

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুব প্রয়োগের নিমিত্ত হ্যানিম্যান ছ'টি শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হল ঃ

১. প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নসহকারে সর্বতোভাবে সদৃশ একটি ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। (যেহেতু একই ওষুধ দিনের পর দিন প্রয়োগ করা হয় সেজন্য সম্পূর্ণ সদৃশ ওষুধ না হলে ওষুধজ রোগ সৃষ্ট হয়ে রোগীর অনিষ্ট হতে পারে)

২. প্রদেয় ওষুধটি উচ্চশক্তিতে প্রদান করতে হবে। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ সকলই উচ্চশক্তি সম্পন্ন।

৩. ওষুধ সর্বদা জলে দ্রব করে দিতে হবে, শুষ্ক অবস্থায় সাধারণতঃ দেওয়া যাবে না। কেবলমাত্র অল্পদিনের অনুগ্র ব্যাধির ক্ষেত্রে যেখানে একমাত্রা ওষুধেই কাজ হয়ে যাবে বলে মনে হয় সেখানে একটি শুষ্ক অণুবটিকা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে একাধিক মাত্রার প্রয়োজন হবে, যা প্রায়ই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে

জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এতে ওষুধ অনেকগুলো স্নায়ুকে স্পর্শ করে বলে অধিক কার্যকরী হয় এবং পরিবর্তিত শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

৪. প্রতিটি মাত্রা যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হতে হবে।

৫. দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য ওষুধটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

৬. প্রত্যেকবার ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে ওষুধের শক্তিকে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য ওষুধপূর্ণ শিশিটি অন্তত ২বার ঝাঁকি দিতে হবে। এতে সদৃশ ওষুধদ্বারা জীবনীশক্তি প্রভাবিত হলেও কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না, একই ওষুধ অতি দ্রুত পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সর্বদা দেখা যায়। অর্থাৎ ওষুধের অনুবটিকা শুষ্ক অবস্থায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাত্রা যেমন প্রয়োগ করা যাবে না তেমনি তরল অবস্থায়ও শক্তি পরিবর্তন না করে প্রয়োগ করা যাবে না।[৫০]

অন্যান্য শর্তাবলী

৭. প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী জলের পরিমাণ স্থির করতে হবে। রোগী যদি অতিমাত্রায় অনুভূতিশীল হয় তাহলে মাত্রা আরও স্বল্প করতে হয়।

৮. এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম আছে। সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিনটি প্রধান চিররোগবিষ (chronic miasm) চিকিৎসাকালীন যখন তাদের লক্ষণ চর্মের উপর বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সোরার ক্ষেত্রে সদ্য প্রকাশিত চুলকনা, অচিকিৎসিত স্যাঙ্কার (প্রজনন যন্ত্রে, যোনিদ্বারে, মুখগহ্বর কিংবা ঠোঁট প্রভৃতি স্থানে) এবং ডুমুরাকৃতি অর্বুদ তখন প্রত্যহ (সম্ভবমত দিনে কয়েকবারও) একেবারে শুরু হতেই বৃহৎমাত্রায় সুনির্দিষ্ট ওষুধ ক্রমোন্নয়ন করে দিলে তা শুধু যে সহনীয় হবে তা নয় প্রয়োজনও সিদ্ধ করবে। এই পন্থা অনুসরণ করলে অভ্যন্তরীণ লুক্কায়িত ব্যাধির ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের দরুন ব্যাধিটি ধ্বংস হলেও যেকোন ওষুধজনিতকৃত্রিক ব্যাধি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।[৫১]

---

৫০. অনুচ্ছেদ ২৪৬-২৪৭ এবং পাদটীকা ১৩৩.

৫১. অনুচ্ছেদ ২৮২ এবং পাদটীকা ১৬৩.

৯. এছাড়া ওষুধ কখনও ফোঁটা মাত্রায় বা বড় অণুবটিকা প্রয়োগ করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রেই পোস্তদানার মত একটি অণুবটিকা (১০নং অণুবটিকা) ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ একটি অণুবটিকা ব্যবহার করা হয়, কদাচিৎ ২টি বা ৩টির প্রয়োজন হয়।

১০. চিকিৎসার কোন ক্ষেত্রে একই সময়ে একটির বেশী ওষুধ প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনুচ্ছেদ ২৭৩।

সেবন করার জন্য ওষুধ প্রস্তুত বিধি

১. একটি চার আউন্সের নতুন শিশি ও কর্ক নিতে হবে। এটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পুরনো শিশি বা কর্ক ব্যবহার করা যাবে না।

২. এই শিশির তিন চতুর্থাংশ পরিস্রুত জলে পূর্ণ করতে হবে।

৩. নির্বাচিত ওষুধটির একটি অণুবটিকা (১০ নং অনুবটিকা) ২/৩ গ্রেণ দুগ্ধ শর্করার সঙ্গে চূর্ণ করে শিশিতে দিতে হবে।

৪. ওষুধের ধর্ম অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং জলের পচন নিবারণের জন্য ৫ থেকে ১০ ফোঁটা সুরাসার (রেক্টিফায়েডস্পিরিট, R.S) দিতে হবে।

৫. এবার দ্রবণটি ১০/১২ বার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে উত্তমরূপে মেশাতে হবে। রোগীর গ্রহণের জন্য এবার ওষুধ প্রস্তুত হল।

রোগীর ওষুধ গ্রহণ পদ্ধতি

১. ওষুধের শিশিটিকেউত্তমরূপে ঝাঁকি দিয়ে ১ টেবিল চামচ বা চার ড্রাম ওষুধ নিয়ে অপর একটি গ্লাসে ৪ আউন্স জলে (৭/৮ টেবিল চামচ) মেশাতে হবে।

২. এবার চামচ দিয়ে উত্তমরূপে নেড়ে তা থেকে এক বা অবস্থা অনুযায়ী একাধিক চামচ রোগীকে সেবন করার জন্য দিতে হবে।

৩. রোগী যদি অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ হয় তা হলে এরূপ মাত্রায়ও বৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই দ্রব থেকে ১ চামচ ওষুধ নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি গ্লাসে ৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করে চামচদিয়ে নেড়ে ১ চামচ বা একাধিক চামচ সেবন করতে দিতে হবে।

৪. এমন অত্যধিক অনুভূতিশীল রোগী আছে যে অনুরূপভাবে প্রস্তুত তৃতীয় কিংবা চতুর্থ গ্লাসের প্রয়োজন হতে পারে।

৫. ওষুধের শিশি হতে এভাবে প্রত্যেকবার নতুন করে জলে মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে ওষুধ প্রস্তুত করে নিতে হবে।

৬. এভাবে প্রস্তুত করা ওষুধের বাকীটা ফেলে দিতে হবে।

৭. প্রতিমাত্রা ওষুধ গ্রহণের পূর্বে রোগীর প্রবণতা অনুযায়ী শিশিটি সজোরে ৮,১০ বা ১২ বার ঝাঁকি দিতে হবে। অতি অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ৮ বার, মাঝারি অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ১০ বার এবং কম অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ১২ বার ঝাঁকি দিতে হবে।

৮. রোগীকে বলে দিতে হবে ওষুধে কাজ করলে প্রয়োগকাল দীর্ঘ করতে হবে।

ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতি

হ্যানিম্যান প্রতিটি ক্ষেত্রে ৪ আউন্স শিশিতে ৩/৪ অংশ পরিস্রুত জলে পূর্ণ করে ওষুধ প্রস্তুত করতে বলেছেন। এ থেকে এক টেবিল চামচ ওষুধ নিয়ে আরেকটি গ্লাসে ৪ আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা থেকে ১ চামচ গ্রহণ করে বাকীটা ফেলে দিতে বলেছেন। কিন্তু শিশি, কর্ক, পরিস্রুত জল, স্পিরিট ইত্যাদির মূল্যের জন্য এবং সংগ্রহ ও ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। এজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

১. ৪ মাত্রা ওষুধের ক্ষেত্রে ১/২ আউন্স (১৫ মিলি), ৮ মাত্রা পর্যন্ত ওষুধের ক্ষেত্রে ১ আউন্স (৩০ মি.লি.), ১২ মাত্রা ওষুধের ক্ষেত্রে ২ আউন্স (৬০ মি. লি.) এবং ২০ মাত্রা অবধি ওষুধের ক্ষেত্রে ৪ আউন্স (১২০ মি.লি.) শিশি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ওষুধ গ্রহণের জন্য রোগী তার পাণীয় জল ব্যবহার করতে পারে।

৩. রোগী অতি অনুভূতিশীল হলে ১ কাপ জলে, নতুবা আধকাপ জলে ওষুধ মেশাতে হবে।

৪. অতি অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ১ চামচ, অন্য ক্ষেত্রে ১ চামচ থেকে ২ চামচ ওষুধ খেতে দিতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে ১ চামচ ওষুধ খেতে দিতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম হল আধকাপ জলে ১ দাগ ওষুধ মিশিয়ে ১ চামচ (কখনও ২ চামচ) ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। বাকীটা ফেলে দিতে হবে।

কতবার ওষুধ গ্রহণ করতে হবে

১. অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে প্রতিঘন্টায় বা আরও কম সময়ে।

২. অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে ২ থেকে ৬ ঘন্টা অন্তর।

৩. চিররোগের ক্ষেত্রে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একবার। - অনুচ্ছেদ ২৪৮

বৃহৎ মাত্রায় ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্র

তিনটি প্রধান মায়াজমের ক্ষেত্রে যখন তাদের লক্ষণ চর্মের উপর বিদ্যমান থাকে তখন বৃহমাত্রায় ওষুধ প্রত্যহ বা দিনে কয়েকবার প্রয়োগ করতে হয়।

বাহ্যিক ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্র

এর মধ্যে ডুমুরাকৃতি অর্বুদের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরিক ওষুধ গ্রহণের সঙ্গে সে ওষুধের বাহ্যিক প্রয়োগ করলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়।

কতদিন পর্যন্ত একটি ওষুধ ব্যবহার করা চলে

যতদিন পর্যন্ত উন্নতি অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে এবং নতুন কোন লক্ষণ দেখা না যায় যা জীবনে পূর্বে কখনও অনুভূত হয়নি ততদিন পর্যন্ত ওষুধ পরিবর্তন করা চলবে না এবং ওষুধটি ক্রমোন্নত শক্তিতে প্রয়োগ করে যেতে হবে।

ওষুধের শক্তিক্রম শেষ হয়ে গেলে

১. সাধারণতঃ ওষুধ ৩০ শক্তি অবধি পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে ৫০ শক্তি অবধি পাওয়া যায়। উচ্চতম শক্তিক্রম শেষ হয়ে গেলে এবং তখনও সে ওষুধের লক্ষণ বর্তমান থাকলে আবার নিম্নশক্তি থেকে শুরু করতে হয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র

পুনঃপ্রয়োগের ক্ষেত্র (Repetition)

১. অচিররোগের চিকিৎসাকালীন যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট, ক্রম উন্নতিশীল এবং ক্রম বর্ধমান উপশম বর্তমান থাকে ততক্ষণ কোন ওষুধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। কারণ প্রদত্ত ওষুধের উপকার প্রদান করা তখন সম্পূর্ণতার পথে চলছে। অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে এরূপ প্রায়ই দেখা যায়।[৫২]

২. প্রথম ওষুধের সবগুলো মাত্রা শেষ হয়ে গেলে এবং তখনও সে ওষুধের লক্ষণ বর্তমান থাকলে পরবর্তী শক্তির ওষুধ অনুরূপভাবে প্রস্তুত করে রোগীকে আগের নিয়মে সেবন করার জন্য দিতে হবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রদত্ত ওষুধের লক্ষণ বর্তমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ওষুধ ক্রমশঃ উচ্চতর শক্তিতে প্রয়োগ করে যেতে হবে। যদি ব্রায়োনিয়া ০/৩ প্রথমবারের ওষুধ হয় তবে পরবর্তী ওষুধ হবে ০/৪, ০/৫ .... ০/১০ ইত্যাদি। প্রয়োজনে দু একটা শক্তিক্রম বাদ দেওয়া যেতে পারে।

৩. এভাবে প্রয়োগ করতে করতে যখন সাধারণ উন্নতির সঙ্গে রোগীতে একটি বা কতিপয় পুরাতন প্রাথমিক লক্ষণের মৃদু পুনঃ প্রকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে আরোগ্য নিকটবর্তী হয়েছে। এ দ্বারা বুঝতে হবে প্রাকৃতিক ব্যাধি হতে মুক্ত জীবনীশক্তির ওষুধজনিত ব্যাধির ভোগ শুরু হয়েছে। একে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলা হয়।

৪. তখন ৮, ১০ কিংবা ১৫ দিনের ওষুধ না দিয়ে শুধু দুগ্ধ শর্করার কতগুলো পুরিয়া (প্লাসিবো) দিয়ে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শেষের দিকে আগত উপসর্গগুলো যদি ওষুধজনিত হয় তাহলে এগুলো কয়েকঘন্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই তিরোহিত হবে। যদি আর কোন লক্ষণ অবশিষ্ট না থাকে তবে বুঝতে হবে রোগী সম্ভবতঃ আরোগ্য লাভ করেছে।

---

৫২ Every perceptively progressive and strikingly increasing ameliration during treatment is a condition which as long as it lasts, completely precludes every repetition of administration of any medicine what so ever, becauce all the good the medicine taken continues to effect is now hastening to wards it's comptetion. This is not infrequently the case in a cute disease. - Aphor. 246

৫. যদি কিছুকাল পরে রোগীর পূর্বেকার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু আবার ফিরে আসে তাহলে বুঝতে হবে রোগ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি। সেক্ষেত্রে উচ্চতম শক্তিদ্বারা পুনরায় পূর্বের মত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

৬. চিকিৎসাকালে, বিশেষকরে চিররোগের চিকিৎসায় প্রথম মাত্রাতেই যদি হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ পীড়ার মূল লক্ষণগুলোর সুস্পষ্ট বৃদ্ধি ঘটে তবে বুঝতে হবে অধিকমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের জন্যই এরূপ ঘটেছে। তখন কিছুকাল অপেক্ষা করলে এ সকল কষ্ট আপনা থেকেই চলে যায়।

৭. ওষুধ নির্বাচন সঠিক হয়েছে, ক্ষুদ্রমাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে অথচ রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটেছে। তখন বুঝতে হবে ওষুধের শক্তি অধিক হয়েছে। অনেক চিকিৎসক প্রথমেই ১০, ২০ বা ৩০ শক্তির ওষুধ প্রয়োগ করেন। তখন এরূপ অবস্থা ঘটতে পারে। কিছুকাল অপেক্ষা করলে এ অবস্থা কেটে যায়। তারপর ওষুধ নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটলে অবিলম্বে প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৮. ওষুধ প্রয়োগে যদি রোগীর কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব না হয়ে বেড়েই চলে তবে বুঝতে হবে ওষুধ ভুল নির্বাচিত হয়েছে। কষ্ট যদি খুব বেশী তীব্র না হয় তবে অবিলম্বে যত্নসহকারে নতুন ওষুধ নির্বাচন করে আগের বর্ণিত নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। বৃদ্ধির লক্ষণ যদি বেশী পরিমাণে প্রকাশ পায় তবে কোন প্রতিষেধক ওষুধ প্রথমে প্রয়োগ করে পরে সদৃশ ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৯. ওষুধ সুনির্বাচিত হয়েছে, শক্তি ও মাত্রা যথোচিত হয়েছে বলে মনে হয়, তথাপি হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে রোগী অত্যধিক অনুভূতিশীল। তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় গ্লাস থেকে আরও ক্ষুদ্রমাত্রায় এবং দীর্ঘ সময় অন্তর ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

১০. অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে রোগের কিছুটা উপশম হলেও সে উপশম ক্ষণস্থায়ী হলে এবং রোগ লক্ষণ থেকে গেলে দু থেকে ছঘন্টা অন্তর এবং খুব জরুরী ক্ষেত্রে একঘন্টা অন্তর বা আরও শীঘ্র ওষুধ প্রদান করতে হবে। চিররোগের ক্ষেত্রে প্রত্যহ কিংবা একদিন অন্তর ওষুধ পরিবর্তিত শক্তিতে প্রদান করে যেতে হবে।

১১. অচির রোগের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায় যা শীঘ্রই আপনা থেকে কমে যায়। মাত্রার পরিমাণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র করলে এ বৃদ্ধি প্রায় অনুভূত হয় না। চির রোগের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি চিকিৎসার শেষের দিকে দেখা যায়। তখন ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে হয়।

১২. এমন কতগুলো ওষুধ আছে, যেমন ইগ্নেসিয়া, ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স এবং কখনও কখনও বেলেডোনা, যাদের মানুষের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন করার ক্ষমতা প্রধানতঃ পর্যায়শীল ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মুখ্যক্রিয়ায়ই দুটি পরস্পর বিপরীত লক্ষশ থাকে। এসকল ক্ষেত্রে সদৃশ ওষুধ প্রয়োগ করে উপকার না পেলে আরোগ্যক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সেই ওষুধ স্বল্পমাত্রায় পুনঃপ্রয়োগ (অচির পীড়ার ক্ষেত্রে কয়েকঘন্টার মধ্যেও) করা যেতে পারে। — অনুচ্ছেদ ২৫১.

১৩. যদি রোগীর লক্ষণ পরিবর্তন হয়ে নতুন লক্ষশ দেখা যায় যা রোগী পূর্বে কখনও অনুভব করেনি তবে পূর্বের ওষুধটির পরিবর্তে অন্য একটি সদৃশ ওষুধ নির্বাচন করে একইভাবে পুনঃ পুনঃ মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ২৪৬ - ২৪৭, ২৭২ - ২৮৩).

ঘ্রাণের সাহায্যে ওষুধ গ্রহণের পদ্ধতি (Olfaction)

১. একটি এক আউন্সের নতুন শিশি নিতে হবে।

২. এতে এক ফোঁটা পরিস্রুত জল দিতে হবে যাতে অনুবটিকাটি গুলে যায়।

৩. তাতে একটি ১০নং অণুবটিকা দিতে হবে।

৪. এরপর শিশিটি তিন চতুর্থাংশ সুরাসারে পূর্ণ করতে হবে।

৫. ভালভাবে ঝাঁকি দিয়ে ওষুধটি মেশাতে হবে।

রোগীর করণীয়

১. শিশিটি ৮/১০/১২ বার (প্রবণতা অনুযায়ী) ঝাঁকি দিতে হবে।

২. ছিপিটি খুলে এক নাসারন্ধ্রের নিকট ধরে ঘ্রাণ নিতে হবে। এক সেকেন্ডের মত ঘ্রাণ নিয়ে ছিপি বন্ধ করতে হবে।

৩. শিশিটি আবার ৮/১০/১২ বার ঝাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় নাসারন্ধ্রেএক সেকেন্ড সময় ঘ্রাণ নিতে হবে।

৪. অচিররোগের ক্ষেত্রে প্রতি ২/৪ বা ৬ ঘন্টা অন্তর ঘ্রাণ নেওয়া যায়। ক্রনিক পীড়ার ক্ষেত্রে প্রতি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে ঘ্রাণ নেওয়া যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৪৮

কতশক্তি থেকে শুরু করতে হবে

হ্যানিম্যান সকল ক্ষেত্রেই ওষুধের নিম্নতম ক্রম (lowest degree of dynamization) থেকে চিকিৎসা শুরু করতে বলেছেন। এই নিম্নতর ক্রম ব্যক্তিগত প্রবণতার উপর নির্ভর করে, সকল ক্ষেত্রে ০/১ নয়। কেননা আরোগ্য বিধান করতে হলে ওষুধ শক্তিকে রোগ শক্তির স্তরে উন্নত করতে হবে এবং শক্তিতে কিছুটা বলবত্তর হতে হবে। কাজেই কারোর যদি প্রবণতার স্তর অনুযায়ী ০/১২ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহলে ০/১ থেকে আরম্ভ করলে সে স্তরে পৌঁছতে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে যাবে। এজন্য নিম্নক্রম বলতে সাধারণতঃ ০/১ থেকে ০/৬ ধরা হয় এবং অচিররোগে ০/২ বা ০/৩ থেকে এবং চিররোগে ০/৫ বা ০/৬ বা তারও উচ্চতরক্রম থেকে শুরু করা হয়। অতি অনুভূতিশীল রোগীর ক্ষেত্রে ০/১ থেকেশুরু করাই বিধেয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্রের শক্তি

১. দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্রের ওষুধটি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে ক্রমোন্নত শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও পরের শক্তি সকলক্ষেত্রে ঠিক তার অব্যবহিত পরের শক্তি বুঝায় না। অর্থাৎ ০/৩-এর পর ০/৪ শক্তিই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। ২/১টি শক্তিক্রম বাদও দেওয়া যেতে পারে, বিশেষতঃ চিররোগের ক্ষেত্রে। সাধারণতঃ একটি বা দুটি শক্তিক্রম অনেক সময় বাদ দেওয়া হয়। কেহ কেহ জোড় সংখ্যা ধরে, কেহ বিজোড় সংখ্যা ধরে অগ্রসর হন। যেমন ০/২, ০/৪, ০/৬ ইত্যাদি কিংবা ০/৩, ০/৫, ০/৭ ইত্যাদি। তবে উচ্চতর শক্তির ক্ষেত্রে ক্রমগুলো খুব বেশী বাদ দেওয়া হয়না।

এভাবে শক্তিক্রম বাদ দেওয়ার কারণ

১.১. দ্রুত সম্ভাব্য প্রবণতার স্তরে পৌছান।

১.২. প্রতিবারে ওষুধ গ্রহণের পূর্বে ঝাঁকি দেওয়ায় শক্তির কিছুটা পরিবর্তন হয়। কোন রোগীর কোন শক্তির ওষুধের ১২ মাত্রা ব্যবস্থা করলে শেষ মাত্রা ব্যবহারের সময় ওষুধটি ১২০ বার ঝাঁকি দেওয়া হয়। তাতে শক্তির বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়।

২. দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্রে যদি নতুন কোন ওষুধের ব্যবস্থা হয় তবে তার শক্তি কত থেকে শুরু করা হবে? প্রথম ব্যবস্থা পত্রে যদি লাইকোপডিয়াম ০/৩ থেকে ০/১২ পর্যন্ত প্রয়োগ করার পর সালফারের লক্ষণ আসে তবে কতশক্তিতে তা প্রয়োগ করা হবে? মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র ও প্রথম ব্যবস্থা পত্রের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র। কাজেই একে নতুন ওষুধ হিসাবে পুনঃ বিবেচনা করতে হবে এবং যথারীতি নিম্নক্রম থেকে শুরু করতে হবে। কেননা নতুন এই ওষুধটির ক্রিয়াক্ষেত্র তখনও অনাক্রান্ত রয়েগেছে। এক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনা করে ০/৬ বা যে কোন শক্তি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

সারাংশ

১. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের শর্ত কি?

ওষুধটি সর্বতোভাবে সদৃশ হতে হবে, উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োগের পূর্বে ওষুধপূর্ণ শিশিটি সজোরে কয়েকবার ঝাঁকি দিতে হবে।

২. কত শক্তিতে চিকিৎসা শুরু করা উচিত?

০/১ থেকে ০/৬ শক্তির মধ্যে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন শক্তিতে।

৩. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের ওষুধের শক্তি কত থেকে শুরু করতে হবে?

প্রথম ব্যবস্থাপত্রের মত ০/১ থেকে ০/৬ যেকোন শক্তি থেকে।

৪. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী কিরূপ?

২ আউন্স শিশির ৩/৪ অংশ জলে পূর্ণ করে তাতে ১টি অনুবটিকা দিয়ে ৫ ফোঁটা স্পিরিট দিয়ে ভাল করে নেড়ে ৮/১০ টি দাগ কেটে রোগীকে দিতে হবে।

৫. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ গ্রহণ প্রণালী কিরূপ?

আধ কাপ জলে ১ দাগ ওষুধ মিশিয়ে ১ থেকে ২ চামচ খেতে হবে বাকীটা ফেলে দিতে হবে। ওষুধ গ্রহণের পূর্বে শিশিটি ১০ বার ঝাঁকি দিতে হবে।

৬. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধের হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি কখন দেখা যায়?

অচিররোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রথম দিকে এবং চিররোগের ক্ষেত্রে শেষের দিকে।

৭. ওষুধজ বৃদ্ধি কখন দেখা যায়?

শক্তি বা মাত্রা বেশী হলে এবং রোগী অত্যন্ত অনুভূতিশীল হলে।

৮. বৃদ্ধি দেখা গেলে করণীয় কি?

ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রেখে অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া।

শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের তুলনামূলক বিচার

শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিকশক্তির ওষুধের তুলনামূলক বিচার

অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে হ্যানিম্যান আদর্শ আরোগ্য বিধানের যে শর্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বাস্তব ক্ষেত্রে তা কার্যে রূপায়িত করতে হ্যানিম্যানকে বহু বছর নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবশেষে জীবন সায়াহ্নে তিনি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হন। তারই ফলশ্রুতি পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের আবিষ্কার। কাজেই সার্থকভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে হলে এ পদ্ধতির প্রকৃত লক্ষ্য ও প্রয়োগ প্রণালী যেমন জানতে হবে তেমনি শততমিক শক্তির ওষুধের সঙ্গে এর সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এ বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল।

বিষয়	শততমিক শক্তির ওষুধ	পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ
ক. <u>প্রস্তুত প্রকরণগত</u> ১. ওষুধ ও মাধ্যমের অনুপাতও ঝাঁকির সংখ্যা	১: ১০০-১০	১: ৫০,০০০-১০০
২. শক্তিকরণে ওষুধের পরিমাণ	২. তরল ওষুধের ১ ফোঁটা	২. পোস্তদানার মত (১০ নং) একটি অণুবটিকা

৩. শক্তিগুলোর ক্রম	৩. অবিচ্ছিন্ন ক্রম অনুযায়ী তৈরী হয় না।	৩. গাণিতিক ক্রম তৈরী হয়।
৪. শক্তির ক্রমের সংখ্যা	৪. ১২টি — ৩,৬,১২,৩০,২০০ ৫০০, ১এম, ১০ এম ৫০ এম, সি.এম, ডি.এম ও এম.এম তন্মধ্যে সি.এম.ডি.এম ও এম.এম শক্তির ওষুধ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ৫০০ শক্তির ওষুধ কদাচিৎ পাওয়া যায়।	৪. ৩০টি — ১থেকে ৩০ শক্তি। কিছু কিছু ওষুধ ৫০ শক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়।
খ. গুণগত	১. ওষুধের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না।	১. অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।
	২. কোন কোন ওষুধ ক্রিয়া করতে দীর্ঘ সময় লাগে।	২. ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া করে।
	৩. প্রাথমিক ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়, প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। ফলে কষ্টভোগ কাল দীর্ঘ হয়।	৩. প্রাথমিক ক্রিয়া স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। প্রতিক্রিয়া মৃদু হয়, কষ্টভোগকাল স্বল্পতম হয়।
	৪. শক্তি নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন	৪. শক্তি নির্ণয় সহজ। সকলক্ষেত্রেই নিম্নতম শক্তির ক্রম থেকে শুরু করতে হয়।
	৫. মাত্রা নির্ণয় কঠিন। প্রয়োজন বোধে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।	৫. মাত্রা নির্ণয় সহজ। প্রয়োজনে মাত্রাকে ইচ্ছামত ক্ষুদ্র করা যায়।

গ. প্রধান বৈশিষ্ট্য	১. সকলক্ষেত্রে প্রাথমিক বৃদ্ধি দেখা যায়, যা বাঞ্ছিত। তবে কখনও এ বৃদ্ধি অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং রোগীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তখন চিকিৎসকের বিশেষ কিছু করার থাকে না। রোগীকে হয় সহ্য করতে হবে নয়ত অন্য প্যাথির সাহায্য নিতে হবে।	১. অচিররোগের ক্ষেত্রে প্রথমে অতি সামান্য বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে, যা আপনা থেকে চলে যায়। চিররোগের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি শেষের দিকে দেখা যায়, যা ওষুধ বন্ধ করলেই চলে যায়। এ অত্যন্ত সুলক্ষণ। এতে বোঝা যায় আরোগ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছন সম্ভব হয়েছে। আর যদি কোন কারণে বৃদ্ধি তীব্র হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
	২. বৃদ্ধি কবে কখন কিভাবে দেখা যাবে, তা অনুকূল হবে না প্রতিকূল হবে এবং কতদিন স্থায়ী হবে তা আগে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই এবং বোঝা গেলেও বিশেষকিছু করার থাকে না। অর্থাৎ ওষুধ প্রয়োগের পর চিকিৎসার উপর চিকিৎসকের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।	২. বৃদ্ধি কখন কিভাবে হবে তা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট। চিকিৎসার সকল পর্যায়ে চিকিৎসার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে, পুণঃ প্রয়োগ করতে বা নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন
	৩. চর্মরোগ, এলার্জী জাতীয় রোগ এবং ইডিওসিনক্রেটিক রোগীর ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে।	৩. মাত্রার পরিমাণ কমিয়ে প্রতিক্রিয়া মৃদুতম করা যায়।

	৪. যেখানে গঠনগত পরিবর্তন হয়েছে কিংবা পতন বা অন্তিম অবস্থার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।	৪. সকল রোগের সকল অবস্থায় শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে এবং মুমূর্ষুদের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলে। ফলে আপাত অনারোগ্য রোগীর ক্ষেত্রেও আরগ্যের আশা দেখা যায়।
	৫. শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ কলায় নানাবিধ সমস্যা	৫. এ বিষয়ে সকলসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।
ঘ. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র	১. ওষুধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলে। এজন্য ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। পরে ব্যবস্থা নিতে হয়। এজন্য দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। লাইকোপডিয়াম নেট্রামমিউর সালফার ইত্যাদি গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের ২০০ শক্তির একমাত্রা প্রয়োগ করেও আমাদের অন্তত ১ সপ্তাহ থেকে ৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিশেষ কিছু করার থাকে না।	১. দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় লাইকোপ-ডিয়াম, নেট্রামমিউর সালফার ইত্যাদি গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের ক্রিয়া ফল আমরা ২/১দিনের মধ্যে বুঝতে পারি এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারি।
	২. রোগের বৃদ্ধি বা উপশমের সময় পুণঃপ্রয়োগ নিষিদ্ধ	২. কেবলমাত্র অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে উপশম যদি দৃষ্টি আকর্ষক, ক্রমবর্ধমান থাকে তবেই পুণঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অন্য সকল ক্ষেত্রে

		ওষুধ নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুণঃপ্রয়োগ করতে হবে। চিররোগের চিকিৎসার শেষের দিকে বৃদ্ধি দেখা গেলে পুণঃপ্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয়
	৩. উপশামক (Palliative) চিকিৎসা কঠিন।	৩. উপশামক চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করা যায় এবং তা কার্যকরীও হয়।
৬. আরোগ্যের সময়	১. বৃদ্ধি উপশমের মধ্যদিয়ে চলে বলে আরোগ্যক্রিয়া সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়।	১. বৃদ্ধি নেই বললেই চলে। রোগীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ বা ওষুধের শক্তির পরিবর্তন করে প্রয়োগ করা হয়। ফলে আরোগ্য ক্রিয়া অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ বা আরও কম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
	২. আরোগ্যক্রিয়া সুসম্পন্ন হল কি না এবিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার	২. অচিরপীড়ার ক্ষেত্রে সামান্য বৃদ্ধির পর উপশম বোধ আরোগ্য সূচনা করে। চিররোগের চিকিৎসায় ক্রমোন্নতির পর বৃদ্ধি আরোগ্যের সূচনা করে। এমন নিশ্চিত প্রমাণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিরল।

অসুবিধা

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের অনেক সুবিধা থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের কিছু অসুবিধা রয়েছে। বহুল প্রচার ও ব্যবহারে এ সকল অসুবিধা দূর হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এ অসুবিধাগুলোর কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. এ পদ্ধতিতে সকল ওষুধ পাওয়া যায় না। সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন ওষুধই বেশী পাওয়া যায়। তবে এ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

২. বিশেষ কয়েকটি দোকান ছাড়া এ ওষুধ পাওয়া যায় না। কলকাতার মত শহরেও ৩/৪টি প্রতিষ্ঠান ছাড়া এ ওষুধ প্রস্তুত ও বিক্রি হয় না। মফঃসল অঞ্চলে এ ওষুধ পাওয়া যায় না বললেই চলে। পাওয়া গেলেও গ্রাম হিসাবে বিক্রি হয় না, মাত্রা হিসাবে বিক্রি হয়।

৩. ওষুধ ব্যবহারের জন্য প্রতিবারে নতুন শিশি ও কর্ক, পরিস্রুত জল ও সুরাসার প্রয়োজন হয়। এ সংগ্রহ করা যেমন কষ্টকর তেমনি ব্যয়সাধ্য।

৪. রোগীদের পক্ষে ওষুধ ব্যবহারে কতগুলো অসুবিধা দেখা দেয়।

৫. প্রতিটি ওষুধের শক্তির ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয় বলে প্রচুর ওষুধের স্টক রাখতে হয়। প্রতিটি ওষুধ ১ থেকে ৩০ শক্তি রাখতে হলে ৫০টি ওষুধ রাখতে হলে ১৫০০ ওষুধ ভর্তি শিশি রাখতে হবে। এ যেমনি ব্যয়বহুল তেমনি রাখার সমস্যাও রয়েছে।

৬. অধিকাংশ ওষুধ ৩০ শক্তির বেশী পাওয়া যায় না।

৭. এছাড়া চিকিৎসকের মধ্যে এ বিষয়ে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত জ্ঞানার্জন করা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করার ক্ষেত্রে উৎসাহের বিশেষ অভাব রয়েছে। ওষুধ প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী সংস্থাগুলোরও এ বিষয়ে আগ্রহের অভাব রয়েছে।

তবে এসকল অসুবিধার চেয়ে সুবিধা অনেক বেশী। এজন্য এ পদ্ধতির প্রচলন ক্রমবর্ধমান।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়

১. মহান শিক্ষক-চিকিৎসক কেন্ট পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহার করার সুযোগ পাননি। এজন্য কেন্টের দ্বাদশ পর্যবেক্ষণ পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে কেন্টের অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ থাকলে হোমিওপ্যাথি সমৃদ্ধ হত।

২. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ অবিষ্কারের পর শততমিক শক্তির ওষুধ পরিত্যক্ত হয়নি। অবস্থা অনুযায়ী দু'প্রকার ওষুধেরই প্রায়োজন আছে। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ আবিষ্কারের পরও হ্যনিম্যান ক্ষেত্র বিশেষে শততমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন। তবে তার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়ে আনছিলেন।

৩. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ হ্যানিম্যান প্রকৃতই প্রচলন করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোনরূপ অবকাশ নেই।

৪. রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ আমাদের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এ আমাদের অনেক দুরতিক্রম্য বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। এর সম্ভাবনা অপরিসীম। প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা, আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীতে প্রয়োগ করা এবং প্রয়োগলব্ধ অভিজ্ঞতা অন্য চিকিৎসকের সঙ্গে বিনিময় করা। তবেই হ্যানিম্যানের স্বপ্ন সার্থক হবে এবং হোমিওপ্যাথি পূর্ণ মহিমায় এক বৈপ্লবিক চিকিৎসা পদ্ধতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রোগী বিবরণী বিভাগ

ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ বিদ্যা কেমন ভাবে প্রয়োগ করলে নিশ্চিতভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয় কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এবার আমরা তা বোঝাতে চেষ্টা করব। একটা দৃষ্টান্ত অনেক বলা ও না বলা কথাকে সরাসরি স্পষ্টভাবে মূর্ত করে তোলে। এই দৃষ্টান্তগুলোকে আদর্শ (ideal) হিসাবে না ধরে 'মডেল' (model) হিসাবে ধরতে হবে। রোগী বিবরণীগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংক্ষেপে উল্লেখ করে প্রারম্ভিক শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ প্রকরণের ইঙ্গিত দেওয়া হল শিক্ষার্থী চিকিৎসকের এক পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। প্রতিটি রোগী চিকিৎসকের মনে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করে ঃ কোন ওষুধটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, কোন শক্তি ও মাত্রা সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতি কি? চিকিৎসককে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ প্রশ্নগুলোর যথার্থ সমাধান করতে হবে। নিয়ত নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করেই কেবল এ বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠা সম্ভব। কেন্ট বলেন, যা কিছু আমাদের সঠিক থেকে, যথার্থ (exactitude) থেকে দূরে সরিয়ে নেয় তা অবৈজ্ঞানিক। চিকিৎসককে অবশ্যই সর্বোচ্চমানের অধিকারী (classical) হতে হবে। সবকিছু একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে করতে হবে। নিয়মের যথেচ্ছ প্রয়োগ হলে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান থাকে না। রোগী চায় যথার্থ জ্ঞানের প্রয়োগ, মনগড়া ধ্যান ধারণার নয়।[৫৩]

---

৫৩. Anything which takes away from the exactitude is unscientific. The physician must be classical; everything must be methodical. Science ceases to be scientific when disorderly application of law is made. - Kent. New remedies, Clinical Cases, Lesser Writings, Aphorisms and percepts. Page 646. Edition 2000. B.Jain Publishers (P) Ltd. New Delhi.

দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান

বাহ্যিক কারণ জনিত পীড়া

১. আকস্মিক দূর্ঘটনা

এক যুবক স্কুটারে যাওয়ার সময় একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যায়। আঘাত লাগার দরুণ শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে ওঠে, কালশিড়া পরে। সর্বাঙ্গে প্রচন্ড থ্যাতলানো ব্যাথা। কাউকে ওখানে হাত দিতে দেয়না। সৌভাগ্যবশতঃ কোন হাড় ভাঙেনি। মাথায় হেলমেট পড়াছিল বলে মাথায় খুব আঘাত লাগেনি। তবে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছড়ে যাওয়ার জন্য রক্তপাত হচ্ছে।

আলোচনা — এক্ষেত্রে রোগীর যন্ত্রনা নিবারণ করা, রক্তপাত বন্ধ করা এবং আঘাতের কুফল রোধ করাই চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য। নির্বাচিত ওষুধটি সঠিক হতে হবে এবং এমন শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। আমাদের ওষুধটি নিঃসন্দেহে আর্নিকা মন্টানা। আঘাত যেহেতু গুরুতর এবং ব্যাথা সর্বাঙ্গীন ও তীব্র এজন্য মধ্যশক্তিতে ওষুধ দেওয়াই সঙ্গত।

রোগীর আহত স্থানে বরফ দেওয়া হল যাতে রক্তসঞ্চয় নিবারিত হয়। রক্তপাতের স্থানে ক্যালেণ্ডুলা ২০ ফোঁটা একটু জলে মিশিয়ে তুলায় ভিজিয়ে লাগান হল। আর্নিকা ২০০ ৩টি অনুবটিকা ১ আউন্স জলে মিশিয়ে আট ঘন্টা অন্তর তিনবার সেবন করার জন্য দেওয়া হল। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

২. আঘাত জনিত মানসিক লক্ষণ

এক ভদ্রলোক রেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে বহুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বাড়ি ফেরার পর তিনি প্রায়ই প্রতিরাত্রে ঘুমের ঘোরে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন, বাঁচাও বাঁচাও। সেই দুর্ঘটনার আতঙ্ক তাঁর মুখে চোখে ফুটে ওঠে। দিনের বেলায় এ সকল কষ্ট কিছু থাকে না।

আলোচনা - আকস্মিক দৈহিক ও মানসিক আঘাত মনস্তরে গভীর ভাবে ক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে দেহস্তরে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু মনস্তর এখনও শক মুক্ত হয়নি। সেই স্তরে ক্রিয়া করার মত ওষুধকে উচ্চতর শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। আর্নিকা ১০ হাজার ১ মাত্রা এঁকে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্ত করে।

৩. মেরুপুচ্ছে আঘাত

এক কিশোর বাসে করে স্কুল থেকে ফিরছিল। বাসটি চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ ব্রেক কষে। সে বাসের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ঝাঁকুনির চোটে হাত ছিটকে বাসে পড়ে যায়। তাতে মেরুপুচ্ছে (coccyx) আঘাত লাগে। ব্যথা তেমন তীব্র না হওয়ায় সে বাড়ি ফিরে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। রাত্রে মেরুপুচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে। ব্যথা শিড়দাঁড়া ধরে মাথা পর্যন্ত প্রসারিত হচ্ছে। মাথা ব্যথা জ্বর ১০০°।

আলোচনা - মেরুদণ্ডের যে কোন আঘাতই মারত্মক হতে পারে। মেরুপুচ্ছের আঘাত যদি উপর দিকে প্রসারিত হয় তবে তা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কাজেই এখানে স্নায়ুর উপর কার্যকরী এবং দ্রুতক্রিয়াশীল ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। রোগ লক্ষণ যেহেতু প্রসারণশীল এজন্য হাইপেরিকামই এস্থলে উপযুক্ত ওষুধ। এখানে আর্নিকা দিয়ে সময় নষ্ট করলে বিপদ হতে পারে।

হাইপেরিকাম৩০, ১৫মিনিট অন্তর ২বার এবং আধঘন্টা অন্তর আরও দু'বার দেওয়ায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

মন্তব্য - ব্যথা উপর দিকে প্রসারিত না হলে লিডামপল হত প্রথম ওষুধ।

৪. গলায় ফাঁস দেওয়া

এক কিশোরী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। মাধ্যমিকে খুব ভাল ফল করেছিল। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের ফল বের হলে দেখা যায় সে ফেল করেছে। এই অভাবনীয় ঘটনায় সে শোকে দুঃখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। রাত্রে বাড়ির সকলে ঘুমুলে পরে সে ঘরের সিলিং পাখার সঙ্গে গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে। তার ছোট বোন একই বিছানায় ঘুমুচ্ছিল। গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে সে জেগে ওঠে দিদিকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে সকলকে ডেকে তোলে। তাকে নিচে নামান হল। দেহে তখনও প্রাণ আছে।

সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। জিব বেরিয়ে গেছে, কালচে, তাতে দাঁত বসে গেছে। রক্ত পরছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। চোখের পাতা খোলা, তাতে কোন অনুভূতি নেই। মুখে ফেনা। গাত্রত্বক গরম। শ্বাসক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ। নাড়ী অতি ক্ষীণ।

আলোচনা - জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রোগী। অত্যন্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ওষুধ ওপিয়াম। শক্তিনিম্ন, মাত্রা অধিক।

ওপিয়াম পাঁচ ফোঁটা একটি কাপে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১ চামচ করে প্রথমে ৫মেনিট অন্তর ২ বার পরে ১০ মিনিট অন্তর ২ বার দেওয়ায় তার জীবনক্রিয়া অতিধীরভাবে আবার শুরু হয় এবং তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। পরে ৩০ মিনিট অন্তর আর ২ বার ওষুধ দেওয়ায় সে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ ঘটনার আতঙ্ক সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। পরে তাকে ওপিয়াম ১০০০ এক মাত্রা দেওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

৫. ভোজ খাওয়ার বিপত্তি

নেমন্তন্ন বাড়িতে ভোজ খেয়ে এক পরিবারের প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার দরুণ এ অবস্থা হয়। তলপেটে অসহ্য ব্যথা। মলদ্বার ও মূত্রথলিতে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনা। ঘন ঘন মলত্যাগের বেগ। মল কালচে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত। জিব শুকনো, লাল যেন বার্নিশ করা রয়েছে। মুখে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। বমি ও বমি-বমি ভাব। বমি কালচে রঙের। কখনও শুধু জল। একটু স্থির থাকতে পারছে

না। প্রচণ্ড অস্থিরতা। উৎকণ্ঠা। সঙ্গে জ্বর। গাত্রোত্তাপ দ্রুত বেড়ে চলেছে।

আলোচনা - খাদ্যে বিষক্রিয়ার দরুণ এরূপ মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ওষুধ নিঃসন্দেহে পাইরোজেনিয়াম। এটি এ অবস্থায় নিম্নশক্তিতে ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এটি একটি নোসোডস। কাজেই খুব নিম্নশক্তিতে না দেওয়াই বিধেয়। আমাদের তাই শক্তি হল ৩০ .

পাইরোজেনিয়াম ৩০ পাঁচ ফোঁটা একটি গ্লাসে জলে মিশিয়ে ১ চামচ মাত্রা সকলকে ১০ মিনিট অন্তর ৩ বার দেওয়ায় জ্বর ছেড়ে যায়, ব্যাথা বেদনাও কমে আসে। পরে ২ ঘন্টা অন্তর আরও ৩ বার দেওয়ায় সকলেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

৬. সানস্ট্রোক

গ্রীষ্মের দুপুরের প্রচণ্ড গরমে এক রিক্সাওয়ালা হঠাৎ মাথাঘুরে পড়ে যায়। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। মাথা ভারি, মাথা সোজা করে বসতে পারছেনা। মাথা দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। মাথায় জল দিলে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। তবে মাথার গামছাটি খুলে দিলে ভাল বোধ করে। জ্ঞান আছে অথচ সে কোথায় আছে বলতে পারে না। বমি বমি ভাব।

আলোচনা – সূর্যের প্রখর তাপই এ অবস্থার কারণ। রোগীর লক্ষ্যণ নিঃসন্দেহে গ্লোনয়িন, শক্তি নিম্ন ও ঘন ঘন।

গ্লোনয়িন-৩০ একটি অনুবটিকা তার জিবে ফেলে দেওয়া হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে তাকাল। ৫ মিনিট পর আরেকটি অনুবটিকা দেওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সে উঠে বসে।

৭. অস্থিভঙ্গ

কলকাতার এক সরকারী হোমিওপ্যাথিক কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও স্বনামধন্য চিকিৎসক বাথরুমে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান। সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। উরূসন্ধিতে (hipjoint) ফিমার অস্থির শীর্ষদেশটি ভেঙে যায়। এক্সরে

করে তা জানা যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর্নিকা ১০ হাজার ১ মাত্রা সেবন করেন। শল্যচিকিৎসক অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন, কিন্তু তাতে ভাল হবে এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। এজন্য অস্ত্রপচার না করিয়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে ফিজিও থেরাপিও করান।

সিম্ফাইটাম θ,৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ২ বার দু সপ্তাহ। পরে এই ওষুধটি ৩, ৬, ১২ ও ৩০ শক্তিতে ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করেন। ছ' সপ্তাহের মধ্যে তিনি স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করেন। এক্সরে করে দেখা গেল অস্থিসন্ধিটি সম্পূর্ণ জুড়ে গেছে। হোমিওপ্যাথি আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস্য রকম কার্যকরী-এ সত্য প্রমাণিত হল।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান

অচির পীড়া

১. সর্দি জ্বর

একটি ছেলের ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। নাক দিয়ে কাঁচা জলের মত সর্দি পরছে, কাশি, টনসিল দুটি ফুলেছে, ব্যাথা। শীত শীত ভাব। সন্ধ্যার পর থেকে জ্বর বাড়ে। রাত্রে ১০২/১০৩° পর্যন্ত ওঠে। সকালের দিকে প্রচুর ঘাম হয়। মনে হয় জ্বর ছাড়বে। কিন্তু ছাড়ে না। কিছুকাল পর আবার হয়। জিব রসাল, মুখ থেকে লালার মত ঝরে। জিবে ঘা। পিপাসা প্রচুর। পায়খানা পরিষ্কার হয় না, কাদা কাদা আঠালো আম মিশ্রিত।

আলোচনা - আমাদের নির্বাচিত ওষুধ মার্কসল। এখানে রোগশক্তি রোগীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার বিভিন্ন দেহ যন্ত্রের ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। জীবনীশক্তি রোগশক্তিকে সাময়িক কিছুটা দমাতে পারলেও হঠাতে পারছে না। সর্দি ও গ্রন্থিপ্রদাহ-সহ কিছু কষ্টদায়ক উপসর্গও রয়েছে। অতএব ওষুধ খুব নিম্নও নয়, খুব উচ্চ ও নয় এমন শক্তিতে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

মার্কসল ২০০ ৩মাত্রা ৮ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

২. উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য

এক ভদ্রলোক প্রায় বছর খানেক ধরে পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময়ে ভুগছেন। কিছুকাল কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। তখন মল শুষ্ক, কঠিন কাদা কাদা, সহজে

বের হতে চায় না। আঙুল দিয়ে বের করতে হয়। মলদ্বারের বহিঃনিঃসরণ (prolapsus)। এরপর আবার উদরাময় চলে। বেদনাবিহীন পাতলা মল সজোরে নির্গত হয়। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। সকাল ১০ টা পর্যন্ত ৪/৫ বার এরকম মলত্যাগ হয়। তারপর কমতে থাকে। বিকালের দিকে বিশেষ হয়না। হলেও শুষ্ক। যকৃত প্রদেশে স্পর্শকাতর ব্যথা। আস্তে আস্তে হাত বুলালে আরাম লাগে। প্রচুর অম্ল ও বায়ু হয়। টক জাতীয় কোন খাদ্য খেলে উদরাময় হয়। এখন কোষ্ঠকাঠিন্যের দশা চলছে।

আলোচনা - এখানে যকৃতের বৃদ্ধিসহ যকৃত, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের দারুণ ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা চলছে। আমাদের ওষুধ পডোফাইলাম। কোষ্ঠকাঠিন্য চলছে বলে নিম্নশক্তি ঘন ঘন; পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তি ও কম মাত্রা।

পডোফাইলাম৬ রোজ ৩ মাত্রা করে ৫দিন। এতে তার মল স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরে পডোফাইলাম ৩০ শক্তি ২ বার করে ৭দিন, ২০০ শক্তি ২ মাত্রা ও ১হাজার শক্তি ১মাত্রা প্রয়োগ করার পর প্রায় ৩ মাসে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

৩. ম্যালেরিয়া জ্বর

এক কিশোর গত ১০ দিন ধরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে। সকাল ৮টা নাগাদ শীতকরে জ্বর আসে। জ্বর আসার আগে হাতে পায়ে পিঠে সারা শরীরে ব্যথা হয়। গলা শুকিয়ে যায়। পিপাসা পায়। কিন্তু বেশী জল পান করলে বমি পায়। তখন বুঝতে পারে জ্বর আসছে। এরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। শরীরের ব্যথা প্রচণ্ড বাড়ে। মনে হয় হাড়গুলোশুদ্ধ সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাবে। মাথা ব্যাথাও বাড়তে থাকে। দপ দপ করে। জ্বর ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পিত্ত বমি হয়। তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। ঘাম হলে সব ব্যথা কমে যায়। কিন্তু মাথা ব্যথা তখনও থাকে, তবে কম। জিবে হলদে প্রলেপ। ঠোঁটের কোণ ফেটে যায়।

আলোচনা - ম্যালেরিয়া একটি নাছোড়বান্দা দুর্বলকারক রোগ। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এর চিকিৎসা করতে হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত ওষুধ ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম। এ ওষুধের একমাত্রা ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত পর্যায়শীল রোগ

সেরে যাবে এরূপ আশা করা যায়না। ওষুধটি বেশ কয়েকমাত্রা কয়েকদিন ধরে প্রয়োগ করতে হবে।

ইউপেটোরিয়াম৩০ শক্তিতে দিনে ৩বার দেওয়া হল, জ্বর আসার সময় বাদ দিয়ে। এতেই তার ব্যথা কমে যায়, জ্বরের প্রকোপও। আর ২ দিন ৩ বার করে এই ওষুধ দেওয়া হল। এতে তার জ্বর সেরে যায়, ব্যথা বেদনাও।

৪. নিম্নাঙ্গের অবসন্নতা

১৯৯২ সালে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচণ্ড বন্যা হয়। চা বাগানের এক বন্যাত্রানের চিকিৎসা শিবিরের চিকিৎসককে মাসাধিককাল দিন রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। একদিকে কলেরা সহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগের রোগী অন্যদিকে প্রচুর মৃত ও গলিত জীবজন্তুর শব- এর মাঝে তাকে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করান হয়। তার উপসর্গ ছিল, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। পা দুটো ফুলে গেছে, শীতল। হাঁটু ও গোড়ালিতে আড়ষ্টতা। কোমরে অসারভাব। হাঁটতে কষ্ট। হাঁটতে গেলে হাঁটুতে হাঁটুতে পা ঠুকে যায়। পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছু খেতে পারেন না। খাবার দেখলেই বমি আসে। অনিদ্রা, দিনরাত্রি কখনও ঘুমুতে পারেন না। ঘুমুলেই ত্রান শিবিরের ভয়াবহ দৃশ্য মনে ফুটে ওঠে। আতঙ্কে শিউরে উঠে পড়েন। শ্বাসের কষ্ট, নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল। উদরে শীতলতা। সামান্য নড়াচড়া করলেই বমি হয়। অত্যন্ত অবসন্নতা। ভেতরে ভেতরে শীত শীত ভাব। মনে হয় যে কোন সময় কোলাপস করে যাবেন।

নার্সিংহোমে চিকিৎসায় বিশেষ কিছু উন্নতি না হওয়ায় তিনি চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় আমি আহূত হই।

আলোচনা - রোগীর লক্ষণ সমূহ স্পষ্টভাবে কলচিকাম ওষুধটি নির্দেশ করছিল। রোগীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য ওষুধ নিম্নশক্তিতে কয়েকমাত্রা দেওয়া সাব্যস্ত হল।

কলচিকাম৩০ দিনে ৩বার করে ৬ মাত্রা। দ্বিতীয় দিনেই তিনি খেতে পারেন এবং তৃতীয় দিনে হাঁটাচলা শুরু করেন। তাঁকে কলচিকাম৩০ আরও

চারমাত্রা দিনে ২বার করে আরও ২দিন দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে কলচিকাম২০০ ১মাত্রা দেওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগদান করেন।

৫.কার্বাঙ্কল

একটি মেয়ের উরুতে একটি কার্বাঙ্কল হয়েছে। প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রনা ও হুলফোটান বেদনা। আক্রান্ত স্থানের রঙ নীলচে লাল, স্থানটি গরম। সমস্ত পা ফুলে উঠেছে। ব্যথার চোটে জ্বর হয়েছে। রোগী যন্ত্রনায় ছটফট করছে। চিৎকার করছে। রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারছে না। প্রচণ্ড জল পিপাসা। খানিকক্ষণ পর পর প্রচুর পরিমানে জল খাচ্ছে। বার বার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। প্রচণ্ড অবসাদ।

আলোচনা - কার্বাঙ্কল একটি অত্যন্ত বিষাক্ত যন্ত্রনাদায়ক ফোঁড়া জাতীয় রোগ। এর আশু উপশম প্রয়োজন। কার্বাঙ্কল ফাটলে অনেক গুলো মুখ হয় এবং তা থেকে বিষাক্ত পূঁজরক্ত বের হয়ে আসে এবং মুখের কাছে একটা গর্তের মত সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা না নিলে বিপজ্জনক হতে পারে।

আমাদের নির্বাচিত ওষুধ ট্যারেন্টুলা কিউবেনসিস। দ্রুত উপশমের জন্য নিম্নশক্তি ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথমে ট্যারেন্টুলা ৬ প্রত্যহ ৪ মাত্রা করে দেওয়ায় দ্বিতীয় দিনেই জ্বালাযন্ত্রনা কমে আসে। চতুর্থ দিনে কার্বাঙ্কলে মুখ হয় এবং অল্প অল্প পূঁজ নিঃসরণ শুরু হয়। জ্বর কমে যায়। পায়খানা ঠিক হয়। এ ওষুধ একই শক্তিতে দিনে ৩ বার করে আরও ৭দিন দেওয়া হয়। পরে মাত্রার পরিমাণ কমিয়ে ২বার করা হয়। দু সপ্তাহে সে সুস্থ হয়ে ওঠে।

৬. সায়েটিকা

এক ভদ্রমহিলা কিছুকাল যাবত সায়েটিকায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বাম সায়েটিক স্নায়ুতে অসহনীয় ব্যথা, টেনে খিঁচে ধরার মত। বিশ্রামে ব্যথা বাড়ে। এজন্য রোগী বেদনার সময় ঘরময় পায়চারি করেন। আক্রান্ত অংশ স্পর্শ করলে ব্যথা বাড়ে,

কিন্তু জোরে চাপ দিলে কিংবা গরম সেঁক দিলে আরাম লাগে। ব্যথার সময় পা সোজা করে রাখা যায় না। শুয়ে হাঁটু মুড়ে তলপেটে চেপে ধরলে উপশম হয়।

ভদ্রমহিলা মানসিক কষ্টেও ভুগছেন। তার স্বামী দুঃশ্চরিত্র। এজন্য স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাটি ও অশান্তি লেগেই আছে। রাগ ও বিরক্তিতে ভদ্রমহিলা এক একদিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর থেকেই সায়েটিকায় প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েন।

আলোচনা - এখানে মানসিক লক্ষণই রোগোৎপত্তির মূল কারণ। এজন্য উচ্চশক্তি ক্ষুদ্রমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে। কলোসিন্থ১০০০ ২মাত্রা তাকে সুস্থ করে তোলে।

৩
অধ্যায়

দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি, মাত্রাও প্রয়োগবিজ্ঞান

অচির পীড়া—সংক্রামক ও মহামারী রোগ

১. চোখওঠা

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ব্যপক আকারে চোখ ওঠা রোগ (viral conjunctivitis) দেখা দেয়। বিভিন্ন এলাকায় বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের অনেকেরই কতগুলো সাধারণ লক্ষণ ছিল। চোখে ভীষণ যন্ত্রনা।, চোখ লাল হওয়া, চোখদিয়ে অনবরত পাতলা শ্লেষ্মার মত জল পড়া, চোখ কড়কড় করা, জ্বালাকরা, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া, স্রাব যেখানে লাগে সেখানে হেজে যাওয়া, চোখের ভেতর ক্ষত, চোখের তারার উপর আঠার মত পিচুটি পড়া, আলো বা সূর্যের আলো অসহনীয়, শুলে চোখ বুজে যাওয়া, চোখে দেখতে অসুবিধা এবং এজন্য বারবার চোখ মোছা ইত্যাদি। নাক দিয়ে যেস্রাব নিগ্রত হয় তা হাজাকারক নয়।

আলোচনা - রোগচিত্র নিঃসন্দেহে ইউফ্রেসিয়া ওষুধটিকে নির্দেশ করছে। ওষুধ নিম্নশক্তি, অধিকমাত্রা। যেহেতু এটি একটি ব্যপক সংক্রামক রোগ এজন্য স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো বিশেষভাবে মেনে চলতে হবে।

ইউফ্রেসিয়া৬ ৪ঘন্টা অন্তর দিনে ৪বার প্রয়োগ করায় এবং ইউফ্রেসিয়া লোসন করে চোখে ফোঁটা দেওয়ায় ৩দিনের মধ্যেই এ রোগ সেরে যায়।

যাদের এরোগ হয়নি তাদেরও ইউফ্রেসিয়া৩০ দিনে ২বার করে ৫দিন প্রয়োগ করায় তাদের আর এ রোগ হয়না।

২. ভাইরাল ফিভার

২০০১ সালে মে জুন মাসে কলকাতায় এক প্রকার ভাইরাস সংক্রমনজনিত জ্বর বিক্ষিপ্তভাবে বহু লোককে আক্রমণ করে। অনেকের মধ্যেই কতগুলো সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রথমে সামান্য সর্দি, হাঁচি, গা ম্যাজ-ম্যাজ করা। পরে জ্বর। জ্বর দ্রুত বাড়তে থাকে। ১০৩°/১০৪° পর্যন্ত গাত্রোত্তাপ উঠে যায়। সারা গা যেন পুড়ে যায়। তথাপি সব সময় শীত শীত ভাব। সব সময়ে গায়ে ঢাকা চায়। ঢাকা খুললেই প্রচণ্ড শীত লাগে। গাত্র ত্বক শুষ্ক, শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, যেন ফেটে যাবে। রোগী জড়সড় হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। কোন আলো, শব্দ, কথাবার্তা অসহ্য। মেজাজ খিটখিটে। কোষ্টকাঠিন্য। বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু মলত্যাগ হয় না। খিদে নেই। বমি বমি ভাব। পিপাসা আছে।

আলোচনা - এখানে মানসিক ও সার্বিক লক্ষণ দ্বর্থহীন ভাবে নাক্সভমিকাকে নির্দেশ করে। কাজেই নাক্সভমিকাই আমাদের ওষুধ। নাক্সভমিকা এখানে জেনাস এপি ডেমিকাসও। এজন্য প্রতিকারক ও প্রতিষেধক উভয় হিসাবেই কাজ করবে। নাক্সভমিকা২০০ দুটি অনুবটিকা ১আউন্স জলে দ্রব করে ৬ ঘন্টা অন্তর চারবার প্রয়োগে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য হয়। যাদের এ রোগের সংক্রমণ হয়নি এমন ১২ জনকে প্রতিষেধক হিসাবে নাক্সভমিকা২০০ দু মাত্রা করে দেওয়া হয়। তাদের কারোরই এ রোগ হয়নি।

৩. কলেরা

এক ভদ্রমহিলার কলেরায় ভেদ বমি হতে হতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে খিল ধরা শুরু হয়। ঘাড়ে খিল ধরে ঘাড় বেঁকে যায়। বুকে আক্ষেপিক খিল ধরায় (spasmodic constrctions) শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট শুরু হয়, দাঁতের চোয়াল আটকে যায়। চোখের মণি বিস্ফারিত যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। (কলেরায় সাধারণতঃ চোখ কোটরে বসে যায়) হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠোঁট, নাক, হাতের আঙুলের ডগা নীলবর্ণ। নাড়ী অতি ক্ষীণ। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন।

আলোচনা - আমাদের ওষুধ হাইড্রোসায়ানিক এসিড। রোগী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ওষুধটি ৩০ শক্তির ৩/৪ ফোঁটা একটি কাপে জলে মিশ্রিত করে ৫মিনিট অন্তর ৪/৫ বার দেওয়ার পর তার খিলধরা কমে আসে, শ্বাস প্রশ্বাস কিছুটা নিয়মিত হয় এবং গাত্রোত্তাপ বাড়ে। ওষুধ প্রয়োগকাল দীর্ঘতর করা হয়। প্রতিক্রিয়াশক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। প্রায় ২৪ ঘন্টায় সে নতুন জীবন লাভ করে।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান

চিররোগ

১. বাতরোগ

৯/৫/৯৭ শ্রীযুক্ত সিং। বয়স ৩০। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান। গত ২ বছর যাবত বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। উরু, উরুসন্ধি এবং পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। টেনে খিঁচে ধরার ন্যায় ব্যথা। ব্যথা কখনও উরুতে, কখনও হাঁটুতে, কখনও গোড়ালিতে, কখনও এক পায়ে, কখনও দুপায়ে ঘুরে বেড়ায়। পা ভারি মনে হয়। পা ঝুলিয়ে বসলে ব্যথা বাড়ে। বিকাল ও রাত্রে বাড়ে। গরমকালে ও গরমে বাড়ে। খোলা জায়গায় চলাফেরা করলে, ঠান্ডা দিলে ব্যথা একটু কম বোধ হয়। ব্যথার জন্য চাকুরি করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায়ই সর্দি লাগে। সর্দি লাগলেই বুকে বসে যায়। হাঁপের মত হয়। অজীর্ণতা। কোন খাবার হজম হতে চায়না। পেট বায়ুতে পূর্ণ হয়ে থাকে। মুখ শুকিয়ে যায়। কিন্তু জল খেতে ইচ্ছা করে না।

গরমকাতর। আবার একটু ঠান্ডা পরলেই শীত শীত করে।

ছেলেবেলায় হাম হয়ে বসে যায়। তাতে বহুদিন ভুগেছে। অ্যালোপ্যাথিতে সারে। 'অর্কাটিস', ম্যালেরিয়া, হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথিতে সারে। হস্তমৈথুনের অভ্যাস। বিয়ে করতে চাইছিল না। বাড়ির লোকেরা জোর করে বিয়ে দেয়। স্ত্রী সংসর্গে দারুণ ভয়। মনে করে একাজটা অন্যায়। তাই স্ত্রীকে বিহারের বাড়িতে

রেখে চলে আসে। বাড়িতে আর যায় না। প্রায় ২ বছর হল। তারপর এই বাতের প্রকোপ।

মায়ের বাত, বাবার একজিমা। বড় ভাই বিয়ের ভীতি, বিয়ে করেনি।

আলোচনা - ওষুধ নির্বাচনের জন্য লক্ষণ ১. গরম কাতর, একটু ঠান্ডা পরলে আবার শীত শীত করে। ২. ঘাম বসে যাওয়ার কুফল, অর্কাটিস, ম্যালেরিয়া, হস্তমৈথুনের ইতিহাস। ৩. স্ত্রী সংসর্গে ভীতি। ৪. বাতে ব্যথা পরিবর্তনশীল বিকালে ও রাত্রে, গরমে ও গরমকালে বৃদ্ধি, ঠান্ডায়, চলাফেরায় উপশম। ৫. মুখ শুকনো অথচ পিপাসাহীনতা। ৬. বংশগত রোগ - বাত, একজিমা, স্ত্রী সংসর্গে ভীতি।

আমাদের ওষুধ পালসেটিলা। এ রোগ বংশধারায় সংক্রামিত, শৈশবে অঙ্কুরিত, কৈশোরে পুষ্টিপ্রাপ্ত, যৌবনে পূর্ণ বিকশিত। প্রবণতা মাঝারি। এজন্য শক্তি উচ্চ, মাত্রা ক্ষুদ্র।

পালসেটিলা ১ হাজার রাত্রে সকালে ২ মাত্রা।

১২.৬.৯৭ ব্যথা একদম কমে গিয়েছিল। একদিন ঝড় জলে ভিজেছিল। তারপর থেকে আবার একটু ব্যথা হচ্ছে তবে তীব্রতা কম। অজীর্ণতা অনেকটা ভাল। পালসেটিলা ১০ হাজার ১ মাত্রা, রাত্রে।

১০.১০.৯৭ কোন অসুবিধা নেই। ইতিমধ্যে বিহার থেকে স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে।

ভাল আছে।

স্মৃতিশক্তির হানি

১২. ৩. ৯১ কিশোরী। বয়স ১৬। দোহারা চেহারা। দশম শ্রেণীর ছাত্রী। দৃষ্টি নিষ্প্রভ, উদাসীন। পড়াশুনায় কোন উৎসাহ পায়না, কিছু মনে রাখতে পারেনা। অথচ আগে পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভাল ফল করত। বছর দুয়েক হল এ অবস্থা চলছে। অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজ। মা বাবার সঙ্গে কোন কথা বলতে চায় না, মা বাবা কিছু বললেও শোনে না। উল্টে অভিমান করে

খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। খিদে একদম নেই। খাওয়া দেখলেই বমি আসে। দুধ সহ্য হয়না। শুধু টক জাতীয় খাদ্য পছন্দ করে। পেটে একটা শূন্যতা বোধ। কিছু খেলেও এই শূন্যতা বোধ যায় না।

কোষ্ঠকাঠিন্য। শক্ত, বড়মল। মলত্যাগের সময় প্রচন্ড ব্যথা হয়। মলদ্বার বেরিয়ে আসে। ঋতুস্রাব অনিয়মিত, দেরীতে দেরীতে হয়, অতি সামান্য হয়। তখন প্রচন্ড ব্যথা হয়। ব্যথা উপরদিকে প্রসারিত হয়। ব্যথা গরমে উপশম। ঋতুস্রাব ১২ বছরে শুরু হয়। তখন থেকেই ওর শরীর খারাপ হতে থাকে, মন বিষণ্ণ হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়। পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

আগে খুবই বুদ্ধিমতী ও হাসিখুসি ছিল। বাবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কর্মরত। মা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দুজনে বনিবনা ছিল না। প্রায় রাতেই ঝগড়াঝাঁটি হত, হাতাহাতি হত। ও পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে ভয়ে শিটিয়ে থাকত। দিনের পর দিন এ সকল দেখে শুনে ও ধীরে ধীরে একেবারে গুটিয়ে যায়। সারাদিন একা একা মন খারাপ করে বসে থাকে। পড়াশুনা, নাচগান বন্ধুবান্ধব সব কিছুতেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বাবা মাকে একদম সহ্য করতে পারে না।

বাবার ক্রনিক পেটের রোগ ছিল। অনিদ্রায় ভুগতেন। মায়ের বাত, একজিমা ছিল। বংশগত রোগ - বাত, ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগ।

আলোচনা - বয়ঃসন্ধিকাল থেকে পরিবর্তন, জীবনের ছন্দে আকস্মিক অনভিপ্রেত পরিবর্তন। নীরবে একা থাকতে চাওয়া, সব কিছুতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি মনস্তরে অনবরত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশিত প্রতিচ্ছবি। এজন্য এর প্রতিকারে গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের অতি উচ্চশক্তির ক্ষুদ্রতম মাত্রার প্রয়োজন। সিপিয়া ১০ হাজার ১ মাত্রা এবং ৩ মাস পর আরেক মাত্রা তাকে তার হারানো জীবনে আবার ফিরিয়ে দেয়।

৩. বন্ধ্যাত্ব

শ্রীমতি ...., বয়স ২৭। মাঝারি গড়ন। ছ' বছর হয় বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কোন সন্তান হয়নি। অনেক রকম চিকিৎসা হয়েছে, তাবিজ কবজও ধারণ করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। U.S.G. করা হয়েছে,— রিপোর্ট Uterns bulky, anteverted, one small cystic tumor on the posterior wall. Ovary normal. মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প, একদিন স্থায়ী হয়। তখন তলপেটে ও স্তনে অত্যন্ত ব্যথা হয়। স্তন ফুলে ওঠে টন টন করে। মনে হয় দুধে ভর্তি হয়ে গেছে। সাদাস্রাব প্রচুর, পাতলা জলের মত, হাজাকারক। চুলকায়। যৌন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক।

ছেলেবেলা থেকে বাম কান থেকে রস পড়ে। ঘন পূঁজ স্রাব। দুর্গন্ধযুক্ত। বামকানে কম শোনেন। ডান কানে সব সময় কুটকুট করে চুলকায়। দাঁত খারাপ। প্রায়ই দাঁত ব্যাথা হয়। মাড়িতে ঘা হয়। মুখ দিয়ে লালা স্রাব। মুখে দুর্গন্ধ। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের ভেতর একপ্রকার কম্পন হয়। দাঁতব্যথা কানব্যথা রাত্রে বাড়ে, ঠান্ডা গরমে আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাড়ে। ঘাম বেশী। পিপাসা যথেষ্ট। চুল পড়ে যাচ্ছে। স্মৃতিশক্তি কমে আসছে।

ছেলেবেলায় খুব ফোঁড়া হত। কানে ফোঁড়া হয়ে কানের পর্দায় ফুটো হয়। টনসিল প্রদাহ। প্রতি ঋতু পরিবর্তনে জ্বর হত।

মায়ের বাত, মায়ের দুবার গর্ভস্রাব হয়। বাবার হাঁপানি। স্বামীর বীর্য পরীক্ষায় সব কিছু স্বাভাবিক পাওয়া যায়। স্বামীরও কান পাকা রোগ, গ্যাসটিক আলসার। বংশে মানসিক প্রতিবন্ধী।

আলোচনা - স্বামী স্ত্রী দুজনেই সিফিলিটিক মায়াজম দোষে দুষ্ট। এর প্রতিকার না হলে সন্তান হওয়া অনিশ্চিত, হলেও শেষ পর্যন্ত থাকবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের ওষুধ মার্কারি। শক্তি উচ্চ, মাত্রা ক্ষুদ্র।

১২. ২. ৯৭ মার্কসল ১০ হাজার একটি অনুবটিকা ১ আউন্স জলে ২ মাত্রা পর পর দুদিন সকালে।

স্বামীকে সিফিলিনাম ১ হাজার ১ মাত্রা।

৩০. ৩. ৯৭ ঋতুস্রাবের পরিমাণ বেড়েছে। সাদাস্রাব কমেছে। কান দিয়ে পুঁজ পরছে। মার্কসল ১০ হাজার ২ মাত্রা।

৩. ৫. ৯৭ ঋতুস্রাব হয়নি। মূত্র পরীক্ষায় গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন। ফাইটাম।

১০. ৮. ৯৭ ভ্রূণের বৃদ্ধি স্বাভাবিক চলছে। কানের পুঁজকমে এসেছে। মুখে ঘা। রাত্রে হাতে পায়ে কোমরে ব্যথার জন্য ঘুমুতে পারে না। সকালে অত্যন্ত দুর্বলতা। চুল উঠে যাচ্ছে। সিফিলিনাম ১ হাজার ১ মাত্রা।

ভদ্রমহিলা যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তানের মা হন। মা ও ছেলে ভাল আছে।

৪. দৃষ্টিশক্তিহীনতা

১৩. ৬. ০১ মিঃ সিং। পাটনা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। বয়স ৪০, দীর্ঘদেহী, শক্ত গঠন।

১৯৮৮ সাল থেকে চোখের সমস্যায় ভুগছেন। সকাল থেকে চোখে একরকম অস্বস্তি আরম্ভ হয়। মনে হয় চোখে বালি পরেছে। বার বার চোখ রগরাতে হয়। চোখের সামনে আলোর ঝলক দেখেন। দৃষ্টি অস্পষ্ট মনে হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে অস্বস্তি বাড়তে থাকে। চোখের তারায় ব্যথা। চোখ চুলকায়। লাল হয়। পড়তে ও দেখতে অসুবিধা হয়। সবকিছু দুটো দেখেন, একটার নিচে আরেকটা। রঙের বেলায়ও দুটো রঙ দেখেন। চোখ বন্ধ করে থাকলে ভাল লাগে। বিকালের দিকে আর কোন কাজ করতে পারেন না। বাড়িতে এসে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত ৯টার পর অসুবিধাগুলো চলে যায়। পরের দিন সকাল থেকে আবার শুরু হয়।

মাদ্রাজের শঙ্কর নেত্রালয় থেকে শুরু করে বোম্বে ও দিল্লীর নাম করা হাসপাতালে দেখিয়েছেন। গ্লকুমার প্রথম পর্যায় বলে রোগ নির্ণয় হয়েছে। এর বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই বলে জানান হয়েছে। তবে চোখের প্রেসার (tension) 18 এর নিচে রাখতে বলা হয়েছে এবং তার জন্য ওষুধ ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে দু চোখেই tansian 26 + (স্বাভাবিক 18 এর নিচে)। এই ওষুধ ২ বছর ধরে খেয়েও tension কমছে না।

ফলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় তাকে সর্বদা বিষন্ন করে রাখে। ভাল হওয়ার আর আশা নেই ভেবে মনমরা। কোন কাজে মন দিতে পারছেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব। কোর্টে সওয়াল ভাল করে আরম্ভ করার পর খেই হারিয়ে ফেলেন। সব কিছু গুলিয়ে যায়। তারজন্য সব কিছু তাড়াতাড়ি করতে চান। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। যত কষ্টের কথা ভাবেন তত কষ্ট বেড়ে যায়। দুই হাঁটুতে বহুদিন ধরে বাত আছে। কামড়ায়। ভারি বোধ হয়। সূঁচ ফোটানো ব্যথা, রাত্রে বাড়ে। ব্যথার জন্য পা স্থির রাখতে পারেন না। ব্যথা অত্যন্ত তীব্র। পিপাসা খুব বেশী। মদ্যপানে আসক্তি। ঋতুপরিবর্তনে ঠান্ডা লাগে। গরম কাতর। ছেলেবেলা থেকে বসন্ত, শ্বাসের কষ্ট ও দাদ হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথিতে সারে। মায়ের হাঁপানি, চোখের সমস্যা। বাবার বাত, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ। বোনের প্লুরুসি। ঠাকুরদার T. B., ঠাকুরমার বাত।

আলোচনা - রোগীতে শৈশব থেকেই সাইকোটিক মায়াজমের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ও ক্রিয়াশীল। লক্ষণ সমষ্টি নিঃসন্দেহে মেডোরিনাম ওষুধটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে। কাজেই ওষুধের শক্তি উচ্চ, মাত্রা ক্ষুদ্র।

১৩. ৬. ০১ মেডোরিনাম ১হাজার ২ মাত্রা, রাত্রে/সকালে। ১মাসের প্লাসিবো।

১৩. ৭. ০১ অনেকটা ভাল আছেন। চোখের অস্বস্তি কম। চোখের tension 18 তে নেমে গিয়েছিল। এখন 20. বাতের ব্যথা কম। মেডোরিনাম ১০-এম বিভক্ত মাত্রায় ২ মাত্রা। ১মাসের প্লাসিবো।

২৩. ৮. ০১ চোখের কোন অস্বস্তি নেই। tension 14. বাতের ব্যথা নেই। প্লাসিবো ৩ মাসের।

১০. ১২. ০১ কোন অসুবিধা নেই। চোখের tension 14. নেত্রালয় দেখিয়েছে। গ্লকুমার কোন চিহ্ন নেই। ৬ মাস পরে আবার ওখানে দেখাতে বলেছে।

৬ মাস পরে আবার দেখিয়েছেন। কোন অসুবিধা নেই। এ চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য ওঁরা সযত্নে রেখে দিয়েছে। আমরা এমন সব অমূল্যতথ্য অবহেলায় হারাই। অমূল্যকে মূল্য দিতে আমরা জানি না।

মুমূর্ষু অবস্থায় হোমিওপ্যাথি

১. কিডনীর কার্যক্ষমতা বিনষ্ট

১৫. ১১. ৯৮ ভদ্রমহিলা, বয়স ৬০, মোটা ভারি চেহারা। দুটি কিডনীই ফেল করেছে। ডায়ালিসিস করার ক্ষমতা নেই। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। বাড়িতে মৃত্যুর দিন গুনছেন। সর্বাঙ্গীন শোথ। সারা শরীর ফুলে গেছে। চোখ পর্যন্ত বুজে গিয়েছে। কিছু খেতে পারেন না। পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ। জ্ঞান আছে কিন্তু সকলকে চিনতে পারছেন না। সারা শরীর বরফের মত শীতল, কিন্তু মাথাটা গরম। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কালশিরা পড়েছে। এই শীতকালেও ঠান্ডা ঘামে শরীর আপ্লুত। নাড়ী ক্ষীণ, মাঝে মাঝে শ্বাসের প্রচণ্ড কষ্ট দমবন্ধ ভাব ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে বলেছেন। পাখার হাওয়া চাইছেন। মনে হচ্ছে যে কোন সময় শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবেন।

আলোচনা - রোগীর মৃত্যু আসন্ন এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অবর্ণনীয় যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দিয়ে মৃত্যুকে সুখকর করাই এখন চিকিৎসার লক্ষ্য। আমাদের ওষুধ নিশ্চিতভাবে কার্বোভেজ। রোগীর জীবনীশক্তি নিঃশেষিত। এজন্য ওষুধ নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু কার্বোভেজ ওষুধটি খুব নিম্নশক্তিতে প্রয়োগ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা। অতএব আমাদের শক্তি ৩০।

কার্বোভেজ ৩০ ১ফোঁটা এক কাপ জলে মিশিয়ে ৫ মিনিট অন্তর অন্তর ১ চামচ করে দেওয়া হল। তার অর্ধেকটা মুখ দিয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে এল। ৪/৫ বার দেওয়ার পর শ্বাসের কষ্টটা কিছুটা কমল। এরপর ১০ মিনিট অন্তর আরো ২ বার দেওয়ায় তিনি ঘুমিয়ে পরেন।

পরের দিন সকালে পায়খানা হল। ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো হল। নাক দিয়ে খানিকটা কালোরক্ত বের হল। কার্বোভেজ ৩০ দিনে ৫ বার করে দেওয়া হল। রোগীর অবস্থা ক্রমশ উন্নতি দেখা গেল। রোগী মনে করেন তিনি ভাল হয়ে গেছেন। ৫ দিন পর ঘুমের মধ্যে রোগী হার্টফেল করে মারা যান।

২. জরায়ুর ক্যানসার

২৩. ৫. ৯১ ভদ্রমহিলা। বয়স ৬৫। জরায়ুর ক্যানসারে ভুগছেন। ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছে বাড়িতে গিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে। এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। জরায়ু দিয়ে সমানে কালো ঘন রক্তস্রাব হচ্ছে রক্ত জমাট বাধছে না। অসম্ভব দুর্গন্ধিযুক্ত। মনে হচ্ছে জরায়ু টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। অসম্ভব ব্যথা ও জ্বালা। দিনরাত্রি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছেন। কাউকে চিনতে পারছেন না। সমস্ত নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাত গ্রস্ত। হাত দুটি কাঁপছে। প্রস্রাব কাল রক্তের মত। ঘামও কাল রক্তের মত।

আলোচনা - ভদ্রমহিলার ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে। অন্তত এক সপ্তাহ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এজন্য হোমিওপ্যাথিতে আসা।

আমাদের ওষুধ ক্রোটেলাস হরিডাস। এটি সাপের বিষ থেকে তৈরী। শক্তি ৩০. মাত্রা ঘন ঘন।

ক্রোটেলাস৩০ ১ফোঁটা ২আউন্স শিশিতে ১২ দাগ দিয়ে দিনে ৩বার করে ২দিন দেওয়ার পর রক্তপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। ৫দিন এভাবে খাওয়ার পর রক্তপাত প্রায় বন্ধ হয়। দুর্গন্ধি কম হয়। প্রস্রাব ও ঘাম প্রায় স্বাভাবিক হয়। রোজ ২বার করে আরও ৭দিন পরে মাত্রা ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়।

রোগী ৩ মাস বেঁচেছিলেন। পরে হার্টফেল করে মারা যান। মৃত্যুর সময় কোন জ্বালা যন্ত্রনা ছিল না।

৩. সেরিব্রাল থ্রম্বসিস

১৭. ৪. ৯৩ ভদ্রমহিলা। বয়স ৬২। একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মা। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস অবস্থায় কলকাতার নীলরতন কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন। অক্সিজেন ও সেলাইন দেওয়া হয়। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২৪ ঘন্টা না কাটলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে কি না বলা যাবে না। ওষুধ কিছু দেওয়া হয়নি। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

আলোচনা - থ্রম্বসিস রোগে ধমনীতে রক্ত জমাট বেধে যায় অথবা ধমনীতে অন্য কোন বাধার জন্য মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিকার করতে আর্নিকা মন্টানা অব্যর্থ ওষুধ। বাধা অপসারণ ও রক্ত সরবরাহ স্বাভাবিক করার জন্য শক্তি মধ্য থেকে উচ্চ।

হাসপাতালেই রাত্রে আর্নিকা-২০০ ১ঘন্টা অন্তর ২বার দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে রোগী বারন্দায় ঘুরে বেড়ান। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর বামহাত ও বামপায়ে একটা পক্ষাঘাত অবস্থা দেখা দেয়। কষ্টিকাম৩০ রোজ ২বার করে ৭দিন খাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং এখনও বেঁচে আছেন।

৪. নাক ও মুখদিয়ে রক্তপাত

৭০ বৎসর বয়স্ক এক প্রবীন ভদ্রলোকের হঠাৎ নাক ও মুখ দিয়ে প্রচন্ড রক্তপাত (severe haematemesis and melaena) আরম্ভ হয়। তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি বহুবিধ রোগে ভুগছিলেন এবং তার জন্য নানারকম অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বহু বছর ধরে খেয়ে আসছিলেন। তাঁর ডিউডিনাল আলসার ছিল, বাত ছিল, প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধির জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রতায় ভুগছিলেন। মনে হচ্ছিল যে কোন সময় মারা যাবেন। তার সারা শরীর বরফের মত ঠান্ডা, কপালে শীতল ঘাম। শ্বাসের কষ্ট। দূর থেকে ধীরে ধীরে পাখার হাওয়া চাইছিলেন। তার সেরাম ক্রিয়েটিন (serum creatine) 3.7mg এবং হিমোগ্লোবিন 4.3% তাঁকে কার্বোভেজ৩০ ৩ঘন্টা অন্তর দেওয়া হল। এতে তাঁর অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কার্বোভেজ ৩০ ৬ঘন্টা অন্তর ৩ মাত্রা করে ৬ মাত্রা দেওয়া হল।

চতুর্থদিনে রক্তপাত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। কিন্তু epigastric region- এ প্রচণ্ড ব্যথা ও জ্বালা বোধ অব্যাহত থাকে। কার্বোভেজ বন্ধ করে অর্নিথোগেলাম2x ২ফোঁটা করে দিনে ২বার দেওয়া হল। পঞ্চম দিনে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো হয়। ৬ষ্ঠ দিন - দুর্বলতা ছাড়া আর কোন লক্ষণ নেই। চায়না-২০০ ১মাত্রা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

আলোচনা - আমাদের মেটেরিয়া মেডিকাতে কার্বোভেজ ওষুধের মত এমন কিছু ওষুধ আছে যা নির্দেশিত হলে এবং সময় মত প্রয়োগ করলে রোগীকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব।

আর্নিথোগেলাম ওষুধটি নিম্নশক্তিতে G. I. Ulceration এর কষ্টকর জ্বালা ও বেদনার উপশম প্রদানে অত্যন্ত কার্যকর।

জিরেনিয়াম ম্যাকুলিনাম ওষুধের মূল আরক ৫ফোঁটা মাত্রায় দিনে ২বার করে কিছুকাল প্রদান করলে ডিউডিনাল আলসারে ভাল কাজ করে।[৫৪]

৫. পাকস্থলির ক্যানসার

১৪.৮.৮৮ ভদ্রলোক। বয়স ৫৮। পাকস্থলির ক্যানসারে ভুগছেন। ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে অস্ত্রোপাচার হয়। তারপর chemotherapy ১০টি নিতে বলা হয়। ৩টি নেওয়ার পর অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটে এবং চিকিৎসকরা তার প্রাণের আশা ছেড়েদেন। তখন হোমিওপ্যাথি।

ক্যানসার গলায় স্থানান্তরিত (metastasis) হয়েছে। পেটে দিনরাত অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনা। গলায় ব্যথা। লঙ্কাবাটার মত জ্বালা। গলার নালী সঙ্কোচিত। কিছু খেতে পারছেন না। মাঝে মাঝে রক্তবমি হচ্ছে। শুধু মাঝে মাঝে একটু জল খাচ্ছেন। মুখে ঘা। ঠোটের দুকোণায় ঘা - হাঁ করতে পারছেন না। মৃত্যুভীতি। যেন দিনরাত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছেন। অত্যন্ত অস্থিরতা ও দুর্বলতা। কথা বলতে পারছেন না। গোঙাচ্ছেন।

---

৫৪. Homoeopathic Heritage. Nov 1996

আর্সেনিকাম এল্বাম৩০ দিনে ১ফোঁটা ২আউন্স জলে ৮মাত্রা দিনে ৪বার করে ২দিন। রোগীর জ্বালা কিছুটা কম। মৃত্যুভয় কিছুটা কমেছে। তরলকিছু সামান্য খেতে পারছেন। কিন্তু অধিকাংশই বমি হয়ে যাচ্ছে।

আর্সএল্ব৩০ দিনে ৩বার করে ৩দিন, পরে ২বার করে আর ৪দিন।

২৪. ৮. ৮৮ রোগীর অস্থিরতা কমেছে। কিন্তু জ্বালা ও ব্যথা রয়েছে। বুকের কাছে খাদ্যনালী মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে জিবের কোণে ঘা।

কন্ডুরাঙ্গো θ ৫ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩বার ৩দিন।

২৮. ৮. ০২ রোগী অনেকটা ভাল বোধ করছেন। তরল খাবার খেতে পারছেন। মুখের ঘা অনেকটা কম। চলাফেরা করতে পারছেন।

পরে তাকে কন্ডুরাঙ্গো-৬ ২সপ্তাহ এবং ৩০ ১সপ্তাহ দেওয়া হয়। তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং চলাফেরা শুরু করেন।

তাঁকে ক্যানসার হাসপাতালে আবার দেখান হয়। ওখানে বলা হয় তিনি অনেকটা ভাল হয়ে গেছেন এবং এক্ষুনি আবার chemotherapy শুরু করতে হবে এবং অন্তত ৭টি নিতে হবে। ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হন না। কিন্তু বাড়ির ও আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে chemotherapy নিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়টি নেওয়ার পরেই তিনি মারা যান।

আলোচনা - আর্সেনিকাম এল্বাম, কন্ডুরাঙ্গো ইত্যাদি কিছু ওষুধ আছে যা মুমূর্ষুকে নতুন জীবন দিতে পারে। অন্ততঃ তার মৃত্যুকে সুখকর ও শান্তিপূর্ণ করতে পারে। অন্তিমকালে সুখকর ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর চেয়ে মানুষের আর কি কামনীয় থাকতে পারে।

আর্সেনিকাম এল্বামের উচ্চশক্তি জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোকে যন্ত্রনাবিহীন করে ও প্রশান্তি প্রদান করে।[৫৫]

---

৫৫. W. Boericke. Pocket Mannal of Homoeopathic Matsia Medila.
M. Bhattacharya and Co. (d) ltd Calcutta 1960. page 79.
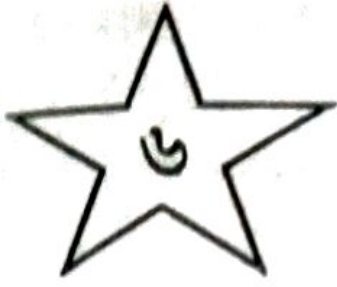
দৃষ্টান্তের সাহায্যে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগ বিজ্ঞান

ঘ্রাণের সাহায্যে ওষুধ গ্রহণ

১.দাঁতব্যথা

১৬. ৩. ৭০। শ্রীমতী ....। বয়স ৩২। অসহ্য দাঁত ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। মুখ থেকে প্রচুর লালা নিঃসরণ হচ্ছে। মুখে দুর্গন্ধ। দাতের গোড়ায় ঘা, তাতে পূঁজ। ব্যথার জন্য সকাল থেকে কিছু খেতে পারছেন না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বাড়ছে। আগে প্রচুর জল পিপাসা ছিল, কিন্তু সকাল থেকে জল খেতে পারছেন না। প্রচুর ঘাম। ঘামে দুর্গন্ধ।

আলোচনা - আমাদের ওষুধ নিশ্চিত ভাবে মার্কসল। কিন্তু মার্কসল রাত্রে প্রয়োগ করলে প্রচণ্ড বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এজন্য নিম্নশক্তিতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ ঘ্রাণের সাহায্যে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়।

মার্কসল ০/১ শক্তির ১টি অনুবটিকা একড্রাম শিশিতে রেখে এক ফোঁটা পরিস্রুত জলে দ্রব করে নেওয়া হল। তারপর এর সঙ্গে আধড্রাম অ্যালকোহল মেশান হল। শিশিটিকে ৮বার ঝাঁকি দিয়ে এক সেকেন্ডকাল ঘ্রাণ নিতে দেওয়া হল।

ওষুধ ঘ্রাণ নেওয়ার পর ব্যথা কমতে শুরু করে এবং তিনি ঘুমিয়ে পরেন।

১৭. ৩. ৭০ সব দিক থেকে ভাল। দাঁতের গোড়ায় সামান্য ব্যথা। খেতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। প্লাসিবো ৮ মাত্রা ৩ঘন্টা অন্তর।

১৯. ৩. ৭০ ভাল আছেন। কোন ব্যথা নেই। সামান্য লালা, দুর্গন্ধযুক্ত।

মার্কসল ০/১, এক সেকেন্ডের জন্য ঘ্রাণ, ১০বার ঝাঁকি দিয়ে। ৮মাত্রা প্লাসিবো, রোজ ২বার।

২২. ৩. ৭০ কোন কষ্ট নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।[৫৩]

২. উদরাময়

১০. ২. ৯৬ ভদ্রলোক। বয়স ৪৫। বাড়ি তৈরী ও বিক্রির ব্যবসা করেন। গত কয়েকমাস যাবত এক অদ্ভুতধরনের উদরাময়ে ভুগছেন। কিছু খেলেই পেট ফুলে ওঠে, ডাকে, ব্যথা হয়। তারপর অসাড়ে পায়খানা হয়ে যায়। বায়ু নিঃসরণ হচ্ছে না মল নিঃসরণ হচ্ছে বুঝতে পারে না। প্রচুর শ্লেষ্মা ও মল নিঃসরণ হয়। মলদ্বার আঙুরের থোকার ন্যায় বেরিয়ে পরে। মলদ্বারে জ্বালা। ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দিলে আরাম বোধ হয়। মলদ্বারে কম্পনের অনুভূতি। খাবার দেখলেই বমি আসে। এখন জল খেলেও পায়খানা হয়। এজন্য খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। মলদ্বারের ব্যথার সঙ্গে মাথাব্যথা ও কোমর ব্যথা পর্যায় ক্রমে চলে। সকালে ও গরমে বেশী কষ্ট পান। খেলে বাড়ে। খাদ্য ভীতি। ক্যানসার হওয়ার ভয়। ভদ্রলোক মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে বিয়ার মদ খান। সারা শরীরে জ্বালা। অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী এবং টোটকা অনেক হয়েছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে। ভেলোরে হাসপাতালে দেখিয়েছেন। ওখানে অপারেশন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে সারার কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে নি।

আলোচনা - অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত পাকস্থলিতে আলসার এবং উদরাময়। খাদ্যনালীতে অত্যাধিক অনুভূতি প্রবণতা। রোগীর খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। এমতাবস্থায় সামান্য বৃদ্ধিও অভিপ্রেত নয়। আমাদের ওষুধ এলো সকেট্রাইনা। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগের এটি আদর্শ স্থল। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগ। প্রচুর ওষুধ খাওয়া হয়েছে। শক্তি নিম্ন। ০/২, ১৪ মাত্রা। ১দাগ ওষুধ এক কাপ জলে মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে ১ চামচ খেতে হবে। বাকীটা ফেলে দিতে হবে। রোজ ৩বার।

---

৫৩. Dr. Harimohan Chaudhury. 50 M.L. Potency in Theory and Practice Jain Publishing Co. Page 89

১৫. ২. ৯৭ অনেকটা ভাল বোধ করছেন। খেতে পারছেন। বমির ভাব নেই। তবে খাওয়ার পর পায়খানা ও মলদ্বারে জ্বালা, মলদ্বারের বহিঃনিঃসরণ আছে। কয়েকবার অসাড়ে মলত্যাগ। প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

এলো ০/৩/১৪ মাত্রা। ১দিনে ২বার। আগের নিয়মে।

২৩. ২. ৯৭ ক্রমোন্নতি। খাওয়ার পরই পায়খানার বেগ হয়, তবে অসাড়ে হয়না। মুখে রুচি এসেছে। মলদ্বারের বহিঃনিঃসরণ ও জ্বালা।

এলো ০/৫/১৪ রোজ ২মাত্রা, আগের নিয়মে। এভাবে এলো ০/৭ ও ০/৯ প্রয়োগের পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

৩. এলার্জী

২৩. ৫. ৯৮ মেয়ে। বয়স ২০। স্বাস্থ্য ভাল। গত এক সপ্তাহ ধরে এলার্জীতে ভুগছে। ঘুম থেকে উঠলেই সারাগায়ে চাকাচাকা উদ্ভেদ বের হয়। চুলকায়, মুখচোখ ফুলে যায়। স্নান করলে আরও বেড়ে যায়। মুখে নতুন এক প্রসাধন সামগ্রী মাখার পর প্রথমে মুখে ব্রণ হয়। তারপর থেকে এই এলার্জী। এলার্জীর সময় প্রচন্ড দুর্বলতা বোধ হয়। হাতে ও পায়ের সন্ধি গুলো অবশভাব। হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যায়। তখন পেট খারাপ হয়। বার বার পাতলা পায়খানা হয়। এন্টি এলার্জী টেবলেট খেলে আগে কমতো। এখন আর বিশেষ কাজ হয় না।

আলোচনা – প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার থেকে সূত্রপাত, সঙ্গে হাতে পায়ে সন্ধির অবসন্নতা, হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাওয়া, উদরাময়, সকালে ও স্নানে বৃদ্ধি লক্ষণে বোভিস্টা নির্বাচিত হল।

বোভিস্টা ০/১, ১৬মাত্রা। দিনে ৩বার করে। ১কাপ জলে ১দাগ ওষুধ মিশিয়ে তার থেকে ১ চামচ খেতে হবে। বাকিটা ফেলে দিতে হবে।

২৮. ৫. ৯৮ এলার্জী অনেক কমে গেছে। এখন শুধু স্নান করার পর সামান্য হয়। বোভিস্টা ০/২, ১৬ মাত্রা, দিনে ২বার, আগের নিয়মে।

৫. ৬. ৯৮ কোন অসুবিধা নেই।

মন্তব্য - এলার্জী জাতীয় পীড়ায় দ্রুত উপশম দরকার। রোগী অতিমাত্রায় অনুভূতি প্রবণ থাকে। এজন্য ০/১ থেকে শুরু করে অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত। এ জাতীয় পীড়ায় ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও কার্যকরী।

৪. হাঁপানি

১৩. ১. ৮৩ শ্রীমতী ....। বয়স ১৮। ফর্সা, সুন্দর, চেহারা। গত ৫বছর ধরে হাঁপানি রোগে ভুগছে। প্রায়ই সর্দি কাশি লাগে। একটু ঠান্ডা লাগলেই প্রথমে নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে, হাঁচি হয়। ৩/৪ দিন পর সর্দি শুকিয়ে কাশি হয়। হাঁপানির টান শুরু হয়। প্রচন্ড কাশি। কাশতে কাশতে বমি হয়। ঘন হলদে ঢেলা ঢেলা শ্লেষ্মা পড়ে। তখন একটু উপশম হয়। হাঁপানির টানে দম বন্ধের মত অবস্থা হয়। নিঃশ্বাস নিতে বেশী কষ্ট। ছাড়তে কষ্ট কম হয়। শুয়ে থাকলে দম আটকে যায়। বসে থাকতে হয়। বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়। শীত শীত বোধ। রাত্রে, সকালে ও শীতকালে বৃদ্ধি। গ্রীষ্মকালে কম থাকে। গরমে উপশম বোধ করে। ঋতুস্রাবের সময় বাড়ে।

ঠান্ডা লাগার ধাত প্রথম থেকেই। টনসিল ফোলে, ব্যথা হয়। সারা শরীরে প্রায়ই ব্যথা হয়। ম্যাসাজ করলে ভাল লাগে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাড়ে। অত্যন্ত শীত কাতর। সারা শীতকাল ভোগে।

নিরামিষাশী। ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় পছন্দ করে। দুধ, মিষ্টি, নোন্তা পছন্দ করে। জল পিপাসা বেশী। ঘাম বেশী। ঘামে হলদে ছোপ পড়ে। স্নান করতে ভালবাসে, কিন্তু ঠান্ডা জলে স্নান করলে কষ্ট বাড়ে। ঋতুস্রাব ১৩ বছর বয়সে। প্রতিমাসে আগে আগে হয়। ৫/৬ দিন থাকে। প্রচুর হয়। কালচে লাল। আরম্ভ হওয়ার আগে অত্যন্ত ব্যথা হয়। আরম্ভ হলে ধীরে ধীরে কমে যায়। তখন হাত পা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সুরুচি সম্পন্না, নম্র। নার্ভাস। মনের জোরের অভাব। পরীক্ষার আগে উৎকন্ঠায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরীক্ষায় ভালই ফল করে। কাঁদুনে স্বভাব।

ছেলেবেলায় হাম হয়েছিল। সর্দিকাশি। হাঁটা কথাবলা তাড়াতাড়ি কিন্তু দাঁত দেরীতে উঠেছে। টিকা নিয়ম করে নিয়েছে।

বংশগত রোগ - হাঁপানি, বাত, যক্ষ্মা।

আলোচনা - একটি সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ে দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এ মেয়েটি প্রথম থেকেই সিলিসিয়া। সিলিসিয়া প্রথম থেকেই প্রয়োগ করলে এ কষ্টকর অবস্থা শুধু এড়ানো সম্ভব হত তা নয়, এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব হত। দীর্ঘদিনের পুরনো অসুখ বলে এবং বয়স কম বলে ০/১ থেকে আরম্ভ না করে ০/৩ দিয়ে শুরু করা হয়।

সিলিসিয়া ০/৩, ১৪ মাত্রা, এক কাপ জলে ১ দাগ ওষুধ মিশিয়ে ১চামচ ২বার করে।

২১. ১. ৮৩ হাঁপানির টান কেবল রাত্রের দিকে। তীব্রতা কম। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠছে। সিলিসিয়া ০/৫, ১৪মাত্রা রোজ সকালে ১ বার, সকালে, আগের নিয়মে।

৬. ২. ৮৩ হাঁপের টান তিনদিন হয়েছে। সর্দি নেই। গায়ের ব্যথাও কম।

সিলিসিয়া ০/৭, ১৪ মাত্রা রোজ ১বার একই নিয়মে।

২২. ২. ৮৩ একদিন হাঁপের টান হয়েছিল। মাসিকের সময় ব্যথা হয়েছে এবং প্রচুর হয়েছে। মনের জোর অনেকটা বেড়েছে। সিলিসিয়া ০/১০, ১৪মাত্রা একদিন অন্তর।

২৮. ৩. ৮৩ সর্দি লাগার প্রবণতা কমলেও আছে। পূর্ণিমার দিন হাঁপের খুব টান উঠেছিল। তবে আপনা থেকে কমে যায়। সমস্যাগুলো একটা জায়গায় এসে থমকে রয়েছে। ছোট ক্রিমির উৎপাত খুব বেড়েছে।

টিউবার কুলিনাম ১হাজার এক মাত্রা এবং ৩০ দিনের প্লাসিবো।

১০. ৫. ৮৩ প্রচুর সর্দি বের হয়েছে। আগের মত দম বন্ধকরা টান হয় না। কিন্তু সর্দি হলে শ্বাসের একটু কষ্ট হয়। সর্দি বের হয়ে গেলে কমে যায়। মাসিকের সমস্যা অনেকটা কমে গেছে।

সিলিসিয়া ০/১২, ১দিন অন্তর।

এভাবে সিলিসিয়া ক্রমোন্নত শক্তিতে ২০ শক্তি অবধি প্রয়োগ করায় তার হাঁপানি শুধু নিরাময় হয় না, তার অন্যান্য অসুবিধাগুলোও দূর হয়ে যায়।

মন্তব্য – মায়াজমের বাধা অপসারণের জন্য অনেক সময় অন্তবর্তী ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। তাতে আরোগ্যক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং সুসম্পন্ন হয়।

৫. আধ কপালে মাথা ব্যথা

১৫. ৭. ৮১ শ্রীমতী ....। বয়স ৩০। ভাল গড়ন। গত ১৫ বছর ধরে মাথাব্যথায় ভুগছেন। মাথার বাম দিক বেশী আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ শেষ রাত্রের দিকে ব্যথা শুরু হয়। ঘুম ভেঙে যায়। ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়ে। দুপুরের পর থেকে ব্যথা অসহ্য হয়। মনে হয় কপালে কেউ পেরেক ফুটিয়ে দিচ্ছে। তাকাতে কষ্ট হয়। বমি হয়। বিছানায় চুপচাপ পা গুটিয়ে শুয়ে থাকলে কিছুটা আরাম লাগে। ২৪ ঘন্টার মত এ অবস্থা থাকে। তারপর ধীরে ধীরে কমে। আগে ২/৩ মাস অন্তর অন্তর হত। এখন প্রতিমাসে ২বার থেকে ৩বার।

ছেলেবেলায় বাম কানে খুব ব্যথা হত। ঘন পুঁজ পরত। অস্ত্রোপচার করার পর কমে। তার কিছুকাল পর থেকে এই মাথা ব্যথা শুরু হয়।

সর্দিকাশি ছেলেবেলা থেকেই আছে। বাম নাকে পলিপ। রাত্রে নাক বন্ধ হয়ে যায়। নাকে ড্রপ না দিলে ঘুমুতে পারেন না।

ঋতুস্রাব দেরীতে হয়। পরিমাণ অত্যন্ত কম। অত্যন্ত ব্যথা। ঢেলা ঢেলা পড়ে। ঋতুর পূর্বে খুব ঘাম হয়। তখন বুঝতে পারেন এবার শুরু হবে। সাদা স্রাব খুব বেশী ছিল। ঘন ঘন হলদে, আঁসটে গন্ধ। হাজা কারক। 'কোটারাইজেন' করার পর কমে। শরীরে ছোট ছোট অনেক আঁচিল আছে।

শীতকাতর। আলু, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন পছন্দ করেননা। নোন্তা ও মিষ্টি পছন্দ। অত্যন্ত অভিমানী। কোন কথা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। রাগ বেশী। রাগ হলে মাথা ব্যথা হয়।

বংশে বাত, হাঁপানি ও একজিমার ইতিহাস।

আলোচনা - আধকপালে মাথা ব্যথা একটি একদৈশিক রোগ (one sided disease). এ যেমনি কষ্টকর তেমনি দুরারোগ্য। এ রোগে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রোগীলিপি প্রস্তুত করে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। রোগী যেহেতু সামান্য বৃদ্ধি ও সহ্য করতে পারেনা এজন্য ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগই শ্রেয়। এখন মাথাব্যথা নেই, তবে যে কোন সময হতে পারে।

থুজা ০/৩, ১৬মাত্রা রোজ ২বার আগের বর্ণিত নিয়মে।

২৪. ৭. ৮১ ওষুধ খাওয়ার ৩দিন পর মাথা ব্যথা হয়েছিল। তীব্রতাও ছিল। তবে ১২ ঘন্টার মধ্যে কমে। থুজা ০/৫, ১৪ মাত্রা রোজ সকালে ১বার।

১০. ৮. ৮১ মাথাব্যথা দুদিন হয়েছে। ১২ ঘন্টা ছিল। তীব্রতা কম। ঋতুস্রাবের ব্যথা কম, পরিমাণে বেশী। প্রচুর ঘন সর্দি নির্গত হয়েছে। থুজা ০/৭, ১৪মাত্রা, রোজ ১বার।

২৬. ৮. ৮১ মাথা ব্যথা একবার, তীব্রতা কম। ৬ঘন্টা ছিল। সর্দি লাগেনি।

থুজা ০/১০/১৪, একদিন অন্তর।

৩. ১০. ৮১ মাথা ব্যথা হয়নি। কান দিয়ে পূঁজস্রাব, কিন্তু ব্যথা হয়নি। ঘন হলদে পূঁজের মত সাদাস্রাব। মনের দিক থেকে প্রফুল্ল।

থুজা ০/১৩/১২ ২দিন অন্তর একবার।

১২. ১১. ৮১ মাথাব্যথা হয়নি। কানে পূঁজ কম। সাদাস্রাব কম।

থুজা ০/১৬, ১০ মাত্রা ৪দিন অন্তর ১বার।

১. ১. ৮২ মাথা ব্যথা একদিন হয়েছিল, আপনা থেকেই চলে যায়। কানে পূঁজস্রাব হয়নি। সাদাস্রাব হয়নি। রোগিনী সব দিক থেকে ভাল বোধ করছেন। প্লাসিবো।

১০. ৪. ৮২ মাথা ব্যথা আর হয়নি। রোগীনী সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন।

মন্তব্য

১. ৫০ সহস্রতমিক ওষুধ চিকিৎসায় রোগী ক্রমাগত ভাল বোধ করতে থাকে, কিন্তু শেষের দিকে সামান্য বৃদ্ধি দেখা দেয়। তখন বুঝতে হবে আরোগ্যক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া আসন্ন। সে সময় কোন ওষুধ প্রয়োগ না করে অপেক্ষা করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বৃদ্ধি আপনা থেকে কমে যায় এবং আর ওষুধের প্রয়োজন হয় না। যদি তবু পূর্বতন লক্ষণগুলো থেকে যায় তবে পূর্বে প্রদত্ত ওষুধটি উচ্চতর শক্তিতে কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হয়। আরোগ্যক্রিয়া সম্পন্ন হল কিনা তা বোঝার এটাই বিশ্বস্ত পথ।

২. কানের পূঁজ ও সাদাস্রাব চাপা পড়ায় আধ কপালে মাথা ব্যথার উৎপত্তি। এ সকল স্রাবের পুনঃপ্রকাশ আরোগ্য ক্রিয়া ঠিক পথে চলছে তা প্রমান করে।

৬. সেপটিক টনসিল

২৫. ১. ৮২ শ্রীমতী ....। বয়স ৩২। ফর্সা, শক্তসমর্থ চেহেরা। মলিনমুখ। মুখ মণ্ডলে যন্ত্রণার বলিরেখা। সেপটিক টনসিলে ভুগছেন। গলার ভেতরে দুদিকে দুটি সুপুরির মত টনসিল। অত্যন্ত ব্যথা। ঘন সবুজ হলদে পূঁজ। জ্বর ১০২°। কিছু খেতে পারছেন না। এন্টিবায়োটিক খাচ্ছেন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। সর্দিকাশি প্রায়ই লাগে। টনসিলে প্রদাহ হয়। বুকে ব্যথা হয়। ব্রঙ্কাইটিস হয়। যতক্ষণ না কাশতে কাশতে ঘন সবুজ হলদে শ্লেষ্মা বের হয় ততক্ষণ কাশি হতেই থাকে। এন্টিবায়োটিক খেলে ধীরে ধীরে কমে। কিন্তু এবার টনসিলের ব্যথা ও পূঁজ কিছুতেই কমছে না। জ্বর ছাড়ছে না।

মাসিক ঋতুস্রাব সময় মত হয়। প্রচুর পরিমাণে হয়। প্রচণ্ড ব্যথা হয়। শ্বেত প্রদর স্রাবও হলদে সবুজ, হাজাকারক।

ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়া, জণ্ডিস হয়। কোমরে একজিমা ছিল, মলমে সারে। হাতে একটি বড় আঁচিল ছিল। চূন দিয়ে তাকে বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭০ সালে যমজ মেয়ে সন্তান প্রসব হয়। তখন প্রবল বর্ষা চলছিল। গ্রামে আর্দ্র আবহাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে ঘরে প্রসব হয় এবং সেখানে মাসখানেক থাকতে হয়। তখন সর্দিকাশি জ্বর ও টনসিল প্রদাহে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যমজ মেয়ে সন্তান প্রসব হওয়ায় যেমন প্রচণ্ড দৈহিক কষ্ট হয় তেমনি মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

গরমকাতর। বর্ষাকালে ও শীতকালে সর্দিকাশি ও হাঁপানির টান হয়। মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে। বিরক্তিভাব। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। মনে হয় এ জীবন রেখে কোন লাভ নেই। নিজেরও যমজ কন্যাসন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

বংশগত রোগের ইতিহাস — বাত, হাঁপানি, ডায়াবেটিস।

আলোচনা — রোগিনীতে নেট্রামসালফের জীবন্ত মূর্তি অত্যন্ত প্রকট। টনসিলে সেপটিক অবস্থা, জ্বর, কাশি চলছে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দ্রুত উপশমের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অতএব ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ একেবারে নিম্ন থেকে ঘন ঘন প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

নেট্রামসালফ ০/১, ১৬মাত্রা, ৬ঘন্টা অন্তর অন্তর চারবার। এককাপ জলে ১মাত্রা ওষুধ নিয়ে ১চামচ খেতে হবে।

৩০. ১. ৮২ জ্বর ছেড়েছে। টনসিল থেকে পূঁজ পড়া কিছুটা কম হয়েছে। প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব উঠেছে। সামান্য কিছু তরল খাদ্য খেতে পারছেন।

নেট্রাম সালফ ০/২, ১৬মাত্রা দিনে ৩বার, একইভাবে।

৭. ২. ৮২ টনসিলের ফোলা অনেকটা কম। পূঁজও খুব কম। শ্লেষ্মাস্রাব উঠছে। জ্বর হয়নি। ভাত পথ্য করতে পারছেন।

নেট্রাম সালফ ০/৩, ১৬মাত্রা রোজ ২বার, একই নিয়মে।

১৬. ২. ৮২ টনসিলের ঘা নেই। ফোলা সামান্য। ব্যথা নেই। সর্দি এখনও উঠছে।

নেট্রাম সালফ ০/৫, ১২মাত্রা রোজ ১বার।

২৮. ২. ৮২ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় আবার টনসিল প্রদাহ, সর্দিকাশি। হাঁপের মত হচ্ছে।

নেট্রাম সালফ ০/৭, ১২ মাত্রা, প্রথম ২দিন ২বার তারপর থেকে একবার করে।

১০. ৩. ৮২ সর্দিকাশি জ্বর নেই। টনসিল স্বাভাবিক। গায়ে এক প্রকার উদ্ভেদ উঠেছে। অত্যন্ত চুলকানি। চুলকালে রস বের হয়।

নেট্রাম সালফ ০/১০, ১২মাত্রা প্রত্যহ একবার।

২৫. ৩. ৮২ ভাল আছেন। কোন অসুবিধা নেই।

৭. কিডনীর ক্যানসার

শ্রীমতী ....। বয়স ১২। অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল। চোখ কোটরাগত। মুমূর্ষু। বাম কিডনীতে ক্যানসার হয়েছিল। ১০. ৭. ২০০১ সালে হায়দ্রাবাদে অ্যাপলো হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে সেটিকে বাদ দেওয়া হয়। ডায়াগনসিস left renal wilm's tumour । পরে সেখানে chemotherapy শুরু করা হয়। ১৯.৭. ২০০১ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। (Discharge summary dated 19.7.2001). কলকাতায় মোট ১২টি chemotherapy করাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কলকাতায় ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে যেখানে আগে ওর চিকিৎসা হচ্ছিল সেখানেই বাকী chemotherapy দেওয়া শুরু হয়। ইতিমধ্যে লিভারের বাম দিকে ও গলায় ক্যানসার সংক্রামিত হয় (metastasis)। ওর অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হয়। চুলগুলি সব পরে যায়। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় বাড়িতে মৃত্যুর প্রহর গোনার জন্য। এ অবস্থায় ২৬. ২. ২০০২ তারিখে শ্রদ্ধেয় ডাঃ নিমাই চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমি রোগী দেখার জন্য রোগীর বাড়িতে যাই।

বর্তমান অবস্থা — গলায় ও ডান কানে প্রচণ্ড ব্যথা। গলায় ঘা। অত্যন্ত জ্বালা। মুখ হাঁ করতে পারছে না। কিছু খেতে পারছে না। তরল খাদ্য মুখে দিলে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পিপাসা খুব কম। খিদে আছে কিন্তু খেতে পারছে না। ঘাড়ের গ্রন্থিগুলো শক্ত ও ফোলা। লিভারে স্পর্শকাতর ব্যথা। পেটের উপরদিকে ব্যথা। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্তপাত হয়। কালচে লাল রক্ত। গত ৩দিন মলত্যাগ হয়নি। দিনরাত্রি ব্যথায় আর্তনাদ করছে। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে মারা যাবে। বাড়ির সকলে সে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুকে কিছুটা কষ্টবিহীন করা যায় কিনা সেজন্য হোমিওপ্যাথিতে শেষ চেষ্টা করা সাব্যস্ত হয়।

ছেলেবেলায় হাঁটা, দাঁত ওঠা সময় মত হয়েছিল। কথা বলা দেরীতে। বুদ্ধির বিকাশ অত্যন্ত শ্লথ (mental retardation). অত্যন্ত জেদী, রাগী, বদমেজাজী।

যা বলবে, তাই করবে। যা বায়না করবে তাই দিতে হবে। পাঁচ বছর পর ছোট বোন হয়। ভাবতো ছোট বোনকে সকলে বেশী ভাল বাসছে, যত্ন করছে। ওকে সকলে অবহেলা করছে। ঈর্ষাকাতর হয়। ছোট বোনকে মারত। আবার কেউ না থাকলে ওকে আদরও করত। বাম টনসিলে ব্যথা হয়। অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর প্রায়ই পেট ব্যথা হত। রাত্রে বাড়তো। ঘুমুতে পারতো না। পেটব্যথা হলে বমি হত। এরকম চলতে চলতে রক্তবমি হওয়ায় পরীক্ষায় ক্যানসার ধরা পরে।

মায়ের বাত, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ এবং বাবার দিকে হার্টের রোগ ও মানসিক রোগ এবং আত্মহত্যার ইতিহাস।

২৬. ২. ০২ ল্যাকেসিস ০/১/১৬ মাত্রা। এক কাপ জলে ১মাত্রা মিশিয়ে তার থেকে এক চামচ খেতে হবে। বাকীটা ফেলে দিতে হবে। প্রত্যহ ২বার।

বিকালে প্রথম ওষুধ খাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে উঠে খেতে চায়। সারাদিনে ২ গ্লাস হরলিক্স খায়। ব্যথা কিছুটা কম। ভয় ভাব কম। পরেরদিনও তাই। তারপরের দিন এক বেলা নরম ভাত খায়। সারাদিনে কয়েকবার হরলিক্স খায়। রক্তপাত হয়নি।

৬. ৩. ০২ উন্নতি অব্যাহত। পেটে ব্যথা নেই। লিভার প্রদেশে শক্তভাব। টিপলে লাগে। গলা ব্যথা নেই। ঘাড়ের গ্রন্থিস্ফীতি আছে। রোজ খাওয়া দাওয়া করছে। পায়খানা নিয়মিত হচ্ছে। ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারে।

ল্যাকেসিস ০/২/১৬ মাত্রা আগের নিয়মে।

১৪. ৩. ০২ উন্নতি অব্যাহত। ল্যাকেসিস ০/৩/১৬ একই নিয়মে।

২১. ৩. ০২ লিভার প্রদেশে ব্যথা। বমি বমি ভাব। অত্যন্ত দুর্বলতা।

স্কিরিনাম ২০০ (scirrhinum 200) ১মাত্রা।

২৮. ৩. ০২ অনেকটা ভাল। ল্যাকেসিস ০/৪/১৬ প্রত্যহ দু মাত্রা।

৯. ৮. ০২ পেটের বাম দিকে ব্যথা। লিভারে সামান্য ব্যথা। গলায় জ্বালা ও ব্যথা। মূত্র পরীক্ষায় সব স্বাভাবিক পাওয়া যায়।

স্কিরিনাম ২০০, ১মাত্রা।

১৩. ৪. ০২ ভাল আছে। লিভারের স্থানে সামান্য ব্যথা। দুর্বলতা।

ল্যাকেসিস ০/৫/১৬ প্রত্যহ ২মাত্রা।

২১. ৪. ০২ উন্নতি অব্যাহত। ল্যাকেসিস ০/৭/১৬ প্রত্যহ ২মাত্রা।

উন্নতি অব্যাহত থাকায় ২৬. ৪. ০২ ০/৯/১৬ প্রত্যহ ১মাত্রা এবং ১৬. ৫. ০২ তারিখে স্কিরিনাম ২০০ ১মাত্রায় এবং ১৫. ৬. ০২ তারিখে ল্যাকেসিস ০/১১/১৬ প্রত্যহ ১ মাত্রা প্রয়োগ করা হয়। ২. ৭. ০২ তারিখে ল্যাকেসিস ০/১৩/১৬ একদিন অন্তর প্রয়োগ করা হয়। এমনি ভাবে ল্যাকেসিস ওষুধটি প্রয়োগ করা হতে থাকে।

৪. ১০. ০২ রোগীর উন্নতি অব্যাহত। স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে।

বর্তমানে ল্যাকেসিস দীর্ঘকাল অন্তর অন্তর চলছে। কতদিন বাঁচবে, কিভাবে বাঁচবে জানি না। তবে বেঁচে আছে, ভাল আছে। সবাইকে ভাল রাখছে।

মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ কোন বিবেকবান চিকিৎসকই জীবনের আশা ছেড়ে দিতে পারেন না। সকল মানুষের সকল প্রকার রোগের সকল অবস্থায় হোমিওপ্যাথি সমভাবে কার্যকরী, যদি আমরা নীতি মেনে ওষুধ প্রয়োগ করি। এতে আরোগ্য যোগ্য রোগ আরোগ্য হয়। তার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে আসে। এমনকি যেখানে মৃত্যু অনিবার্য ও সমাসন্ন সেখানেও যন্ত্রনা ও কষ্টের উপশম হয়। আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত হয়। মৃত্যু সুখকর, শান্তিময় ও সুন্দর হয়। এর চেয়ে বড় কাম্য আর কি হতেপারে?

চতুর্থ বিভাগ

বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের রোগী বিবিরণী

মহাজনাঃ যেন গতাঃ স পন্থা। মহাপুরুষরা যে পথে গিয়েছেন সেই হল পথ। একথা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে আরও বেশী করে প্রযোজ্য। যিনি এ চিকিৎসাপদ্ধতি আবিস্কার করেছেন এবং সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে একে এক পূর্ণাঙ্গ ত্রুটিবিহীন চিকিৎসাকলায় পরিণত করেছেন এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ যাঁরা এ পদ্ধতিকে জনগনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর উৎকর্ষতা প্রমান করেছেন। রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা এক অমূল্য দলিল। হ্যানিম্যান, কেন্ট, ক্লার্ক, ওয়েসেলহিফট, লিপি, ন্যাস, মার্গারেট টাইলার, জনউইয়ার, জে. এন. কাঞ্জিলাল, বিজয় কুমার প্রমুখ শিক্ষক চিকিৎসকদের চিকিৎসিত কিছু রোগী বিবরণী এবার আমরা উথাপিত করছি। এগুলো বার বার পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এগুলো হবে আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথে পাথেয়। আমরা এগিয়ে যাব পূর্ণতার দিকে, আদর্শ চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্যে।

হ্যানিম্যানের চিকিৎসিত চারটি রোগী বিবরণী

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রয়োগক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটি মুক্ত করার জন্য হ্যানিম্যান দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে কৌতুহল জাগে হ্যানিম্যান কেমন করে ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করতেন। সেই কৌতুহল নিরসনের জন্য এবং তাঁর নির্দেশ কেমন করে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে হয় তা বোঝাবার জন্য আমরা তাঁর চিকিৎসিত চারটি রোগী বিবরণী সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

এ বিষয়ে হ্যানিম্যানের অভিমত

হ্যানিম্যান তাঁর চিকিৎসিত রোগী বিবরণী প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেননা এতে চিকিৎসকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। হ্যানিম্যানের পরিচিত বহু ব্যক্তি যাঁরা হোমিওপ্যাথিতে অর্ধশিক্ষিত তাঁরা হ্যানিম্যানকে প্রায়ই অনুরোধ করতেন, কেমন করে এবং কোথা থেকে শুরু করে অগ্রসর হওয়া যায় সে সম্বন্ধে রোগী বিবরণী সহ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এতে হ্যানিম্যান খুবই আশ্চর্য বোধ করতেন। অর্গাননে এবিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করা আছে যে নতুন করে আর কিইবা বলার থাকতে পারে? তাছাড়া প্রতিটি রোগী স্বতন্ত্র। প্রতিটি রোগীকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে তার রোগাবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত ওষুধ মেটেরিয়া মেডিকা থেকে খুঁজে বের করতে হবে। ওষুধ নিজের উপর পরীক্ষা করে তার যথার্থ পরিচয় জানতে হবে। আমরা শুধু অন্যের পরিশ্রম

করা ফল গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করব, অর্থোপার্জন করে ভোগ করব, কিন্তু সেই শাস্ত্রের জন্য কিছু করব না, আমরা শুধু নেব, দেব না কিছুই এ হতে পারে না, হওয়া সঙ্গত নয়। তথাপি তিনি বন্ধুদের ইচ্ছার প্রতি মর্যাদা রেখে অতি সাধারণ ধরনের দুটি কেস (case) বিবৃত করেছেন। অনেক লক্ষণ বিশিষ্ট জটিল 'কেস' বিশ্লেষণ করে ওষুধ নির্বাচন বর্ণনা করা বক্তা ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। আর দুটি রোগী বিবরণী ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল বোনিং হোসেনকে লেখা চিঠি থেকে পাওয়া যায়। এটি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে New Archive-এ প্রকাশিত হয়।[৫৭]

১. উদরশূল

এক ধোপা রমণী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গত তিন সপ্তাহ ধরে পেটে এক প্রকার ব্যথায় ভুগছে। এর জন্য কোন কাজ করতে পারছে না। রুজি রোজগার বন্ধ। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি হ্যানিম্যানের শরণাপন্ন হন। তার উপসর্গগুলো নিম্নরূপ ছিল ঃ

১. প্রতি নড়াচড়ায় পেটে হঠাৎ শক লাগার মত তীব্র ব্যথা হয়। চলার সময় পা যদি ঠিক মত না পরে (false step) তাহলে ব্যথা আরও তীব্র হয়। ব্যথাটা সব সময় বাঁ দিক থেকে আসে। পেটের পাশে বা তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয় না।

২. শুয়ে থাকলে কোথাও কোন ব্যথা অনুভূত হয় না।

৩. রাত ৩টার পর আর শুয়ে থাকতে পারে না।

৪. খেতে ভালবাসে, কিন্তু সামান্য খেলেই অসুস্থ বোধ করে।

৫. তখন মুখে জল আসে এবং মুখ দিয়ে সে জল বের হয়ে আসে।

৬. প্রতিবার খাওয়ার পর ঘনঘন শূন্য উদগার ওঠে।

---

৫৭. R.E. Dudgeen. The Lesser Writings of Hahnemann B. Jain Publishes (p) Ltd 1989. Page 766

৭. মেজাজ খিট খিটে। সহজেই রেগে যায়।

৮. ব্যথা যখন বেশী হয় তখন সারা শরীর ঘামে আপ্লুত হয়ে যায়। মাসিক স্রাব নিয়মিত। অন্য সব দিক থেকে তার স্বাস্থ্য ভালই বলা যায়।

হ্যানিম্যান সমগ্র কেসটি বিশ্লেষণ করে ব্রায়োনিয়া ওষুধটি নির্বাচন করেন। আমরা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে হ্যানিম্যান কেমন করে সিদ্ধান্ত নিতেন তা তাঁরই ভাষায় বর্ণনা করছি। (ওষুধ নির্বাচনের বিস্তারিত বিবরণের জন্য J.H. Clarke এর Prescriber-এ ৪৬ পৃষ্ঠা এবং R.E. Dudgeon সম্পাদিত The Lesser Writings of Hahnemann - Page 766 দ্রষ্টব্য)

এই মহিলা বেশ শক্ত সমর্থ (robust)। এর রোগ প্রবল ছিল, কেননা ব্যথার জন্য সে কোন কাজকর্ম করতে পারত না। কিন্তু তার জীবনীশক্তি খুব বেশী দুর্বল হয়নি। কাজেই প্রবল ক্রিয়া করতে সক্ষম এমন শক্তি ও মাত্রা (Strongest homoeopathic dose) দিতে মনস্থ করি। ব্রায়োনিয়ার শিকড়ের টাটকা রস, জল বা সুরাসারের সঙ্গে না মিশিয়ে, এক ফোঁটা তাকে তক্ষুনি প্রদান করা হল। পরের দিনই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আগের মত কাজ করতে শুরু করে।

২. মানসিক বিকৃতি

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪২। জুলি এম. এক গ্রাম্য বালিকা, বয়স ১৪। এখনও ঋতুস্রাব দেখা দেয়নি। একমাস পূর্বে সে রোদে ঘুমিয়েছিল। এর চারদিন পর থেকে তার মাথায় একটা ভীতিপ্রদ ধারণা বাসা বাঁধে যে সে একটা নেকড়ে বাঘ দেখেছে। এর ছ'দিন পর তার বোধ হতে থাকে যে তার মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তারপর থেকে সে পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করল। আবোল তাবোল বলতে লাগল। খুব কাঁদত। কখনও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হত। সাদা শ্লেষ্মা থুথু করে ফেলতে লাগল। নিজের কোন অনুভূতির কথা বলতে পারল না।

বেলেডোনা[১৭] ৭ টেবিল চামচ জলের সঙ্গে মেশান হল। (হ্যানিম্যান পোস্তদানার মত একটি অনুবটিকা একমাত্রা হিসাবে ব্যবহার করতেন। —লেখক) এই মিশ্রণ থেকে এক টেবিল চামচ নিয়ে এক গ্লাস জলে মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে এক চা চামচ ওষুধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাওয়ার জন্য বলা হল।

১৬.৯.৪২ কিছুটা শান্ত। সে এখন নাক ঝাড়তে পারে যা সে উন্মত্তাবস্থায় করতে পারতো না। সে এখনও আবোল তাবোল বলে, কিন্তু আগের মত কথা বলার সময় ভেংচি কাটে না। গত রাতেও সে খুব কেঁদেছে। পায়খানা পরিষ্কার হয়েছে। ঘুমও মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে সে এখনও অস্থির প্রকৃতির, যদিও আগের চেয়ে কম। চোখের সাদা অংশ রক্ত কণিকায় পূর্ণ। মনে হয় ঘাড়ের পেছনে ব্যথা আছে।

যে গ্লাসে এক টেবিল চামচ মেশান হয়েছিল তার থেকে আবার এক চামচ ওষুধ আরেকটি জলপূর্ণ গ্লাসে মিশিয়ে তার থেকে প্রথম দিন সকালে দু'চামচ, পরের দিন তিন চামচ এবং তার পরের দিন চার চামচ করে খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

২০.৯.৪২ অনেকটা ভাল। কথাবার্তা আগের চেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। কিছুটা কাজকর্ম করতে পারছে। আমাকে চিনতে ও নামধরে সম্বোধন করতে পারছে। উপস্থিত এক ভদ্রমহিলাকে চুমু খেতে চাইছে। তারমধ্যে কাম ভাবের প্রকাশ দেখা গেছে। সহজেই কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। কোন কথার খারাপ দিকটা গ্রহণ করে। ঘুম ভাল হয়। প্রায়ই কাঁদে। সহজেই রেগে যায়। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী খায়। যখন স্বাভাবিক থাকে তখন ছোট শিশুরা যেমন খেলা করে তেমন খেলা করতে ভালবাসে।

---

১৭. বোনিংহোসেন বলেন, যেখানে কোন শক্তির উল্লেখ নেই সেখানে ৩০ শক্তি বুঝতে হবে।

বেলেডোনার উচ্চতর শক্তির একটি অনুবটিকা সাত টেবিল চামচ জলে মেশান হল। তা পরপর দুটি গ্লাসে নেড়ে তা ছ'চামচ সকালে গ্রহণ করতে হবে। (ডাজনের মতে একটি অণুবটিকা প্রথমে একটি গ্লাসে ৭ টেবিল চামচ জলে মিশিয়ে তা থেকে এক টেবিল চামচ দ্বিতীয় গ্লাসে অনুরূপভাবে জলে ভালকরে নেড়ে মেশাতে হবে। এই দ্বিতীয় গ্লাস থেকে এক চামচ করে প্রত্যহ সকালে খেতে হবে।)

২৮.৯.৪২—২২, ২৩ ও ২৪ তারিখ সারা দিন রাত অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। কথাবার্তা ও আচরণে অত্যন্ত কামুকতা। নিজের পরিধেয় উপরে তুলে ধরে এবং অন্যের জননযন্ত্র স্পর্শ করতে চায়। সহজেই রেগে যায় এবং অন্যকে মারতে যায়।

হায়োসায়ামাস১০ আগের মত একটি অনুবটিকা একটি গ্লাসে সাত টেবিল চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা থেকে এক টেবিল চামচ আরেকটি গ্লাসে অনুরূপ ভাবে মিশিয়ে তা থেকে এক চা চামচ রোজ সকালে খেতে হবে।

৫.১০.৪২ গত পাঁচদিন কিছুই খায়নি। পেট ব্যথা। আগের চেয়ে কম বিদ্বেষপরায়ণ (malicious). কামুকতা কম। পাতলা পায়খানা। সারা শরীরে চুলকানি। জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি বেশী। ঘুম ভাল।

স্যাকল্যাক৭দিনের জন্য। আগের মত সাত টেবিল চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে একইভাবে খেতে হবে।

১০. ১০. ৪২-গত ৭ তারিখ অত্যধিক রাগভাব দেখা যায়। যাকে কাছে পায় তাকেই মারতে চায়। পরের দিন প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নেকড়ে বাঘ দেখেছিল বলে যেমনটি হয়েছিল। দগ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়। তারপর দিন থেকে সে শান্ত হয়েছে। কথাবর্তা স্বাভাবিক। গত দুদিন কোন অশ্লীল আচরণ করেনি।

স্যাকল্যাক, আগের মত।

১৪. ১০. ৪২-ভাল আছে। আচার আচরণ ও কথাবার্তা স্বাভাবিক।

১৮. ১০. ৪২-ভাল আছে। তবে অত্যন্ত মাথাব্যথা। দিবা নিদ্রার ইচ্ছা। আগের মত অতটা প্রফুল্ল নয়।

সালফার আধুনিক শক্তিকৃত ক্ষুদ্রমাত্রা (অর্থাৎ ১/০)। একটি অনুবটিকা পর পর তিন গ্লাস জলে আগের নিয়মে রোজ সকালে ১চামচ করে খেতে হবে।

২২. ১০. ৪২-খুব ভাল আছে। মাথা ব্যথা প্রায় নেই। সালফার ২/০, পরপর তিন গ্লাস জলে আগের নিয়মে। রোজ সকালে এক চামচ করে খেতে হবে। এভাবে তাকে নভেম্বর পর্যন্ত মাঝে মাঝে সালফার দেওয়া হল। সে এখন পর্যন্ত সুস্থ, স্বাভাবিক এবং নম্র (amiable) আছে।

মন্তব্য

এ রোগী বিবরণী থেকে বোঝা যায় হ্যানিম্যান কত ক্ষুদ্রমাত্রা ব্যবহার করতেন। এ থেকে এও বোঝা যায় হ্যানিম্যান প্রয়োজন বোধে একই রোগীর ক্ষেত্রে শততমিক ও পঞ্চাশসহস্রতমিক শক্তির ওষুধ প্রয়োগ করতেন।

৩.গলক্ষত

১৪. ১. ৪৩, ও-টি একজন অভিনেতা। বয়স ৩৩। বিবাহিত। গত কয়েক বছর প্রায়ই গলক্ষতরোগে (sore throat) ভোগেন। এবার প্রায় একমাস ধরে গলায় ক্ষতরোগে আবার ভুগছেন। গতবার আক্রমণে ছ'সপ্তাহ ভুগেছিলেন। ঢোকগেলার সময় গলায় খোঁচামারা অনুভূতি, তৎসহ গলায় সঙ্কোচন বোধ। মনে হয় গলার ভেতর ছাল উঠে গেছে (excoriation) যখন গলক্ষত থাকে না তখন তিনি মলদ্বারে একটা চাপ বোধ করেন। মলদ্বার তখন প্রাদাহিত, স্ফীত ও সঙ্কোচিত থাকে। স্ফীত অর্শেরবলির বহিঃনিঃসরণ হয়। অত্যন্ত কষ্টকরে তখন মলত্যাগ করতে হয়।

১৫ই জানুয়ারী। প্রাতঃরাশের পূর্বে বেলেডোনা, তখনকার সময় নিম্নতম

শক্তি (then the lowest dynamization) (১/০ - লেখক)। সাত বড় টেবিল চামচ জলে মিশিয়ে তা থেকে এক বড় চামচ জলে মিশিয়ে তা থেকে কে এক ছোট চামচ (চা চামচ) রোজ সকালে খেতে হবে।

১৫ই জানুয়ারী - গলক্ষত নেই। কিন্তু মলদ্বারে পূর্বে বর্ণিত রোগ আবার দেখা দিয়েছে। ক্ষতবোধ, জ্বালাসহ উন্মুক্ত ফিসার। প্রদাহ, স্ফীতভাব, দপদপানি ব্যথা এবং সঙ্কোচন বোধ। সন্ধ্যার দিকে কষ্টকর মলত্যাগ।

তিনি এখন স্বীকার করেন যে আটবছর পূর্বে তার স্যাঙ্কার হয়েছিল যা যথারীতি কষ্টিক দিয়ে দূর করা হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর এ সকল কষ্টের সূত্রপাত।

১৮ই জানুয়ারী — মার্ক ভাইভাম ১/০। একটি অনুবটিকা দিয়ে বেলেডোনার মত তৈরী করে আগের মতই গ্রহণ করতে হবে। শিশিটি প্রতিবার ঝাঁকি দিতে হবে।

২০শে জানুয়ারী — গলক্ষত প্রায় নেই। মলদ্বারের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু মলত্যাগের পর ক্ষতবোধ বেদনা এখনও আছে। মলদ্বারে স্ফীতি, দপদপানি ব্যথা এবং প্রদাহ নেই। মলদ্বার আগের চেয়ে কম সঙ্কোচিত।

মার্কভাইভাম ২/০ একইভাবে প্রস্তুত করে একইভাবে খেতে হবে।

২৫শে জানুয়ারী — গলা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু মলদ্বারে তীরবেঁধার মত তীব্র বেদনা। মলত্যাগের পর ব্যথা আরও তীব্র হয়। কিছুটা সঙ্কোচনভাব ও তাপবোধ আছে।

৩০শে জানুয়ারী — অপরাহ্নে শেষ মাত্রা (এক চামচ)। ২৮ তারিখ মলদ্বার ভাল ছিল। গলক্ষত পুনরায় দেখা দিয়েছে। তাতে অত্যন্ত ক্ষতবোধ বেদনা।একটি অনুবোটিকা সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশিয়ে সাতদিন ধরে আগের নিয়মে খেতে হবে।

৭ই ফেব্রুয়ারী — গলায় অত্যাধিক ক্ষতজনক বেদনা। পেট ব্যথা, কিন্তু মলত্যাগ পর পর কয়েকবার হয়েছে। তৃষ্ণা আছে। মলদ্বার স্বাভাবিক।

সালফার ২/০, পূর্বের নিয়মে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী — গলায় ক্ষতজনক ব্যথা, বিশেষকরে ঢোঁক গেলার সময়। প্রচুর পরিমাণে লালা বের হচ্ছে। ১১ই ও ১২ই তারিখ লালার পরিমাণ অত্যধিক ছিল। মলদ্বারে অত্যন্ত সঙ্কোচন, বিশেষকরে গতকাল থেকে, তাকে মাকভাইভামের আঘ্রাণ নিতে বলা হল এবং আগের মত মার্কভাই ২/০ একটি অনুবটিকা জলের সঙ্গে আগের মত প্রস্তুত করে আগের নিয়মেই খেতে বলা হল।

২০শে ফেব্রুয়ারী — ১৮ তারিখ থেকে গলার অবস্থা ভাল। মলদ্বার নিয়ে খুব ভুগছে। মলত্যাগের সময় যন্ত্রনা। তৃষ্ণাকম।

সুগার অব মিল্ক।

৩রা মার্চ — গলক্ষত নেই। মলত্যাগ করার সময় রক্তশূন্য অর্শবলী নেমে আসে। পূর্বে এর সঙ্গে জ্বালা ও তীব্র বেদনা থাকত। এখন কেবলমাত্র চুলকানি আছে। এসিড নাইট্রিকের ঘ্রাণ নিতে হবে। পরে সুগার অব মিল্ক আগের মত। মলত্যাগের পর ব্যথা প্রায় নেই। গতকাল মলত্যাগের সময় কিছুটা রক্ত পরেছিল। (পুরাতন লক্ষণ)। গলা ভাল। কেবলমাত্র ঠাণ্ডা জল পানে একটি অস্বস্তি হয়।

এসিড নাইট্রিকের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য এক আউন্স অ্যালকোহল বা ব্রান্ডির সঙ্গে একটি অনুবটিকা মিশ্রিত করে শিশির মুখ খুলে এক বা দু সেকেন্ড ঘ্রাণ নিতে হবে।

তিনি সম্পূর্ণরূপে এবং স্থায়িভাবে আরোগ্যলাভ করেছেন।

৪. মাথাঘোরা ও উদ্‌গার

২৭শে ডিসেম্বর, ১৮১৫। ভদ্রলোক। বয়স ৪২। রুগ্নমলিন চেহারা। সারাদিন তাঁকে অফিসে কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। গত ৫দিন ধরে সে রোগে ভুগছে। তাঁর উপসর্গ ছিল নিম্নরূপ:

পাঁচদিন আগে সন্ধ্যায় মাথা ঘোরা এবং সঙ্গে ঘন ঘন উদ্‌গার ওঠায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরের দিন রাত প্রায় ২ টায় টক বমি হয়।

পরে প্রত্যেকদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঢেকুর উঠতে থাকে।

আজ ও তার অত্যন্ত কষ্টকর টক ও দূর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠছে। তারমনে হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য গুলো হজম না হয়ে একইভাবে তার পেটে রয়েছে। মাথাটা বোধ হচ্ছে ফাঁকা, ভেতরে কিছু নেই, সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরে প্রচণ্ড অস্বস্তি।

সামান্য শব্দও অসহ্য মনে হয়।

তিনি নম্র, কোমল এবং ধীর প্রকৃতির।

এই রেগীর লক্ষণসমূহ বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এঁকে পালসেটিলা ওষুধ ব্যতিরেকে কিছুতেই সহজে, নিশ্চিত ও স্থায়িভাবে আরোগ্য করা যাবে না। এজন্য তাঁকে পালসেটিলা দেওয়া হল। কিন্তু তাঁর বর্তমান দুর্বল স্বাস্থের কথা বিবেচনা করে তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রমাত্রায় (half a drop of the quadrillionth of a strong drop of Pulsatilla)*

ওষুধটি সন্ধ্যাবেলা দেওয়া হল।

পরেরদিনই তার সকল কষ্টের অবসান হয়। এক সপ্তাহ পরে সে জানায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

আমাদের বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে এই আরোগ্যক্রিয়া পালসেটিলা (৩০) শক্তি (decillionth potency) শক্তির একটি ক্ষুদ্রতম অণুবটিকা প্রয়োগ করে কিংবা একই শক্তির ওষুধের সর্ষের দানার মত একটি অণুবটিকার ঘ্রাণ নিয়েও সম্পন্ন করা যেত - R.E.Dudgeon.

কতিপয় বিশ্ববরেণ্য হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকদের রোগী বিবরণী

জে. টি. কেন্ট - ক্যানসার [৫১]

১লা আক্টোবর, ১৯০৩।

মিঃ. এইচ. সি. এম. ২৮ বছর বয়স। বিবাহিত। নাকের উপর 'লুপাস' এর উপবৃদ্ধিতে ভুগছেন (Lupus - tuberculosis of the skin marked by formation of brownish nodules on the corium) নাকের উপর মনে হয় একটা বড় জিন (saddle) লাগানো আছে। ৫ বছর আগে ম্যালেরিয়া হয়েছিল। ৯মাস ভুগেছেন। কুইনাইনে কমে। সহজেই রেগে যায়। স্মৃতিশক্তি ভাল। চিৎ হয়ে মাথার উপর দুহাত ছড়িয়ে শোওয়ার অভ্যাস। শেষ রাত্রের দিকে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন অসুখকর। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ধীর। নাড়ীর গতি ৬০। কাশি নেই। খিদে কম। পিপাসা কম। ডান গোড়ালিতে বাতের ব্যথা, কখনও কখনও কাঁধের ব্যথা হয়। পিঠের নিচের দিকেও ব্যথা। কোন ব্যথাই তীব্র নয়। শীতে বাড়ে। গরমে কম থাকে। শুষ্ক নাক ও গাল চুলকায়। শীতকালে কানও চুলকায়। দেহের বিভিন্ন স্থান শক্ত ঢেলার মত হয়, লাল হয় এবং তখন তাতে প্রচণ্ড চুলকানি হয়। মাথায় ও মলদ্বারে চুলকানি হয়। কখনও ব্রণ বা ফোঁড়া হয়নি। প্রায়ই আঁচিল হত। সেগুলো কস্টিক দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হত। পা সবসময় ঠাণ্ডা থাকে। চুল পড়ে যাচ্ছে। প্রায়ই টনসিল প্রদাহে ভোগেন। সামান্য পরিশ্রমেই প্রচুর ঘাম হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা। রোজ সকালে একবার। শীতকাতর। ছেলেবেলায় গরম কাতর ছিলেন, কিন্তু তখনও পা সবসময় ঠাণ্ডা থাকত। ১০ বছর আগে খুব গরম অবস্থায় দু গ্লাস বিয়ার খেয়েছিলো

[৫১] J.T.Kent. Lesser Writings Ibid. Page 524

তারপর থেকে প্রস্রাব ঘনঘন এবং কষ্টকর হয়। প্রস্রাবের রঙ প্রায় সাদা। তিনি মনে করেন এরপর থেকেই তাঁর কিডনী ও ত্বকের গোলমালের সূত্রপাত। গাড়িতে চড়লে বা এলিভেটার (elevator-যন্ত্রচালিত ওঠবার সিড়ি) উঠলে বমি বমি ভাব হয়।

সোরিনাম সি. এম. ১ মাত্রা।

৭ই নভেম্বর — পাকস্থলিতে শূন্যতাবোধ। সারা শরীরে চুলকানি। ঘাড়ে, কব্জিতে, কনুই প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন সন্ধিতে বাতের ব্যথা। মলদ্বার ভেজা ভেজা, তাতে চুলকানি। কিডনীর স্থানে ব্যথা। পা ঠাণ্ডা। শীতকাতর। সোরিনাম সি. এম. ১ মাত্রা।

১৬ই ডিসেম্বর — পা ঠাণ্ডা। শীতে কাতর। নতুন কোন লক্ষণ নেই।

৪ঠা মার্চ, ১৯০৪ — এই শীতে নাকের লুপাস খুব বেশী বাড়েনি। মলদ্বার ভেজা। ক্লান্তি বোধ। সব সময় শুয়ে থাকতে চায়। কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সোরিনাম সি. এম.

২৩শে এপ্রিল এবং ৬ই জুলাই — এসময়ে প্রধান উপসর্গ ছিল গোড়ালিতে বাতের ব্যথা। শীতে কাতর, গাড়িতে চড়লে বমির উদ্রেক, চুল পড়ে যাওয়া, মলদ্বার ভেজা। সোরিণাম এম. এম.

১লা অক্টোবর — মাথার সামনের দিকে ব্যথা। খুব এসিড হয়। নাকের লুপাস কেবল নাকের উপর ও পাশে রয়েছে। গাড়িতে চড়লে যে বমি হত সেটা আর হয়না। সালফার ১০ এম।

৯ই নভেম্বর ও ২৩শে ডিসেম্বর — সালফার ১০ এম।

১৫ই ফেব্রুয়ারি — পিঠের নিচের দিকে ব্যথা। প্লীহার স্থানে ব্যথা। মাথার সামনের দিকে ব্যথা। নাকে সর্দি। কিছু জিজ্ঞেস করলে ধীরে ধীরে জবাব দেয়। মাথা ঢেকে শোয়।

এরপর আর ওষুধের প্রয়োজন হয়নি। অনেক বছর কেটে গেছে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

১.২ বহুমূত্র (Diabetes mellitus) [৮০]

২রা জুলাই, ১৮৯০ ভদ্রলোক। বয়স ৪৭। লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। গত ৩বছর ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগছেন। গত ৩ বছরে ৩৫ পাউন্ড ওজন কমেছে। ওজন দ্রুত কমে যাচ্ছে। পরিশ্রম করার ক্ষমতাও কমে আসছে। রাত্রে একদম ঘুম হয় না। দুবছর আগে মাঝে মাঝে পেট ব্যথা উদরাময় হত। তারপর থেকে এই অনিদ্রা রোগ। পেটের এই ব্যথার জন্য মাঝে মাঝে সারারাত জেগে থাকতে হয়। সারা পেট জুড়ে কামড়ানো ব্যথা। রাত্রে বাড়ে। দিনের বেলায় শুলেও বাড়ে। সামান্য পরিশ্রমেই প্রচুর ঘাম হয়। অত্যন্ত নার্ভাস। সবসময় পায়চারি করে। মল হাল্কা রঙের। সারা শরীরে ভয়ানক টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। হার্টের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত। নাড়ী দ্রুত, ৯৫ থেকে ১০০। গত শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা (grippe) হয়েছিল। তারপর থেকেই দ্রুত ওজন হ্রাস। প্রসাবে তেলতেলে ছোট ছোট টুকরো (cuticle)। প্রস্রাবে মাঝে মাঝে লালচেকনা (brickdust)। উত্তেজনা হলে মনে হয় মাথাটা কানের উপর থেকে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে এবং একবার উপরে উঠছে আবার নীচে নামছে। শোওয়ার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। গরমে সহজেই কাতর হয়। শীতে কাতর হয় না। দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাত্রে প্রস্রাব করার জন্য ঘুম থেকে উঠতেই হবে। ৪/৫ পিন্ট প্রস্রাব একেবারে হয়। প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রেভিটি (Specific gravity) ১০৩০ থেকে ১০৩৫। প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ প্রতি আউন্সে ১২ থেকে ১৫ গ্রেণ। পেটে গুড়গুড় শব্দ।

এ ভদ্রলোক অনেক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করেছেন। অনেক কড়া কড়া ওষুধ খেয়েছেন, কিন্তু কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাননি। শীতল জল পানের ইচ্ছা। মলদ্বারে টনটনানি ব্যথা। তাঁকে বলা হয় তার মলদ্বারে ফিসার (fissure) হয়েছে।

---

৮১. Kent. Ibid Page 516.

তাঁকে ফসফোরাস সি. এম. ১ মাত্রা দেওয়া হয়। তাতে রোগ লক্ষণ সমূহের দারুণ বৃদ্ধি ঘটে। কিছুকাল পর থেকে সে বৃদ্ধি কেটে যায় এবং তিনি উন্নতি বোধ করতে থাকেন। কিন্তু ৩১শে অক্টোবর থেকে আবার পুরনো উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। ওষুধ খাওয়ার এক মাসের মধ্যে তার প্রস্রাবের শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এল। তারপর থেকে প্রস্রাবে আর চিনি পাওয়া যায় নি।

৩১শে অক্টোবর — ফসফোরাস এম. এম. তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটে। এখন তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, মানসিক পরিশ্রম প্রচুর করছেন। সহনশীলতাও অনেক বেড়েছে।

২. জে. এইচ. ক্লার্ক — পেটে ক্যানসার [৬১]

এক মহিলা। বয়স ৫০। তলপেটে কিছুকাল যাবত প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগছে। কিছুই খেতে পারছে না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুক্ত খাদ্য সকলই বমি হয়ে উঠেযায়।

স্থানীয় তিনজন চিকিৎসক এবং নিকটবর্তী শহরের দুজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক তাকে দেখেন এবং এটি ক্যানসার বলে রোগ নির্ণয় করেন। কিন্তু এটির অবস্থান এমন জায়গায় যে সেখানে অস্ত্রোপ্রচার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। সেই হতভাগ্য মহিলাকে বাড়িতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার জন্য হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। অন্য বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া হল। তিনিও একই অভিমত দেন। এ অবস্থায় হোমিওপ্যাথি কিছু করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

রোগীকে প্রশ্ন করে জানা গেল তার ভাই ও বোন দুজনেই যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে। পাঁচ বছর পূর্বে সে পুনরায় টিকা নিয়েছে। তারপর থেকে তার শরীর আর কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না। তার যখন ১৭/১৮ বছর বয়স তখন সে একবার দোলনা থেকে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তাতে পেটে খুব আঘাত লেগেছিল। সে অত্যন্ত শক্ত সমর্থ ছিল। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। ভাঙবে কিন্তু মচকায় না। জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত এসেছে, সে কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু হার মানেনি।

৬১. J.H.Clarke. The Prescriber. Jain Publishing House. New Delhi. Page-51.

এখানে আরোগ্যের পক্ষে দুটি প্রতিবন্ধক রয়েছে যা অপসারিত না করলে প্রকৃত আরোগ্যদায়ক ওষুধটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রথম প্রতিবন্ধক হল যক্ষ্মা। তাকে ব্যাসিলিনাম ২০০ ৫টি অনুবটিকা একমাত্রা খেতে দেওয়া হল।

তিনদিন পরে তাকে দেখতে গেলাম। সে বাড়ি ছিল না। দেড় মাইল দূরে শহরে গেছে। পরের দিন আবার তাকে দেখতে গেলাম। এই অবস্থায় অতদূর হাঁটার জন্য তাকে ভৎর্সনা করলাম। সে বলল, আমি খুব ভাল আছি। খেতে পারছি। খাদ্য দ্রব্য আর বমি হয়ে উঠে আসে না। ব্যথাটাও অনেকটা কম।

সিদ্ধান্ত — প্রথম প্রতিবন্ধকটি অপসারিত হয়েছে। এবার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকটি হল টিকা নেওয়ার কুফল। তাকে থুজা θ ১ ফোঁটা করে ২ মাত্রা দেওয়া হল ২৪ ঘন্টা পরপর খাওয়ার জন্য।

এক সপ্তাহ পর তাকে দেখতে গেলাম। সে দরজা খুলে কাছে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল। বলল, ডাক্তারবাবু,আমার জরায়ু থেকে এক সপ্তাহ ধরে একটা স্রাব নিঃসরণ হচ্ছে। আমার পেটের টিউমারটি যেটি বাইরে থেকে দেখলে একটা ফুটবল বলে মনে হত সেটিও অনেকটা ছোট হয়ে গেছে।

এই স্রাবের জন্য সে অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেজন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। তাকে পালসেটিলা ৩০ একমাত্রা দিই।

পরের দিন স্রাবটি বন্ধহয়ে যায়, কিন্তু টিউমারটি আবার ফুলে উঠতে লাগল। দ্বিতীয় বাধার প্রাচীর কি ভেঙে পরেছে? ঠিক বোঝা গেলনা। মহিলাটির প্রকৃতি যেহেতু 'ডেইজীর'(daisy) মত এবং তার আঘাতের ইতিহাস আছে এজন্য তাকে বেলিস পিরেনিজθ ৩ফোঁটা ১মাত্রা দেওয়া হল।

বললাম, আশাকরি এতেই তোমার পেট ভাল হয়ে যাবে।

এক সপ্তাহ পর তাকে আবার দেখতে যাই। রান্নাঘরের পেছনে তাকে কাপড় কাচতে দেখতে পাই। আমাকে দেখে সে কাছে এল।

— কেমন আছ?

— খুব ভাল, ধন্যবাদ, স্যার।

— কেমন ভাল?

— স্যার, আপনার ওষুধ খাওয়ার তিনদিন পর আমার মনে হল, তলপেট থেকে যেন সব নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসছে। তারপর সেই জিনিসটা বের হয়ে এল। প্রায় ৪ পাউন্ড ওজন। আমি ও আমার স্বামী সেটিকে আমাদের বাগানে কবর দিয়েছি।

সিদ্ধান্ত — দুটি বাধার দেওয়াল ব্যাসিলিনাম ও থুজা ভেঙে দেওয়ায় বেলিস পিরেনিজ তার কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

এটি পনেরো বছর আগের ঘটনা। মহিলাটি এখনও জীবিত আছে এবং তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে।

৩. এইচ. এ. রবার্টস

৩.১. জ্বর[৮২]

একটি ৩বছরের শিশু। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। গাত্রোত্তাপ অত্যন্ত বেশী। তাপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একজন হ্যানিম্যানীয় চিকিৎসক তাকে বেলেডোনা ব্যবস্থা করেন। তাতে জ্বর কমে কিন্তু আবার আসে। শিশুটির জ্বর ১০৫° চলতে লাগল।

৮২. H.A. Roberts. Boennighansen's Therapeutic Pocket Book. B.Jain Publishers. New Delhi Page 55.

বেলেডোনার লক্ষণ রয়েছে, বেলেডোনা দেওয়া হল। অথচ কোন কাজ হল না। অধিকন্তু গলার গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হল, সেগুলো প্রাদাহিত, স্ফীত ও তাতে ক্ষতভাব দেখা গেল। আরেকজন চিকিৎসককে ডাকা হল। তিনিও উপস্থিত লক্ষণ সাদৃশ্যে বেলেডোনা ছাড়া আর অন্য কিছু ব্যবস্থা করার মত পেলেন না।

শীতশীতভাব। পিপাসা নেই। বিকেল চারটার পর থেকে জ্বর বাড়ে। রাত্রে অসহ্য জ্বালাকর উত্তাপ। শিরাগুলো ফুলে ওঠে। শরীরের স্থানে স্থানে গরম, স্থানে স্থানে শীতল। এত উত্তাপে ও জল পিপাসা নেই। কেবল ঠাণ্ডা লেবুর রস একটু খায়। বাইরের কোন ঢাকা বা উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডা প্রলেপে উত্তাপ কিছুটা কমে।

পালসেটিলা ৩০ ৫টি অণুবটিকা একটি শিশিতেজলে মিশ্রিত করে ১ চামচ মাত্রায় প্রতি একঘণ্টা অন্তর ৩ বার দেওয়া হল। এতে জ্বর কমতে শুরু করে। পরে দিনে ২ বার করে আরও দুদিন দেওয়ায় জ্বর সেরে যায়। গ্রন্থিগুলোও আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

৩.২ আক্ষেপিক স্নায়বিক ব্যথা (ticdouloureux)[৬৩]

এক ভদ্রলোক। বাম মুখে আক্ষেপিক স্নায়বিক ব্যথায় (neuralgia of the trigeminal nerve)- এ প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর তার তীব্র আক্ষেপ (intense spasm) হচ্ছিল। বামদিকের trigeminal nerve- এ টেনে ধরার মত বেদনা। মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেছে। মাথায় ও বুকে প্রচুর ঘাম হচ্ছে। উপরের চোয়ালে ও গালে প্রচণ্ড ব্যথা, হাত ছোঁয়ানো যায়না। স্পর্শ করলে, উত্তেজিত হলে কিংবা কথা বললে ব্যথা বাড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় বাড়ে। রাত্রে বাড়ে। হাত বুলালে কমে। আক্রমণের সময় প্রচণ্ড খিদে পায়।

সে বহুদিন কানপাকা রোগে ভুগেছে। আট বছর আগে কর্ণ বিশষজ্ঞের চিকিৎসায় তা ভাল হয়। তারপর থেকে তার এই আক্রমণের সূত্রপাত। যতদিন যাচ্ছে আক্রমণ আরও স্বল্প সময় অন্তর এবং আরও তীব্র হচ্ছে।

---

৬৩. H.A.Roberts. Ibid Page 59.

বোনিং হোসেনের রেপার্টরির সাহায্য নিই এবং মেটেরিয়া মেডিকা ভাল করে দেখে তাঁকে সালফার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। রোগীকে সালফার ১এম একমাত্রা দেওয়া হয়।

প্রথম কয়েকঘন্টা ব্যথার তীব্রতা একটু বাড়ে। পরে ধীরে ধীরে উপশম বোধ হতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে কান থেকে স্রাব আবার দেখা দেয়।

এই ওষুধ তাকে ১৮মাসে ৩মাত্রা প্রয়োগ করা হয়। এতে তার এই রোগতো সেরেই যায়, তার কর্ণ স্রাবও বন্ধ হয়ে যায়।

কর্ণস্রাব সকলের আগে দেখা দিয়েছিল। এটি সকলের শেষে গেল। আরোগ্যের অভিমুখের নীতিটি যে অভ্রান্ত তা আবার প্রমাণিত হল। অনেক সময় বলা হয় এভাবে ওষুধ প্রয়োগে রোগ লক্ষণ সারে কিন্তু রোগ চাপা পড়ে যায়। এই কেসটি প্রমান করে যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাপাপড়া রোগকে যেমন মুক্ত করে তেমনি সেই রোগটি আরোগ্যও করে।

৪. এইচ. সি. অ্যালেন - কর্ণস্রাব[৬৪]

২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৫। আর্ল (Earl) একটি ছোট শিশু। দু' বছর বয়স। হাল্কা রঙ। গত ফেব্রুয়ারী থেকে দু কান থেকে হলদে রঙের স্রাব বের হচ্ছে। স্রাবের অন্য কোন বিশেষত্ব নেই। ওষুধ প্রয়োগে তা কমে। কিন্তু গত ২/৩ সপ্তাহ যাবত ডান কানের পাশের এবং গলার গ্রন্থিগুলো অত্যন্ত স্ফীত হয়েছে। কানের নিচের ও পেছনের গ্রন্থিগুলোই বেশী ফুলেছে। ডান কান থেকে একটু একটু হলদে স্রাব নির্গত হচ্ছে। কোন ব্যথা নেই। খিদে নেই। দুধে একটু চা মিশিয়ে দিলে একটু খায়। শরীর রোগা হয়ে গেছে। খোলা বাতাস পছন্দ। বাড়ির বাইরে থাকতে পছন্দ। রাত্রে অস্থিরতা (fretfulness) বাড়ে। দিনে ভাল থাকে। কান থেকে স্রাব নির্গত হওয়ার আগে জ্বর হয়েছিল। বাবার দিকে যক্ষ্মার ইতিহাস। টিউবার কুলিনাম ৫০ এম একমাত্রা।

৬৪. H.C.Allen. The Materia Medica of the Nosodes. Page 51.

৭ই ফেব্রুয়ারী – ৩ দিন হল রবিবার পর্যন্ত কানের চারদিকের গ্রন্থিগুলো আরও ফুলেছে। মনে হচ্ছে এগুলো ফেটে যাবে। এরপর থেকে ফোলাভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে। গতকাল থেকে কান দিয়ে আবার স্রাব নির্গত হচ্ছে। স্রাবটি ঘন বের হতে পারছে না। একটা সিরিঞ্জ দিয়ে গরমজল ও সাবানের সাহায্যে কানটা পরিষ্কার করে দেওয়া হল। ফোলাভাব কমতে শুরু করে। স্রাবে কোন গন্ধ ছিল না। মলত্যাগ দিনে ১ বার কি ২ বার। খিদে বেড়েছে। রাত্রে একটু অস্বস্তি। ঘরের বাইরে যেতে যায়। কিন্তু বাইরে গেলে আবার ভেতরে আসতে চায়। কাঁদলে মাথায় যন্ত্রণা হয়। সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন আর আগের মত খিটখিটে মেজাজ নেই। গ্রন্থির চারদিকের ফোলাভার অনেকটা কমেছে। অবস্থার দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। প্লাসিবো।

ফেব্রুয়ারী ২৬-সবদিক থেকে ভাল। ফোলাভাব নেই। কান দিয়ে আর স্রাব নিঃসরণ হয়নি। দেহ পুষ্ট হয়েছে। বাড়ির লোকেরা মনে করে সে ভাল হয়ে গেছে। স্যাকল্যাক।

আরকোন ওষুধের প্রয়োজন হয়নি। স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে।

৫. ওয়েসেলহিফ্‌ট এবং অ্যাডলপ লিপি - যৌন দুর্বলতা ও বন্ধ্যাত্ব[৬৫]

লিপি হ্যানিম্যানের যোগ্যতম শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। রোগী পরীক্ষা, ওষুধ নির্বাচন এবং সদৃশনীতির সার্থক প্রয়োগশৈলীতে তিনি একজন উচ্চমানের শিল্পী ছিলেন। অধিকাংশ চিত্রশিল্পীর প্রধান সমস্যা হল তাঁরা অনেক বেশী দেখেন এবং দিশেহারা (confused) হয়ে পড়েন। সীমাহীন পুঙ্খানুপুঙ্খতায় (endless details) তাদের শিল্পকর্মটি জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে না। ফলে তাঁদের পরিশ্রম নিস্ফল হয়। লিপি রোগীর অনাবশ্যক বিস্তারিত বিবরণে সময় নষ্ট করতেন না। রোগীর সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই তার চোখে ধরা পড়তো এবং তিনি এক মহান শিল্পীর মত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সদৃশনীতির সার্থক প্রয়োগ করে রোগ আরোগ্য করতেন।

---

৬৫. H. C. Allen. The Materia Medica of the Nosodes. Page 51

রোগীটি উইলিয়াম পি. ওয়েসেলহিফ্‌ট এর (W. P. Wesselhoeft)। আমরা তাঁর নিজের কথায় এর বিবরণ শুনব।

১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাস। জি. আর (G. R) । বয়স ৪৫। কাল বর্ণ। পাতলা চেহারা। ১০ বছর হল বিয়ে হয়েছে। স্বাস্থ্য দেখতে মোটামুটি ভাল । গত ছ'বছর ধরে সহবাসের সময় কোন বীর্যপাত হয় না। রাত্রে মাঝে মাঝে শুক্র স্খলন হয়। লিঙ্গোদ্রেক অত্যন্ত নিস্তেজ। সহবাসের সময় তা একেবারেই নিস্তেজ হয়ে যায়। রাত্রে শয্যায় গেলে বস্তি প্রদেশের নিম্নভাগে (perineum) জ্বালাবোধ। এই জ্বালাবোধের কথা চিন্তা করলে অণ্ডকোষে টেনে ধরার ন্যায় ব্যথা হয়। লিঙ্গে দুর্বলতা অনুভব। মাঝে মাঝে অণ্ডকোষে, মলদ্বারে এবং উরুর ভেতরের উপরের দিকে শুকনো উদ্ভেদ, তাতে চুলকানি। জননাঙ্গে দুর্বলতাবোধের সঙ্গে তাঁর চোখে ও দুর্বলতা বোধ।

ঠাণ্ডা একদম সহ্য করতে পারেন না। আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরীর খারাপ হয়। সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। প্রথমে নাক এবং গলা আক্রান্ত হয়। প্রথমে জলের মত সর্দি ও হাঁচি হয়, পরে তা শুকিয়ে যায়। শরীরের বিভিন্নস্থানে কামড়ানো ব্যথা (aching pain) হয়। ব্যথা ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে।

২০ বছর আগে আফ্রিকান জ্বর হয়েছিলে। ১০ বছর আগে ডিপথেরিয়া হয়েছিলে, অ্যালোপ্যাথিতে সারে। তারপর থেকে তার স্বাস্থ্য আর ভাল হয়নি। কোনরকম যৌনরোগ হয়নি। অন্য সব জৈবনিক কাজ স্বাভাবিক।

ওয়েসেলহিফ্‌ট ১৮ মাস ধরে এর চিকিৎসা করেন। একমাত্র সর্দিকাশির প্রবণতা কমানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারেননি। তিনি তখন লিপির পরামর্শ চেয়ে পাঠান।

লিপি প্রত্যুত্তরে লেখেন, আপনার রোগী বিবরণী পড়ে জানলাম রোগী র দশবছর আগে ডিপথেরিয়া হয়েছিল যার চিকিৎসা বিষম পদ্ধতিতে হয়েছিল। রোগের আক্রমণ একদিক থেকে আরেকদিকে যায় এবং আবার প্রথমস্থানে চলে আসে। আক্রমণের পর অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রায় অবসন্ন কারক। তিনি মনে করেন যে সেই রোগের ভোগের পর থেকে তিনি আর তাঁর পূর্বের স্বাস্থ্য, তেজ ও শক্তি ফিরে পাননি। তাঁর তরুণ সর্দির বৈশিষ্ট্য হল এর সঙ্গে স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা যা সর্বদাই একস্থান থেকে আরেক স্থানে যায়। আমি এঁকে প্রথমে ল্যাকক্যানাইনাম সি. এম. একমাত্রা দিতাম। পরে যদি

প্রয়োজন হয় তবে পালসেটিলা একমাত্রা দিতাম।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাকে পালসেটিলা দেওয়ার আর প্রয়োজন হয়নি।

ওষুধ প্রয়োগের তিনমাস পর তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হন। তিনি বর্তমানে দুটি স্বাস্থ্যবান সন্তানের জননী।

আমরা যতদূর জানি ল্যাক ক্যানাইনাম এর কোন যৌন দুর্বলতা নেই। কিন্তু এ নিয়ে লিপিকে ওষুধ নির্বাচন নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি।

তিনি আরও গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং রোগের কারণ ও তার প্রতিকারক ওষুধ খুঁজে বের করেছিলেন। এই হল প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক প্যাথলজি। এই রোগের যাবতীয় বিবরণে প্রকৃত ওষুধ খুঁজে বার করা অন্যকারোর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক শিল্পীর নিকট তা কত সহজে ধরা দিল। একজন তাঁর হারানো পুরুষত্ব ফিরে পেল এবং দশ বছর বন্ধ্যা থাকার পর দুটি সন্তানের পিতা হলেন।

৬. মার্গারেট টাইলার এবং জন উইয়ার

(Margaret Tyler and Jonn Weir)

মাথাব্যথা [৬৬]

৬ই ডিসেম্বর ১৯১০ Mrs. W. বয়স ৫৮। ১৩ বছর বয়স থেকে মাথাব্যথা। প্রতিমাসে অন্তত দুদিন মাথা ব্যথায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়। (মাসিকের সময় নয়)। মাথাটা ভারি মনে হয়। মনে হয় একটা লোহার খাঁচায় মাথাটা চেপে আছে। মাথাব্যথার সময় মাথায় হাত দেওয়া যায় না। মাথার বামদিকের দুপাশে (temforal region-এ) দপদপানি ব্যথা। গ্রীষ্মকালে গরম ঘরে, রোদে, উত্তপ্ত হলে, পূর্ব বাতাসে এবং স্পর্শে বাড়ে। বিশ্রামে একা থাকলে, চুপচাপ শুয়ে থাকলে এবং চাপ প্রয়োগে উপশমবোধ হয়।

ছ' বছর আগে রজো নিবৃত্তি হয়েছে।

---

৬৬. J. T. Kent - Use of the Repertory Margaret Tyler and John Weir - Reportorising. Roy Publishing House. Calcutta 1972. Page - 49.

মাঝে মাঝে তলপেটের তলদেশ দিয়ে সব বের হয়ে যাবে এরূপ অনুভূতি। তলপেটে জ্বালা। পেট ফুলে ওঠে। খিদে ভাল। মাছ পছন্দ করে না। চর্বি জাতীয় খাদ্য পছন্দ। কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত। মানসিক লক্ষণ - অন্ধকারের ভয়, চোর ডাকাতের ভয়। সর্বদা ব্যস্ত সমস্ত ভাব। বাইরের প্রভাবের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। মেজাজ পরিবর্তনশীল (moody) সান্ত্বনায় রেগে যায়।

আবহাওয়ায় প্রতিক্রিয়া - গরম কাতর। গরমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে, রোদ লাগলে বাড়ে। মাথায় তাপোচ্ছ্বাস, সঙ্গে ঘাম। ঝড় বৃষ্টিতে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় এবং মাথা ধরে।

রেপার্টরীর সাহায্যে নেট্রামমিউর ওষুধটি নির্বাচিত হল।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯১০ - নেট্রাম মিউর ২০০, ৩ মাত্রা।

১৫ই ডিসেম্বর - ওষুধ খাওয়ার তিনদিন পর মাথা ব্যথার প্রচণ্ড বৃদ্ধি।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ - মাথা ব্যথা আর হয়নি। মাথায় আর ভার বোধ বা খাঁচায় আবদ্ধ থাকার ভাব নেই। কোষ্ঠ ঠিকমত পরিষ্কার হচ্ছে। তাপোচ্ছ্বাস আর হয়নি। সবদিক থেকেই ভাল বোধ হচ্ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, আপনা থেকেই সেরে যায়। কোন ওষুধ নয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ - ঠাণ্ডা লেগেছে। প্রচণ্ড উদরশূল। তারজন্য মাথাব্যথা একদিন হয়। নেট্রাম মিউর ২০০, ৩ মাত্রা।

৭ই এপ্রিল - মাথাব্যথা তেমন হয়নি। উদরের তলদেশ দিয়ে সব বের হয়ে যাওয়ার অনুভূতি নেই। জ্বালা বা ফুলে ওঠা ভাব নেই। তাপোচ্ছ্বাস নেই। কোন ওষুধ দেওয়া হয়নি।

১৬ই মে, ১৯১১ - শুলে সামান্য মাথাঘোরা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা চলে ও যায়।

বজ্রবিদ্যুতের সময় আগে মাথাব্যথায় শয্যাশায়ী হত। এবার কিছু হয়নি। মাথায় খাঁচার আবদ্ধ থাকার ভাব নেই। কোষ্ঠ পরিষ্কার। সবদিক থেকে উন্নতি। আগের চেয়ে উজ্জ্বল ও প্রসন্নচিত্ত হয়েছে। তাঁর স্বামী বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষকে পেয়েছেন।

নেট্রাম মিউর ২০০, ৩ মাত্রা।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১১ - মাথাধরার মত অবস্থা একদিন হয়েছিল, আপনা থেকেই চলে যায়। নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বলে মনে হয়। এখন অনেক বেশী কাজ করতে পারেন। কাজে উদ্যম এসেছে। সাধারণ স্বাস্থ্য খুবই ভাল।

আর কোন ওষুধের প্রয়োজন হয়নি।

৭. ই. বি. ন্যাস - এন্টারোকোলাইটিস[৬৭]

এন্টারোকোলাইটিসের রোগী। সাংঘাতিক অবস্থা চলছে। রোগী দিনরাত অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। পেট ব্যথা এত তীব্র যে মনে হয় পেট টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ব্যথার জন্য রোগী মাঝে মাঝে অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর বেঁকে যাচ্ছে, পর্যায়ক্রমে একবার সামনে, পরেরবার পেছনে, তারপরের বার পাশের দিকে। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখ নীল হয়ে গেছে। রাতের দিকে অবস্থা সঙ্গিন হয়। সেই মর্মভেদী চিৎকার শোনা যায় না। অত্যন্ত অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা।

এ অবস্থায় ন্যাস্ চিকিৎসার জন্য আহূত হন। তিনি রোগীতে জ্যালাপা প্রত্যক্ষ করলেন।

তিনি জ্যালাপা১২ ২মাত্রা প্রয়োগ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাকে সুস্থ করে তোলেন।

৬৭. E.B.Nash. Leaders in Homoeopathic Therapeutics. Sett Dey & Co. Calcutta 1959 PAge 437.

ডাঃ বি. কে. বসু - হাঁপানি ও ক্যান্সার

১৮. ১০.৭৪ শ্রী রায়, বয়স ৬২, শীর্ণকায়, রক্তশূণ্য। অত্যাধিক দুর্বলতার দরুণ চলাফেরা করতে পারেন না। সাতমাস পূর্বে আহারকালে গলাধঃকরণে কষ্টবোধ করেন। এক্স-রে করার পর ঢসোফেগাসে সাকোমা হয়েছে জানা যায়। ক্যান্সার হাসপাতালে অনেকগুলি ray ক্ষুধা থাকলেও আহার করতে পারেন না। খাদ্যদ্রব্য গলায় আটকে যায়। তরল কাদ্য গলাধঃকরণে কষ্ট হয় না। কিন্তু শক্ত খাদ্য খাওয়া কষ্টকর। কাদ্যে অরুচি। প্রস্রাব খুব সামাণ্য। কয়েকমাস যাবৎ নিদ্রাহীনতা। বহুকাল স্নান করেন না। উষ্ণ জলে গা স্পঞ্জ করেন। অত্যন্ত শীতকাতর। সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দিকাশি হয়। বিষন্ন স্বভাব। একা থাকা পছন্দ করেন। স্মরণশক্তি দুর্বল।

গত পচিশ বছর যাবৎ ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। দিনরাত্রি অনবরত গয়ের উঠে। শ্বাসকষ্ট। রাত্রিতে বৃদ্ধি। তরল শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধ গয়ের। প্রাতঃকালে মুখে পচা দুর্গন্ধ। জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত ও কৃষ্ণ দাগযুক্ত। বুকে তরল সর্দিস্রাবে ভর্তি। সামাণ্য জ্বর হচ্ছে। অনবরত কাশির দরুণ সর্বাঙ্গে ব্যাথা।

বসন্তের টিকা ৩/৪ বার নেওয়া হয়েছে। একবার জলবসন্ত হয়েছিল। দুবার নিউমোনিয়া হয়েছে। অর্শ আছে। নেট্রাম সালফ ২০০ দুই মাত্রা।

২১.১০.৭৪ টিউবারকিউনিলাম বোভিনাম ২০০ একমাত্রা। ২৬.১০.৭৪ কাশি, গয়ের ওঠা কমেছে। অপেক্ষাকৃত ভালো নিদ্রা হচ্ছে। প্লাসিবো।

১.১১.৭৪ কাশি ও শ্বাসকষ্ট অনেকটা কমেছে। মধ্যে মধ্যে কাশি হয়। প্লাসিবো। ১০.১১.৭৪ কাশি ও শ্বাসকষ্ট কম। তবে মাঝে মাঝে কাশি হওয়া অব্যাহত। টিউব-বোভ ২০০ একমাত্রা।

২৯.১১.৭৪ থুথু ওঠা ও কাশি অত্যন্ত বেশি। টিউব-বোভ ১০০০ পরপর দুইমাত্রা।

২৬.১২.৭৪ সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টের আত্যন্তিক উপশম। সব বিষয়ে ভালো। প্লাসিবো।

৩১.১.৭৫ রোগীর অবস্থা এতদিন ক্রমাগত ভালো হচ্ছিল। পুনরায় কাশির বৃদ্ধি। ঘড়ঘড়ে শব্দ। টিউব-বোভ ১০এম একমাত্রা।

২৪.২.৭৫ কাশির উপশম হয়নি। হরিদ্রাবর্ণের, আঠারমত খুব গাঢ় গয়ের। গয়েরের জন্য আহার করতে পারেন না। কেলি বাই ১এম দুইমাত্রা।

১৭.৩.৭৫ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মাবমি হচ্ছে। সহজে গয়ের উঠছে। ক্ষুধা খুব বেশি, কিন্তু খেতে পারেন না। নিদ্রা কম হচ্ছে। অস্থিরতা। সামাণ্য ঠাণ্ডাও সহ্য হয় না। ব্যাসিলিনাম ১০০০ দুই মাত্রা।

২৮.৩.৭৫ গলনালী থেকে গত তিনদিন যাবৎ কালচে রক্ত উঠছে। অত্যন্ত অস্থিরতা। নিঃসৃত স্রবে অত্যধিক দুর্গন্ধ। আর্স-অ্যালব ০/৩ আট মাত্রা জলের সহিত।

৩১.৩.৭৫ রক্ত আর ওঠে না। শ্লেষ্মা ওঠা অনেকটা কম। রোগীর অবস্থা ভলো। আর্স-অ্যালব ০/৬ চার মাত্রা জলের সহিত।

৫.৫.৭৫ রোগীর অবস্থা এতদিন ভালো ছিল। শ্বাসকষ্ট, গয়ের ওঠা, অনিদ্রা, দুর্বলতা ইত্যাদি সবই কম ছিল। রোগী এখন বেশ খেতে পারেন। সবই খেতে চান। আহারে লোভ হয়েছে। কিন্তু আজ সকাল ৬টা থেকে খুব ঘনঘন উজ্জ্বল লালরক্ত উঠছে। ইপিকাক ০/৬ আট মাত্রা জলের সহিত।

৬.৫.৭৫ রক্ত বন্ধ হয়নি। চায়ের চামচের ২/৩ চামচ জল খেলেই প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল রক্ত বমি হচ্ছে। রক্তের সহিত প্রচুর ফেনা। ওঠবার সামর্থ নেই। শয়নাবস্থায় বমি ও প্রস্রাব করতে হচ্ছে। রোগী অতিশয় দুর্বল। জীবনসংশয় মনে হয়। নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ। গতকাল থেকে কোন খাদ্য, এমনকি জল পান করানও সম্ভব হয় নি। নাড়ির স্পন্দন প্রতি মিনিটে সকালে ১৩৫। পিপাসা যথেষ্ট। ঠাণ্ডা জলের পিপাসা। কিন্তু চা-চামচের এক বা দুই চামচ জলের বেশি পান করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ফেনাযুক্ত রক্তবমন। বমির পর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে পড়ে থাকেন। ফসফরাস ৩০ পাঁচ মাত্রা।

বমি বন্ধ হল না। তবে বমিতে রক্তের পরিমাণ খুব কমে গেল। রোগীতে অত্যধিক অস্থিরতা ও মৃত্যুভয় দেখা দিয়েছে। জলপিপাসা যথেষ্ট। আর্স ৩০ তিন মাত্রা।

৭.৫.৭৫ বমি বন্ধ হয়ে গেছে। জলপান করলেও বমি হয় না। অস্থিরতা কমে গিয়েছে। টিউবওয়েলের জল ও ডসেবর দেওয়া হচ্ছে। রাত্রির দিকে পাতলা জল বার্লি। বুকে এতদিন যে সর্দি নিয়ত থাকত, তা একেবারে নেই। কাশিও নেই।

৮.৫.৭৫ বমি নেই, কিন্তু পিপাসা আছে। তরল পথ্য দেওয়া হচ্ছে। আর্স ৩০ দুই মাত্রা।

১১.৬.৭৫ রোগীর অবস্থা ক্রমাগত উন্নতির দিকে। ক্ষুধা যাথেষ্ট বৃদ্ধি হচ্ছে। এখন একটু হাঁটাচল করতে পারেন। কিন্তু দুর্বলতা যথেষ্ট। চায়না ২০০ দুই মাত্রা।

২৩.৬.৭৫ মুখমণ্ডল ও পায়ের ফোলা দেখা যাচ্ছে। চায়না ২০০ দুই মাত্রা।

৩০.৬.৭৫ ফোলার আরো বৃদ্ধি হয়েছে। এপিস ২০০ দুই মাত্রা।

৭.৭.৭৫ ফোলা কমেছে। সামান্য কাশি দেখা যাচ্ছে। বর্ষাকাল, আর্দ্র হাওয়া চলছে। নেট্রাম সালফ ২০০ দুই মাত্রা।

১৭.৭.৭৫ তরল শ্লেষ্মা, তরল মল, সামান্য শ্বাসকষ্ট। নেট্রাম সালফ ২০০ দুই মাত্রা।

২৯.৭.৭৫ রোগী সর্ববিষয়ে ভালো। ক্ষুধা যথেষ্ট। কোন কষ্ট নেই। রাত্রিতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। প্লাসিবো।

৮.৮.৭৫ সর্ব বিষয়ে ভালো। তরল মল, মলের বেগ ধারণ করতে কষ্ট। অন্য কোন কষ্ট নেই। দুর্বলতা নেই। আহার করতে কোন কষ্ট নেই। নেট্রাম সালফ ১০০০ দুই মাত্রা।

এমনি ভাবে ৯/১০ মাস সময়ের মধ্যে ২৫ বছরের হাঁপানি এবং ইসোফেগাসের ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে গেল।

এইভাবে যে কোন রোগে যে কোন অবস্থায় আমরা যদি রোগের নাম ধরে ওষুধ নির্বাচণ না করে লক্ষণসমূহ যথযথভাবে সংগ্রহ করতে পারি এবং সংগৃহীত লক্ষণরাজির যথার্থ মূল্যায়ন করে প্রকৃত লক্ষণসমষ্টি নির্ণয় করতে পারি এবং সদৃশ নীতি অনুযায়ী সর্বোত্তম ওষুধ নির্বাচন করে উপযুক্ত শক্তি ও মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারি তবে যে কোন রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হবেই। আদর্শ আরোগ্য সাধনের এটাই একমাত্র পথ, অন্য কোন পথ নেই।

জে. এন. কাঞ্জিলাল - অন্ধত্ব[৬৮]

২০.৭.৬৬ শ্রীমতি এস. ডি. বয়স ১১। ৩ বছর আগে টাইফয়েড হয়েছিল। এন্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ায় সারে। তারপর থেকে নিম্নোক্ত উপসর্বগুলো দেখা দেয়।

১. মাথার দুদিকে ব্যথা, বিশেষ করে কপালের দুপাশে। বামদিকে বেশী। ব্যথা মাথার পেছনদিকে প্রসারিত হয়। পড়াশুনা করলে বাড়ে। চাপ প্রয়োগে উপশম হয়।

২. প্রথমে দূরের কোন বস্তু দেখতে অসুবিধা হত। পড়তে গেলে ২/৩টি শব্দ বা লাইন বাদ পড়ে যেত। ক্রমশঃ দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসে। অক্ষি গোলকের ভেতরে ব্যথা অনুভূত হয়। কিছুটা আলো আতঙ্ক দেখা দেয়। চোখ দিয়ে জল পড়ে। গত ১৯১৬ সালের মে মাস থেকে বাম চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়। ডানচোখেও পড়তে ও একটু দূরের কোন লোককে চিনতে অসুবিধা হতে থাকে।

৩. দুপায়ে ফোলা ও ব্যথা হঠাৎ আরম্ভ হয়, ২/১ ঘণ্টা থাকে, তারপর আস্তে আস্তে কমে যায়। আক্রমণের সময় শুয়ে বা বসে থাকতে বাধ্য হয়। চলাফেরায় বাড়ে। গরম তেল দিয়ে মালিশ করলে কমে। আক্রমণ যে কোন দিন যে কোন সময় হতে পারে, কয়েকদিন অন্তর বা একমাস অন্তর। শীতল আর্দ্র আবহাওয়ায় বাড়ে।

---

৬৮. J.N. Kanjilal - Reporization Page 59.

৪. প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিন্য। তিন থেকে সাতদিন অন্তর পায়খানা হয়।

৫. প্রায়ই গলক্ষতে ভোগে, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়। দু বছর আগে থেকে শুরু। শীতল আর্দ্র আবহাওয়ায় বাড়ে।

৬. ঘুম ভালই হয়। মাঝে মাঝে ভয়ের স্বপ্ন দেখেন। ঘাম ভালই হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত, শুলে বেশী হয়। নোন্তা, টক, গরম খাদ্য ও বরফ পছন্দ। মিষ্টদ্রব্য, দুধ ও রুটি পছন্দ করে না।

মানসিক লক্ষণ

৭. অত্যন্ত খিটখিটে। কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রচণ্ড রেগে যায়, ঝগড়া করে, চিৎকার করে। একা থাকতে চায়। লোকজন, গোলমাল পছন্দ করেনা।

৮. হাম হয়েছে। টিকা নিয়েছে।

৯. মায়ের ডিসপেপসিয়া। বাবার মায়ের উন্মাদ রোগ।

নির্বাচিত ওষুধ থুজা।

২০.৭.৬৬—থুজা ২০০, ২ মাত্রা, রাত্রে সকালে। ফাইটাম ২০০, ২ মাত্রা। প্রথম ওষুধ খাওয়ার ৭দিন পর।

৮.৮.৬৬—সকল উপসর্গের উপশম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি একইরকম। ফাইটাম ২০০, ৪ মাত্রা, ৭দিন অন্তর অন্তর দুবার।

২৯.৮.৬৬—সবদিক থেকে ভাল। বামচোখের দৃষ্টিতে কিছুটা উন্নতি। ফাইটাম ২০০, ৪ মাত্রা। ১৫দিন অন্তর অন্তর দুমাত্রা করে।

৩০.৯.৬৬—আর বিশেষ কোন উন্নতি নেই। পায়ের ব্যথা মাঝে মাঝে দেখা দেওয়ার মত অবস্থা। থুজা ২০০, ২ মাত্রা। ফাইটাম ২০০, ২ মাত্রা। ১৫ দিন অন্তর দুবার।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে ফাইটাম দেওয়া হতে থাকে।

১.১২.৬৭—দুটি চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্য কোন উপসর্গ নেই। মেয়েটি আবার তার পড়াশুনা ও গানবাজনা শুরু করে।

হ্যানিম্যানের একটি কথার উল্লেখ করে আমাদের এ আলোচনার যবনিকা টানছি। গভীর আনন্দের সঙ্গে আমি সেই অদূর কালের দিকে তাকিয়ে আছি যখন, যদিও আমি তখন আর এই মর্ত্যলোকে থাকব না, মানবজাতির ভবিষ্যত বংশধরগণ মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্বাদের ফল উপভোগ করবে এবং দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর প্রদত্ত এই সার্থক পন্থার সুযোগ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

পরিশিষ্ট

শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য হ্যানিম্যান কত শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন, শক্তি ও মাত্রা সমন্ধেজগৎবিখ্যাত চিকিৎসকদের অভিমত কি, শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে কেন্টের উপদেশ কি, ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি কি —এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমন্ধে সকলেরই অবহিত থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা এবার কিছু আলোচনা করছি।

পরিশিষ্ট — ১

শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্গাননের অনুচ্ছেদ সমূহ

শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে হ্যানিম্যান তাঁর অমরগ্রন্থ অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সে সকল অনুচ্ছেদের সারমর্ম নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

অনুচ্ছেদ ২- আরোগ্যবিধানের উচ্চতম আদর্শ হল দ্রুত, বিনাকষ্টে ও স্থায়িভাবে রোগের সার্বিক বিনাশ এবং স্বাস্থ্যের পুনঃরুদ্ধার।

অনুচ্ছেদ ৩ - আদর্শ আরোগ্য বিধানকারী চিকিৎসাবিদদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের অন্যতম হল ওষুধ প্রস্তুত সম্বন্ধে জ্ঞান, ওষুধের শক্তি মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধেজ্ঞান।

অনুচ্ছেদ ১৯ - ওষুধের আরোগ্যকারী শক্তির মূলে হল সেই শক্তি যা মানুষের স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৬ - মানবদেহে একটি প্রাকৃতিক ব্যধি অপর একটি সদৃশ ব্যধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় যদি সেটি ভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হয় এবং শক্তিতে অধিকতর বলশালী হয়।

অনুচ্ছেদ ৬৩, ৬৪, ৬৭ - ওষুধের মুখ্য ক্রিয়া ও গৌণক্রিয়া। গৌণক্রিয়া মুখ্যক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। সদৃশ ওষুধের গৌণক্রিয়া রোগের ঠিক বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে। গৌণক্রিয়াই আরোগ্যদায়ক ক্রিয়া। অন্যান্য পদ্ধতিতে গৌণক্রিয়ার কুফল।

অনুচ্ছেদ ১৪৬, ১৬৮ - ওষুধ প্রয়োগ বিজ্ঞান।

অনুচ্ছেদ ১৫৯ - অচিরপীড়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যত মাত্রা ক্ষুদ্র হবে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি তত কম হবে।

পরিশিষ্ট — ২

বৃহৎমাত্রার কুফল সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের বক্তব্য

বৃহৎমাত্রার কুফল সম্বন্ধে হ্যানিম্যান অর্গাননের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এবং ক্রনিক ডিজিসেস গ্রন্থে বার বার সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সদৃশমতে নির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বৃহৎমাত্রায় প্রয়োগ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর হিতের পরিবর্তে অহিতই সাধিত হয়। কেননা এ হোমিওপ্যাথিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সম্পর্কে অর্গাননের কয়েকটি অনুচ্ছেদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

অনুচ্ছেদ ১১২ - পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থাপত্রে ওষুধ সমূহ স্থূলমাত্রায় ব্যবহৃত হত। এর কুফল স্বরূপ আমরা এমন কতিপয় অবস্থা দেখতে পাই যেগুলো রোগীতে প্রথম দিকে দেখা যায়নি। সেগুলো এসেছে এই ব্যবস্থাপত্রের শোচনীয় পরিণাম হিসেবে এবং সে অবস্থা প্রথম যে অবস্থা ছিল ঠিক তার বিপরীত। এ সকল লক্ষণগুলো হল ওষুধের প্রাথমিক ক্রিয়ার অর্থাৎ জীবনীশক্তির উপর ওষুধের ক্রিয়ার বিপরীত, অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়াজনিত অবস্থা। সুস্থদেহে পরিমিত মাত্রায় যদি এ সমস্ত ওষুধ পরীক্ষা করা হয় তবে এ সকল লক্ষণ দেখা যায় না বললেই চলে। ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োগ করলে একেবারেই দেখা যায় না। হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যবিধান প্রক্রিয়ার ওষুধের ক্ষুদ্রতম মাত্রা প্রাণসত্তায় সেটুকু শুধু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেটুকু মানুষের তৎকালীন স্বাস্থ্যকে সুস্থ অবস্থায় উন্নীত করার জন্য আবশ্যক হয়।

অনুচ্ছেদ ১২৮ - অতি সম্প্রতিকালের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে ভেষজ পদার্থ তাদের স্থূল অবস্থায় তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ঐশ্বর্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না যেমন সেই পদার্থ ঘর্ষণ ও আলোড়নের বিশেষ প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে শক্তিকৃত হওয়ার ফলে করে থাকে। এই সহজ প্রক্রিয়ার মধ্যমে স্থূল পদার্থে নিহিত ও সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটে এবং অবিশ্বাস্যরকমভাবে তাকে ক্রিয়াক্ষম করে।

অনুচ্ছেদ ১৫৬ - এমন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নেই বললেই চলে যা! সুনির্বাচিত হলেও যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রায় প্রযুক্ত না হয় তবে অত্যন্ত উত্তেজনশীল ও অনুভূতিপরায়ণ রোগীদের ক্ষেত্রে অন্তত একটি সামান্য অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা, কিছু নগন্য অথচ নতুন লক্ষণ উৎপাদন করে না। কারণ এটা একপ্রকার অসম্ভব যে সমবাহু ও সমকোণ বিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজের মত ওষুধ ও রোগ লক্ষণের দিক থেকে ঠিক একইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৭ - হোমিওপ্যাথিক মতে নির্বাচিত ওষুধ সূক্ষ্মতা ও উপযুক্ততার জন্য অচির প্রকৃতির সদৃশরোগ শান্তভাবে, স্থায়িভাবে দূর করে। কিন্তু এসবক্ষেত্রেও মাত্রা যদি যথেষ্ট ক্ষুদ্র না হয় অথবা অনাবশ্যকভাবে কয়েকঘণ্টা ধরে প্রয়োগ করা হয় তবে রোগের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

অনুচ্ছেদ ১৫৯ -এই সকল ক্ষেত্রে মাত্রা যত ক্ষুদ্র হবে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি তত সামান্য ও ক্ষণ স্থায়ী হবে।

অনুচ্ছেদ ১৬০ - হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাত্রা কখনই এত ক্ষুদ্র করা যায় না যা বহুদিনের পুরনো নয় এমন জটিলতা শূন্য সদৃশ রোগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও দূরীভূত করতে পারেনা।

অনুচ্ছেদ ২৭৫ থেকে ২৭৯ - কেবলমাত্র সদৃশনীতি অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচনের উপর ওষুধের উপযোগিতা নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে মাত্রার ক্ষুদ্রতার উপরও নির্ভর করে। সুনির্বাচিত ওষুধ বৃহৎ মাত্রায় প্রয়োগ করলে তা ক্ষতিকর হবে এবিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। ওষুধ যত সদৃশ হবে এবং যত উচ্চশক্তিতে প্রযুক্ত হবে বৃহৎমাত্রা তত ক্ষতিকর হবে এবং অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের অনুরূপ বৃহৎমাত্রা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিসাধন করবে। তাছাড়া সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যদি পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হয় তবে রোগকে অনাবশ্যকভাবে জটিল ও দুঃ আরোগ্য করে তোলে।

ক্রনিক ডিজিসেস গ্রন্থে হ্যানিম্যান আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, চিকিৎসকগণ প্রায়ই তিনটি মারাত্মক ভুল করেন। প্রথমতঃ সদৃশমতে ওষুধ নির্বাচনে ব্যর্থতা, দ্বিতীয়ত ওষুধের নির্ধারিত মাত্রাকে অত্যধিক ক্ষুদ্র মনে করা এবং তৃতীয়ত ওষুধের প্রতিটি মাত্রাকে ক্রিয়া করার জন্য পূর্ণ সময় না দেওয়া।

অন্যত্র তিনি বলছেন, ওষুধ প্রয়োগের পর রোগের লক্ষণগুলো যদি আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পায় তাহলে এটা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে এন্টিসোরিক ওষুধটি যদিও নির্ভুলভাবে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু এর মাত্রা অত্যধিক বৃহৎ হয়েছে। ফলে এমন একটা আশঙ্কা দেখা যায় যে এ ওষুধে রোগটি কখন ও আরোগ্য হবে না। এর কারণ হল ওষুধটি কিছুটা সদৃশরোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু পূর্বতন রোগটিকে নির্মূল না করেই যে রোগ সৃষ্টি করেছে তা আরও তীব্র ও কষ্টকর। এর কারণ হল ওষুধটি বৃহৎমাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছে বলে ওষুধের অন্যান্য লক্ষণগুলোও প্রকাশ হয়ে পরেছে যা সাদৃশ্যের ধর্মকে বিনষ্ট করে। এর ফলে প্রায়ই এক নতুন বিসদৃশ ক্রনিকরোগের সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, আমি যেরূপ বলেছি তার চেয়েও যদি ক্ষুদ্রমাত্রায় ওষুধ প্রযুক্ত হয় তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। ওষুধের মাত্রাকে কখনও এরূপ ক্ষুদ্র করা যায় না যাতে ওষুধে কোন কাজ হবে না, যদি ওষুধের ক্রিয়া ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কিংবা ক্ষতি করে এমন সবকিছু পরিহার করা যায়। এন্টিসোরিক ওষুধটি যদি

অত্যন্ত যত্নসহকারে রোগলক্ষণের সাদৃশ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্বাচিত হয় এবং প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক হয় এবং রোগী এমন কিছু না করেন যাতে ওষুধের ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় তাহলে এভাবে ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ওষুধ প্রযুক্ত হলে ওষুধ থেকে যতটুকু সুফল আশা করা যায় তার সবটুকু পাওয়া যাবে।

তিনি দুঃখ করে বলছেন, তাঁরা যদি প্রথমে আমার উপদেশ শুনত এবং ক্ষুদ্রমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করত তা হলে তাঁদের কি ক্ষতি হত? এভাবে প্রযুক্ত ক্ষুদ্রমাত্রা যদি কাজ না করত তা হলে এর চেয়ে বড় অনিষ্ট হত কি? এর দ্বারা তাঁরা অন্তত কারোর অনিষ্ট করা থেকে অব্যাহতি পেত। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত বুদ্ধি বিবেচনাহীনভাবে রোগীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এমন বৃহৎমাত্রা ব্যবহার করে তাঁরা আবার সেই ঘুর পথে (round about way) যাচ্ছে, যা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনেক অনিষ্ট সাধনের পর এবং অনেক সময় অপচয় করার পর যদি তাঁরা প্রকৃতই আরোগ্য সাধনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে চান তাহলে যে পথ আমি অনেক কষ্টকর অভিজ্ঞতার পর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছি এবং যুক্তি প্রদর্শন করে খোলাখুলি এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলেছি সে পথে তাঁদের অবশ্যই যেতে হবে।

বোনিংহোসেনও এই ঘুরপথে যাওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন, এই শিক্ষার (বৃহৎমাত্রার কুফল সম্বন্ধে) অসারতা সম্বন্ধে সকলের সর্ববাদী সম্মত মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে কিছুকালের জন্য, যদি ও খুব অল্প সময়ের জন্য, বৃহৎমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করেছি, যার ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল।[৬৯]

---

৬৯. Boennighansen - Lesser Writings - Homoeopathy, a Reader for the cultivated non-medical Public.

পরিশিষ্ট - ৩

মাত্রা সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক চিকিৎসকগণের অভিমত

হ্যানিম্যান

মাত্রা হল ওষুধের ততটুকু পরিমাণ (quantity) যা রোগীকে একবারে গ্রহণ করার জন্য দেওয়া হয় এবং যা রোগীর বর্তমান রোগলক্ষণের সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী বৃদ্ধি ঘটায় কিন্তু নতুন কোন লক্ষণ সৃষ্টি করে না। ওষুধের উপযোগিতা কেবল সদৃশমতে নির্বাচিত ওষুধের উপর নির্ভর করেনা উপযুক্ত মাত্রার উপরও সমভাবে নির্ভর করে। মাত্রা যত সদৃশ হবে এবং যত উচ্চশক্তিতে প্রযুক্ত হবে বৃহৎমাত্রা, বিশেষকরে যদি তা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় ততটা অনিষ্টকর হয়, রোগীর জীবন ততটা বিপন্ন হয় এবং রোগকে অসাধ্য করে তোলে। (অনুচ্ছেদ ২৭৬ - ২৭৭)। পোস্তদানার মত একটি ক্ষুদ্র অণুবটিকাই একমাত্রা।

বোনিংহোসেন

মাত্রা যে ওষুধের পরিমাণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওষুধের অত ক্ষুদ্র মাত্রায় কাজ হওয়ার বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। এজন্য কিছুকাল তিনি ওষুধের বৃহৎমাত্রা দিয়ে চিকিৎসা করেন। তাতে বৃহৎমাত্রার কুফল সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এজন্য অচিরেই ক্ষুদ্রমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ শুরু করেন, তাতে সুফল লাভ করেন এবং হ্যানিম্যানের নির্দেশের সারবত্তা উপলব্ধি করেন। তবে অনেকগুলো অণুবটিকা একসঙ্গে ওষুধ সিক্ত হয় বলে কয়েকটি ভালভাবে ওষুধ সিক্ত নাও হতে পারে। এজন্য তিনি সাধারণতঃ দুটি অণুবটিকা একমাত্রা হিসাবে ব্যবহার করতেন।

কেন্ট, ডানহাম, ওয়েলস, ন্যাস

এসকল জগৎবরেণ্যে চিকিৎসকগণ মাত্রা (dose) বলতে শক্তি (potency) বুঝেছেন। তাঁদের মতে ক্ষুদ্রমাত্রা অর্থে উচ্চশক্তি আর বৃহৎমাত্রা অর্থে নিম্নশক্তি। কেন্ট মনে করেন, হ্যানিম্যান মাত্রা বলতে যে শক্তিই বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। (Can there be any doubt of what Hahneman had meant when he speaks of the smallest dose? Can there be any doubt of that he means by attenuation?)[৭০] তিনি আরও বলেছেন, অনেকের একটা মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে যে ওষুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ওষুধ অধিক সদৃশ (homoeopathic) হয়। ওষুধের শক্তি যে রোগশক্তি দেহের যে স্তরে ক্রিয়াশীল রয়েছে সে স্তরে অর্থাৎ রোগের সদৃশ হতে হবে - এ বিষয়ে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি করলে রোগ ত্বরান্বিত হতে পারে, কিন্তু এতে প্রায়ই রোগের বৃদ্ধি ঘটে। শক্তি হ্রাস করলে সাদৃশ্যের হ্রাস ঘটে। যদি ওষুধের পরিমাণ বাড়ানো হয় তাহলে রোগের সঙ্গে ওষুধের সম্পর্ক সাদৃশ্য. থেকে বিসাদৃশ্য হয়। এজন্য তখন এ. আর আরোগ্যকারী শক্তি থাকে না।[৭১]

কেন্টের অভিমত হল, আমাদের লক্ষ্য হল রোগশক্তির সঙ্গে ওষুধশক্তির সাদৃশ্য বিধান করা, ওষুধের শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা নয়। পরিমাণ নিয়ে বিবেচনা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। পরিমাণ শব্দটি জড়শক্তি (strength) সূচক, হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্যকারী ওষুধশক্তি সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য নয়। [৭২]

এজন্য ওষুধ জলে মিশ্রিত করে কয়েক চামচ মাত্রায় প্রয়োগ করা হোক কিংবা শুষ্ক অবস্থায় কয়েকটি অণুবটিকা জিভে দেওয়া হোক তাতে ফলে কিছু তফাৎ হয় না।, ফল একই হবে। অনেকে মনে করেন একটি বা দুটি অণুবটিকা প্রয়োগ করলে ওষুধের ক্রিয়া মৃদু হবে, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ওষুধে যদি ক্রিয়া হয় তবে একটি অণুবটিকায় যে কাজ হবে দশটি অণুবটিকায়ও সে কাজ হবে। ওষুধ যদি জলে দ্রব করে চামচে করে দেওয়া হয় তা হলে প্রতি চামচ ওষুধে যে কাজ হবে সমস্ত দ্রবীকৃত ওষুধটি একেবারে খেলে কিংবা সমগ্র ওষুধটি শুষ্ক অবস্থায় একবারে খেলে তা একই কাজ হবে।[৭৩]

---

৭০. Kent - Lectures on Homoeopathic Philosophy Jain Publishers, 1974 page-251.

৭১. Kent - Lesser Writings Page-254

৭২. Kent - Lesser Writings Page - 305

৭৩. Kent. Ibid Page-389

কিন্তু কেন্ট অন্যত্র ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন ঃ যে সমস্ত চিকিৎসক জলের সঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করেন তাঁরা অনেক অনুভূতিশীল রোগীদের কষ্ট বা রোগবৃদ্ধির কারণ হন। রোগের বৃদ্ধি ঘটেছে বলে মনে করে তাঁরা ওষুধ পরিবর্তন করেন, যে সময় তাঁদের ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখা উচিত ছিল। তিনি আরেক জায়গায় বলছেন, উচ্চশক্তি অপেক্ষা ৩০ বা ২০০ শক্তির ওষুধ ব্যবহার কালে প্রায়ই জলের সঙ্গে মিশিয়ে ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।[১৪]

কেন্ট মনে করেন, কোন শক্তির ওষুধ দু মাত্রা, কখনও তিনমাত্রা যদি দীর্ঘসময় অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা হয় তবে সর্বোত্তম ফল লাভ সম্ভব হয়। (two doses, sometimes three in the same plane give the best result, if given at long intervals) ওষুধের ক্রিয়ার ফল পর্যবেক্ষণ করে তিনি ক্রমোন্নত শক্তিতে ওষুধ প্রয়োগ করতেন। তাঁর অভিমত হল, ওষুধের একমাত্রা প্রয়োগ করাই উচিত। ওষুধের ক্রিয়াবৃদ্ধি করার জন্য ওষুধ পুনঃ প্রয়োগ করা নীতি হওয়া উচিত নয়। পুনঃ পুনঃ ওষুধ প্রয়োগ করা থেকে সর্বদাই সংযত হওয়া উচিত।

ই. বি. ন্যাস

ন্যাসও মাত্রা বলতে শক্তি মনে করতেন। তাঁর অভিমত হল, ওষুধ মূল আরকেই দেওয়া হোক বা শক্তিকৃত অবস্থায় দেওয়া হোক যা রোগীর রোগের অনাবশ্যক বৃদ্ধি না ঘটিয়ে আরোগ্যকর হিসাবে কাজ করে তা-ই হল মাত্রা।[১৫]

---

১৪. Kent Ibid Page-392

১৫. E. B. Nash Preface in the Testimony of the Clinical Cases.

ক্যারল ডানহ্যাম

ডানহ্যামের অভিমত : কতগুলো অণুবটিকায় একমাত্রা ? যদি অণুবটিকাগুলো উপযুক্তভাবে ওষুধসিক্ত করা যায় তবে একটি অণুবটিকায় যে কাজ হবে একশটি অণুবটিকাতেও সে কাজ হবে। যেহেতু একসঙ্গে কয়েকহাজার অণুবটিকা ওষুধসিক্ত করা হয় এজন্য দু একটি অণুবটিকা ওষুধসিক্ত নাও হতে পারে। এজন্য আমরা সাধারণতঃ ৪টি থেকে ৬টি অণুবটিকা প্রতিমাত্রায় দিয়ে থাকি। অল্পসময়ে এবং নিশ্চিতভাবে অণুবটিকাগুলো সিক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অণুবটিকা ব্যবহার করি।

ওয়েলস, ন্যাস, অ্যালেন প্রভৃতি শিক্ষক চিকিৎসকগণের অভিমত হল, হোমিওপ্যাথিতে বৃহৎমাত্রা ও ক্ষুদ্রমাত্রা বলে কোন কথা থাকতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধসমূহ যেহেতু সূক্ষ্ম পদার্থ সেজন্য শক্তিই উপযুক্ত শব্দ। মাত্রা ও শক্তি একই অর্থবোধক (potency is nothing more than another term for dose).

কারও মতে মাত্রা শব্দ রাখতে আপত্তি নেই, কিন্তু বৃহৎমাত্রা ও ক্ষুদ্র মাত্রা শব্দ রাখা সঙ্গত নয়। [৭৬]

স্টুয়ার্ট ক্লোজ

মাত্রা বলতে ওষুধের পরিমাণ বুঝায়। তবে ওষুধের পরিমাণ (dose) নির্ভর করে ওষুধটি কি অবস্থায় (quality, potency) প্রযুক্ত হয় তার উপর। আরোগ্য নীতির মত মাত্রা নীতিও, ওষুধের বৃহৎমাত্রা ও ক্ষুদ্রমাত্রার পরস্পর বিপরীত ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এটি নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় নীতির - ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত-চিকিৎসাবি জ্ঞানের প্রয়োগের নীতি। রোগীর প্রবণতার পরিমাপ করা এবং তদনুযায়ী শক্তি ও মাত্রার সাজুয্য বিধান করাই আরোগ্যবিধানের মূল লক্ষ্য। [৭৭]

---

৭৬. Medical Advance Vol XXI. page 317 and 318) - Editor. H. C. Allen. M.D

৭৭. Stuart Close. Page 183-184)

এইচ. এ. রবার্টস

মাত্রা হল ওষুধের ততটা পরিমাণ যা রোগীতে একেকবারে প্রয়োগ করা হয়। এর পরিমাণ অবশ্যই ক্ষুদ্রতম হবে। শক্তি ও মাত্রা পরস্পরের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাত (inverse ratio) সম্বন্ধযুক্ত। শক্তি যত বেশী, মাত্রা তত কম। শক্তি যত কম, মাত্রা তত বেশী।[৭৮]

শক্তি ও মাত্রা নিয়ে হ্যানিম্যানের নির্দেশ তাঁর এ বিষয়ে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। শক্তি ও মাত্রা নিয়ে এরকম গবেষণা আর কেউ করেননি। তাঁর অভিজ্ঞতাই যে যথার্থ এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। কেন্ট হ্যানিম্যানের শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। হোমিওপ্যাথির শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে তার অবদানের কোন তুলনা নেই। কিন্তু তিনি হ্যানিম্যানের অন্ধভক্ত ছিলেন না। হ্যানিম্যানের প্রতিটি নির্দেশ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তা সত্য বলে স্থির নিশ্চিত হলে তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অর্গাননের কোন কোন নির্দেশ সম্বন্ধে মনে হয়েছিল যে হ্যানিম্যান ভুল করেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দেখেছেন যে, হ্যানিম্যানই ঠিক, তাঁরই ভুল হয়েছিলো। তিনি অন্যত্র বলেছেন, সকল লোকের তাঁর (হ্যানিম্যানের) কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, যতদিন না পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তা করে দেখাতে পারেন। কেননা তিনিই সকলের চেয়ে বড় শিক্ষক।[৭৯]

---

৭৮. H.A.Robers. The Art of Cure of Homoeopathy. Page 113-114.

৭৯. Let all men learn from him until they can do as he did, for he was, and still is, the teacher above all others. Kent. Lesser Writings. Ibid. Page 265

পরিশিষ্ট - ৪

শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

১. উচ্চ শক্তির ও নিম্নশক্তির প্রবক্তা

বোনিংহোসেন নিম্ন থেকে তখনকার দিনে প্রাপ্তব্য উচ্চশক্তি ব্যবহার করতেন। কেন্ট প্রথমে নিম্নশক্তি(৩০) ব্যবহার করতেন। পরে উচ্চ থেকে উচ্চতম শক্তি ব্যবহার করতেন।

ডানহাম, ওয়েলস, অ্যালেন, ন্যাস প্রমুখ চিকিৎসকগণ সর্বদা উচ্চশক্তির ওষুধ ব্যবহারে পক্ষপাতী ছিলেন।

অপরপক্ষে ক্লার্ক, লিপি, বোরিক, হিউজেস প্রমুখ চিকিৎসকগণ নিম্নশক্তির ওষুধ অধিক কার্যকরী বলে মনে করতেন।

স্টুয়ার্ট ক্লোজ, এইচ. এ. রবার্টস প্রমুখ চিকিৎসকগণ নিম্নতম শক্তি থেকে উচ্চতম শক্তি সকলশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন।

বার্ণেট টিউমার, ক্যানসার ইত্যাদি কঠিন রোগের ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ওষুধ অধিকমাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। অন্য ক্ষেত্রেও তিনি সাধারণতঃ নিম্ন থেকে মধ্যশক্তি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন।

২. হ্যানিম্যান কতশক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন

হ্যানিম্যান যে ওষুধের বাক্সগুলো সর্বদা ব্যবহার করতেন সেগুলো সমগ্রই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এরফলে হ্যানিম্যান সাধারণতঃ কি কি ওষুধ ব্যবহার করতেন এবং কত শক্তিতে ব্যবহার করতেন তা জানা সম্ভব হয়েছে। ডাঃ রিচার্ড হেলের (Dr. Richard Hael of Stuttgart) নিকট এরূপ তিনটি ওষুধের বাক্স রয়েছে। তন্মধ্যে দুটিতে শততমিক এবং একটিতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ রয়েছে। প্রথম বাক্সটির মাপ ছিল ৪৮ সে.মি. X ৩০ সে.মি. এতে ৬০০ টি ওষুধের শিশি ছিল। দ্বিতীয় বাক্সের মাপ ছিল ২৬ সে.মি. X ২২ সে. মি.। এতে ২৮৮টি ওষুধ ছিল। ওষুধগুলো সব অণুবটিকায় ছিল। এই দুটি বাক্সে সাধারণতঃ ৬, ১৮, ২৪ ও ৩০ শক্তির ওষুধ ছিল। কোন কোন ওষুধ কেবলমাত্র একটি শক্তিতে ছিল। বাক্স দুটিতে মোট ২০২টি বিভিন্ন শক্তির ওষুধ ছিল, অনেক ওষুধই ১৮ শক্তিতে ছিল না।

তৃতীয় বাক্সটির মাপ ছিল ৬৩ সে.মি X ৩৪.৫ সে. মি এতে ১৭১৬টি শিশি থাকত। এই শিশিগুলোতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ ছিল। সাধারণতঃ সমস্ত ওষুধগুলো ১ থেকে ১০শক্তিতে থাকত। মার্কসল, সালফার ইত্যাদি কয়েকটি ওষুধের ক্ষেত্রে ৩০ শক্তি পর্যন্ত ওষুধ থাকত। এই বাক্সে ৭৩টি ওষুধের বিভিন্নশক্তির ওষুধ পাওয়া গেছে।[৮০]

ডাঃ ব্রাডফোর্ড লিখেছেন, হ্যানিম্যান ৬, ৯, ১২, ১৮, ২৪ ও ৩০ শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন।[৮১]

হ্যানিম্যান প্রথম জীবনে মূল আরক থেকে নিম্নশক্তি ব্যবহার করতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি উচ্চশক্তি অধিক ব্যবহার করতেন। তাঁর সময়ে জেনিকেন (Herr Genichen), গ্রস (Gross), স্ক্রেটার (Schreter), করসাকফ (Korsakoff) প্রমুখ ৬০, ৯০, ২০০, ১০০০ এবং ১৫০০ শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করেন এবং হ্যানিম্যান তা ব্যবহার ও করেন।[৮২] হ্যানিম্যান থুজা৬০ গণোরিয়া রোগে কার্যকরী বলে তা অনুমোদন করেন। তিনি সালফার ৯০ দিয়ে একটি দুরারোগ্য মৃগীরোগীকে আরোগ্য করেন।[৮৩]

আমেরিকার ডাঃ ফোগলে (Brey Fogley) হ্যানিম্যানের দ্বিতীয়া স্ত্রীর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, হ্যানিম্যান শেষ জীবনে কিরূপ শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন। ঐ চিঠির জবাবে ম্যাডাম মেলানী লিখেছিলেন যে, হ্যানিম্যান রোগীর ব্যক্তিগত অবস্থা অনুযায়ী নিম্ন থেকে উচ্চ সকলশক্তিই ব্যবহার করতেন। আমি তাকে তৃতীয় বিচূর্ণশক্তি ব্যবহার করতে দেখেছি। কিন্তু প্রয়োজন মনে করলে তিনি ২০০শক্তি, এমনকি হাজার শক্তির ওষুধ ও ব্যবহার করতেন।[৮৪]

---

৮০. Richard Haul - Samuel Hahnemann - His Life and Work Vol-II, Page-424
৮১. T. L Bradford - THe Life and Letters of Hahnemann - Page-471
৮২. Hael. Ibid. Page-321
৮৩. R.E. Dudgeon. Ibid Page-763.
৮৪. Hahnemann used all degrees of dilutions, low as well as high as the individual case required. I saw him give the third tituration, but I also know that he used the 200th or even the 1,000th potency whenever he considered necessary. Hael- Ibid Page-328.

হ্যানিম্যান কেমনভাবে ওষুধ প্রয়োগ করতেন

হ্যানিম্যান জীবনের শেষ দশ বছর অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনটি প্রথায় ওষুধ প্রয়োগ করতেন। সেই তিনটি প্রথা হল -

১. ক্ষেত্র বিশেষে একমাত্রা। ঐ একমাত্রা তিনি পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির অথবা শততমিক শক্তির ওষুধের ৩০ শক্তি পর্যন্ত বা তদূর্ধ্ব শক্তি ব্যবহার করতেন।

২. শততমিক ওষুধের ৩০ শক্তি পর্যন্ত একটি বা দুটি ওষুধ সিক্ত অণুবটিকা জলের সঙ্গে মিশিয়ে বহুভাগে বিভক্ত করে প্রয়োগ করতেন। প্রত্যেকটি মাত্রা প্রয়োগের পূর্বে ঝাঁকি দিয়ে শক্তি পরিবর্তন করে নিতেন।

৩. পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধের একটি বা দুটি অণুবটিকা জলের সঙ্গে মিশিয়ে বিভক্ত মাত্রায় ঝাঁকি দিয়ে ক্রমোন্নত শক্তিতে ব্যবহার করতেন। শেষ জীবনে তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ওষুধ ব্যবহার করতেন। নির্বাচিত ওষুধের উচ্চশক্তির একমাত্রা প্রয়োগ করে তার ক্রিয়ায় যাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে তজ্জন্য কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ বা কখন ও কয়েক মাস অপেক্ষা করার নীতি তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। (He had therefore, entirely abandoned his practice of allowing one dose of suitable remedy, highly potentized, to take its effects undisturbed for days, weeks or sometimes months) [৮৫]

৮৫. বি. কে. বসু, পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি ও তাহার প্রয়োগবিজ্ঞান। পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৪২

পরিশিষ্ট - ৫

শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কেন্টের উপদেশ [৮৬]

আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত চিকিৎসককে রোগের অবস্থা অনুযায়ী ওষুধ কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা অবশ্য শিখতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৪৬)। ওষুধের রোগোৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বহুগুন বেড়েছে, এবং আরও অনেক বাড়বে যদি আমাদের ওষুধের বিভিন্ন শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

ত্রিশ বছর ধরে বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করে এবং তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে ওষুধের শক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো স্থির করা যেতে পারে ঃ

১. প্রত্যেক চিকিৎসকের নিকট শততমিক শক্তির ওষুধের ৩০, ২০০, ১এম. ১০ এম, ৫০এম, সি. এম, ডি.এম এবং এম.এম শক্তির ওষুধ থাকা উচিত।

২. অত্যন্ত অনুভূতিশীল (very sensitive) নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ১০ এম শক্তির ওষুধ বিশেষ আরোগ্যদায়ক হয়।

৩. খুব বেশী অনুভূতিশীল নয় এমন লোকেদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে ওষুধের ১০এম থেকে এম এম শক্তি বেশী কার্যকরী হয়।

৪. অ্যাকুট রোগের ক্ষেত্রে ১ এম থেকে ১০এম শক্তি অধিক কার্যকরী।

৫. অনুভূতিশীল নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমে ৩০ বা ২০০ শক্তি ব্যবহার করা ভাল। রোগীর অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হতে দিতে হবে। পরে ১এম শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

৮৬. Kent. Lesser Writings. Ibid. Page 207.

৬. ক্রনিক রোগে ভুগছেন এমন খুব বেশী অনুভূতিশীল নয় রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথমে ১০ এম শক্তি দিয়ে শুরু করা ভাল। যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তির পরিবর্তন করার দরকার নেই। তারপর ৫০ এম শক্তি প্রয়োগ করে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি অব্যাহত থাকে। এরপর এমনিভাবে প্রয়োজন বোধে সি. এম, ডি. এম এবং এম. এম শক্তির ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৭. এভাবে শক্তির ক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করলে আরোগ্যকারী ওষুধটি রোগীর আরোগ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া করে যাবে। ওষুধ যদি প্রকৃতই সদৃশতম হয় তাহলে ওষুধটি শক্তির ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী কাজ করে যাবে। ওষুধটি যদি আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত হয় তাহলে ওষুধ শক্তির দুএকটি ক্রম শুধু কাজ করবে, তারপর রোগ লক্ষণের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং নতুন ওষুধ নির্দেশিত হবে।

৮. অনেক ক্রনিক রোগের চিকিৎসায় আরোগ্য সাধনের নিমিত্ত আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত ওষুধের যত্নসহকারে নির্বাচিত শক্তির একটি ধারাবাহিক ক্রমের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্যবস্থা পত্রের আদর্শ হবে এমন একটি সদৃশ ওষুধ নির্বাচন করা যা উচ্চতম শক্তি পর্যন্ত কাজ করে যাবে। এসকল ক্ষেত্রে প্রতিবার রোগী বলবে সে প্রথমবার ওষুধ গ্রহণের পর যেরূপ ভালবোধ করেছিল প্রত্যেকবার ওষুধ গ্রহণের পর সেই একইরূপ ভাল বোধ করছে। ওষুধ যদি ঠিকমত কাজ করে রোগী তার ক্রিয়া অবশ্যই অনুভব করতে পারবে।

অনেকে জানিয়েছে যে এই উপদেশ ওষুধের ক্রিয়া বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এটা জানা আরও ভাল যে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ না করলে এই পরামর্শ খাটে না।

পরিশিষ্ট - ৬

ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি [৮৭]

প্লাসিং পদ্ধতি (Plussing method)

ঝাঁকি দিয়ে যেমন ওষুধের শক্তির পরিবর্তন ঘটানো হয় তেমনি প্লাসিং পদ্ধতিতে শক্তির পরিবর্তন ঘটানো হয়। প্লাসিং পদ্ধতি হল এক মাত্রা ওষুধকে বহুভাগে বিভক্ত করে প্রয়োগ করার এক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি গ্লাসে এক তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ করে তাতে একমাত্রা ওষুধ নেওয়া হয়। ঐ মিশ্রণটি চামচ দিয়ে নেড়ে তা থেকে দু'চামচ ওষুধ রোগীকে সেবন করতে দেওয়া হয়। পরে ঐ গ্লাসে সামান্য ওষুধ রেখে বাকীটা ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ঐ গ্লাসে আবার পূর্বে যতটা জল ছিল ততটা জল দিয়ে আবার পূর্ণ করা হয়। এবার চামচ দিয়ে নেড়ে তা থেকে আবার দুচামচ খেতে দেওয়া হয়। এটি সামান্য উন্নত শক্তির দ্বিতীয় মাত্রা হল। এই মিশ্রণ থেকে সামান্য ওষুধ রেখে বাকীটা ফেলে দিয়ে আবার জলে মিশিয়ে আগের নিয়মে তৃতীয় মাত্রা প্রস্তুত করা হয়। এভাবে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এতে ওষুধের প্রতিমাত্রার শক্তি পূর্বের শক্তির চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু ক্রিয়া ক্ষমতা অনেক বাড়ে। এ পদ্ধতি দুরূহ ও জটিল রোগে অত্যন্ত কার্যকরী।

২. দুমাত্রা ওষুধ প্রয়োগের নীতি (Theory of double dosage) -এ পদ্ধতি এডিনবার্গের ডাঃ গর্ডন (Gordon of Edinburg) প্রচলন করেন। এতে একই ওষুধের দু শক্তির একমাত্রা করে আট ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করা হয় - প্রথম মাত্রাটি নিম্নশক্তির এবং দ্বিতীয় মাত্রা উচ্চশক্তির। যেমন, ফসফোরাস ওষুধটি নির্বাচিত হলে তার ২০০ শক্তি রাত্রে শোওয়ার সময় এবং ১০০০ শক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠার পর। কিন্তু এর কার্যকারিতা এখনও সুপ্রমাণিত হয়নি।

---

৮৭. Dr. Elizabeth Wright. Ibid. Page-50

শব্দসূচী

লেখক পরিচিতি

ডাঃ পরেশচন্দ্র সরকার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার জয়দেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ˚হেমচন্দ্র সরকার একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও বড় সাধক ছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে ডাঃ সরকার কখনও দ্বিতীয় হননি। ১৯৪৯ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। সেই কঠিন অবস্থাতেও তিনি ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এম.এস.সিতে পড়ার সময় ১৯৫৯ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি সততা ও কর্মদক্ষতার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন। সুদীর্ঘ ৩০ বছর বিভিন্ন প্রশাসনিক উচ্চপদে কর্মরত থেকে ১৯৯১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই ডাঃ সরকার হোমিওপ্যাথিতে আসক্ত হন এবং এবিষয়ে গভীর পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল থেকে রেজিষ্ট্রেশন পান। ডাঃ সরকার প্রথম থেকেই হোমাই আই এইচ. ও প্রভৃতি বিভিন্ন সর্বভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সংগঠনের বিজ্ঞানসভার নিয়মিত বক্তা হন। এ সময়ে তিনি এদেশে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং হোমিওপ্যাথিক দিকপালগণের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর লেখা অজস্র প্রবন্ধ Hahnemannian gleanings, Indian journal of

Homeopathy, হ্যানিম্যান, হোমিওজ্যোতি, হোমিওদ্যুতি, সদৃশী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ডাঃ সরকার হ্যানিম্যান ও সদৃশী পত্রিকার সম্পাদক হন। ডাঃ সরকারের লেখা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্যকলা বইটি হোমিওপ্যাথিক সমাজে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর লেখা অন্যান্য বই, ঔষধ নির্বাচন বিদ্যা, হোমিওপ্যাথিক স্পোর্টস মেডিসিন, Repertory and Repertorization. ১৯৯৩ ডাঃ সরকার ও কয়েকজন বিদগ্ধ চিকিৎসক U.H.M.P.A নামক এক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তিনি তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিক সমাজে ডাঃ সরকার লেখক, বক্তা ও চিকিৎসক হিসাবে এক অতি পরিচিত নাম।

ডাঃ সরকারের লেখা হোমিও ওষুধের শক্তি, মাত্রা ও প্রয়োগবিজ্ঞান বইটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে নবতম সংযোজন। আমরা আশাকরি এই বইটি চিকিৎসকদের বহুদিনের এক চাহিদা পূরণ করবে।

প্রকাশকের নিবেদন